

আমার জীবন

স্বর্ণকুমারী দেবী

(১)

তোমরা শুনিলেই আর একরকম ভাবিয়া বসিবে, কিন্তু আমি বেশ জানি সে সব কিছু নয়। দু একবার আমারও সন্দেহ হইয়াছে বটে,—কিন্তু তখনই বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি তাহা ভুল। একবার ভালবাসিলে নাকি আর একবার ভালবাসা যায়! তবে যে মৃণালিনী দেবীকে দেখিতে আমার ভাল লাগে—তাঁহার সহিত গল্প করিতে আনন্দ বোধ হয়, ইহার সহজ কারণ তাঁহাকে আমি ভালবাসি কিন্তু নিতান্ত সাদাসিধে বন্ধুতার ভালবাসা মাত্র অন্য কিছু নহে, হইতেই পারে না,—একবার ভালবাসিলে নাকি আর একবার ভালবাসা যায়!

কখনও কখনও তাঁহার স্বরে, তাঁহার হাসিতে, নয়নের দৃষ্টিতে, হাতের স্পর্শে আমার কেমন একটা মোহময় বিহ্বলতা জন্মে সত্য, কিন্তু নিশ্চয় জানি তাহার কারণ অন্য কিছু নহে; তাহা পুরাতন স্মৃতির আকস্মিক উদ্রেক মাত্র। কে জানে কেন, থাকিয়া থাকিয়া, এই নয়নের তারায় আমি যেন সেই নয়নের জ্যোতি দেখিতে পাই, এই স্পর্শে সেই স্পর্শ অনুভব করি, এই কণ্ঠে সেই কণ্ঠের স্বর শুনিতে পাই,—তাই তাহার চোখে চোখ রাখিয়া, তাঁহার হাত হাতে ধরিয়া সময়ে সময়ে আমার এই তন্ময় ভাব, এই বিভ্রম, এই মোহ! এইখানে বলা আবশ্যক, আমি ডাক্তার, চিকিৎসা করিতে আসিয়া তাঁহার সহিত আমার পরিচয়।

তুমি যে সুন্দরি হাসিয়া বলিতেছ—"হ্যাঁ হ্যাঁ দরকার মত সকল পুরুষেরও এইরূপ মতিভ্রম ঘটে! মুড়ি খাইতে কোন কালেই তোমাদের ত্রুটি নাই, কেবল সুবিধা বুঝিয়া—তাহা মুড়ি কি চাল ভাজা এইটা বুঝিতেই ভুলিয়া যাও।"

এ কথায় আমি নাচার! কিন্তু তুমি মহাশয়া যাই বল, আমার বিশ্বাস আমি মুড়ি ও চাল ভাজার প্রভেদ বিলক্ষণ বুঝি,—আর বুঝিয়াই বলিতেছি, ইহা প্রেম নহে, বন্ধুতা মাত্র। সুকোমল, সুদৃঢ় বহুপুণ্যজ, পরমুপাদেয় বন্ধুতা—তবে স্ত্রী পুরুষেই এরূপ বন্ধুতা সম্ভবে; পুরুষে পুরুষে ঠিক একপ বন্ধুতা হয় না, অশ্রুজলের প্রত্যাশায় অশ্রুজল বিসর্জ্জন, মমতার আকাঙ্ক্ষায় হৃদয়ের দুঃখময় দ্বার এমন কি জীবনের ঘৃণিত অংশও অসঙ্কোচে উদ্ঘাটন—ইহা পুরুষের মধ্যে হাস্যকর, স্ত্রী পুরুষের বন্ধুতাতেই স্বাভাবিক।

না বলিয়া কি থাকা যায়? আর যদি কেহ পাবে আমি ত না। সন্ধ্যাকালে অস্পষ্ট আলোকময় নির্জ্জন গৃহে আমার মুখের দিকে চাইয়া চাইয়া সে যখন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বিষণ্ণ স্বরে বলিয়া উঠিল—"কি ভাবিতেছেন? আপনার মুখে সর্ব্বদাই যেন একটি কষ্টের ছায়া দেখিতে পাই, মনে হয় আপনার প্রাণের ভিতর যেন কি একটি গভীর দুঃখ জাগিতেছে।" তখন কি আর আমি আত্ম-সংবরণ করিতে পারি? আমি বলিলাম—"তেমন দুঃখ যেন ভগবান কাহারও জীবনে না লেখেন।" বলিতে বলিতে আমার নেত্র অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, সেই অশ্রুবাষ্পের মধ্যে ছায়ার মত প্রতিবিম্বিত ক্ষীণ মূর্ত্তিখানি দেখিতে দেখিতে আমি ভাবিতে লাগিলাম, এই গাম্ভীর্য্যের মধ্যে কেবল যদি সেই প্রফুল্ল নবীন ভাবটুকু থাকিত! এই বিষণ্ণ নয়নের মধ্য দিয়া কেবল যদি সেই সরল সহাস ভাবটুকু ফুটিয়া বাহির হইত! এই ক্ষীণ কায়া, ক্ষীণ কপোল যদি আর একটু সুগোল, সুঠাম, পরিপুষ্ট এবং শৈশবকান্তিযুক্ত হইত! তাহা হইলে কি আমি মনে করিতে পারিতাম না, এমূর্ত্তি তাহারই মূর্ত্তি—তাহার অনুরূপ নহে!"

যুবতীর দীর্ঘ নিশ্বাসে আমার চিন্তাভঙ্গ হইল,—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমার কথায় আপনাকে কষ্ট দিলাম বুঝি?"

যুবতী কোন কথা কহিল না,—সেই ক্ষীণালোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু মনে হইল যেন তাহার নয়ন সজল। আমি ব্যগ্রভাবে বলিলাম—"কি হইয়াছে?"

মৃণালিনী নিরুত্তর।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হইয়াছে? আপনার অসুখ করিতেছে না ত?"

যুবতী ধীরে ধীরে বলিল—"মনে করিতাম আপনি আমাকে নিতান্তই পর ভাবেন না—"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"এই! তা এখন ভুল ভাঙ্গিল কিসে?"

যুবতী বলিল—"আপনি আমাকে বিশ্বাস করিতে পারেন না!"

"বিশ্বাস করিতে পারি না! আপনার মত আমার বিশ্বাসী বন্ধু জগতে আর কে আছে।"

"তাহা হইলে আপনার দুঃখের ভাগ আমাকে দিতেন!"

আমি কিছুক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া বলিলাম—"ভগিনি! যদি কাহারো নিকট আমি আমার মনের কথা বলিতে পারি, জীবন খুলিয়া দেখাইতে পারি তবে সে তোমার নিকট!—তুমি অন্যায় অবিশ্বাস করিতেছ। তবে যে বলি না তাহার কারণ—আমার এই কষ্টকর জীবনকাহিনী বলিয়া তোমাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করে না।" মনের আবেগে সহসা এবং এই প্রথম তাঁহাকে "তুমি" বলিয়া সম্বোধন!

মৃণালিনী বলিল—"সে কি কেবলি কষ্ট! বন্ধুর অকৃত্রিম বিশ্বাসের সুখে কি সে কষ্টও উপভোগ্য নহে? জীবনে বিশ্বাসের মত সুখ কি কিছু আছে?"

"তাহা সত্য। ভগিনি, তোমরা হৃদয় দিয়া দেখ, তোমরা দিব্য দর্শক। আমরা বুদ্ধির ঘোর প্যাঁচ করিতে গিয়া কেবল সন্দেহের ধাঁধায় ঘুরিয়া বেড়াই। যদি বিশ্বাস করিয়া এ জীবন একদিন খুলিয়া দেখাইতে পারিতাম,—ত হয়ত এ কষ্টের হাত হইতে উদ্ধার পাইতে পারিতাম। শোন ভগিনি, তুমিই শোন; যে ঘৃণ্য কথা তাহার নিকট লজ্জায় প্রকাশ করিতে পারি নাই, তোমার নিকট বলিয়াই তাহার প্রায়শ্চিত্ত করি,—যদি তাহার প্রায়শ্চিত্ত থাকে। শুনিয়া জান এই নরাধম তোমার স্নেহের কিরূপ অযোগ্য, কিন্তু কিরূপ প্রাণমনে তোমাকে বিশ্বাস করিতেছে!

(২)

আমি ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া দেশে গিয়া আত্মীয়বর্গের সহিত দেখা শুনা শেষ করিয়া আবার কলিকাতায় আসিয়াছি, কর্ম্মস্থলে যাইবার এখনো যে কয়দিন

বিলম্ব আছে সেই কয়দিনের জন্য প্রাণকৃষ্ণ বাবুর অতিথি হইয়া আছি। প্রাণকৃষ্ণ বাবু আমার স্বদেশী, স্বজাতি—কেবল তাহাই নহে, আমাদের উভয় পরিবারের মধ্যে বহুকালের বন্ধুত্ব চলিয়া আসিতেছে। ইনি এখন কলিকাতাতেই বাস করেন, কলিকাতার একজন বড উকীল; পয়সা কড়ি বেশ করিয়াছেন, অথচ তাঁহার ধন ভোগ করিতে আর কেহই নাই, একমাত্র কন্যাই তাঁহার গৃহসর্ব্বস্ব, —গৃহিণী অল্পদিন হইল স্বর্গলাভ করিয়াছেন।

প্রাণকৃষ্ণ বাবু যদিও বিলাত যান নাই কিন্তু তিনি ইংরাজী মেজাজের লোক, ইংরাজী চালেই চলেন। ইংরাজী পাড়ায় বাড়ি, ইংরাজী কেতায় থাকেন, মেয়েকে ইংরাজী লেখা পড়া শিখাইয়াছেন এবং এপর্য্যন্ত তাহার বিবাহ দেন নাই।

আমি আসিয়া শুনিলাম কিছুদিন হইতে মায়াবিনী পীড়িত। পীড়া অদ্ভুত! নূতন ধরণের হিষ্টিরিয়া, পীড়ার সময় বলপ্রকাশ কি অন্য কোনরূপ উপদ্রব নাই কেবল একবার অজ্ঞান হইলে ২৪ ঘণ্টা কাল রোগীর আর চেতনা থাকে না। তাহাকে তখন দেখিলে মনে হয় সে গভীর নিদ্রামগ্ন, অথচ পরে শুনিতে পাওয়া যায়, সে অবস্থাতেও ভিতরে ভিতরে তাহার জ্ঞান থাকে, তাহার নিকট কেহ কথা কহিলে সে শুনিতে পায়, স্পর্শ অনুভব করিতে পারে, কেবল নয়ন মুদ্রিত থাকায় সে কাহাকেও দেখিতে পায় না। ২৪ ঘণ্টার পর তাহার অল্পে অল্পে জ্ঞান জন্মে, কিন্তু ইহার তিন চারিদিন পরে তবে সে সবল হইয়া উঠে।

পীড়ার আর এক অপূর্ব্ব লক্ষণ তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ কিছুই বুঝা যায় না। কি কারণে তাহার আবির্ভাব তাহা রোগী নিজেই বলিতে পারে না বা বলে না; আমার যদিচ শেষ কথাই ঠিক বলিয়া বিশ্বাস জন্মিয়াছিল।

আমি যখন তাহাকে প্রথম দেখিলাম তখন সে শয্যাগত।

তিন চারিদিন পূর্ব্বে মায়ার একবার মূর্চ্ছা হইয়া গিয়াছে। প্রাণকৃষ্ণ বাবু যখন বলিলেন "চল মায়াকে দেখিবে চল, দেখ দেখি তুমি যদি রোগের কোন কারণ বাহির করিতে পার।" তখন আলুথালুকুন্তল, অসজ্জিত বেশ, চঞ্চলনয়ন, চঞ্চলচরণ, মধুর-চঞ্চল-ভাষী, কৃশকায় ছোট একটি বালিকাকে আমার মনে পড়িল। ৫ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন বিলাতে যাই, তখন মায়া ১২ বৎসরের বালিকা মাত্র। আমি তাহাকেই দেখিব প্রত্যাশা করিয়া প্রাণকৃষ্ণ বাবুর সঙ্গে সঙ্গে মায়ার শয়নকক্ষে পদার্পণ করিয়া সহসা স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম। গৃহে একখানি কৌচে একজন যুবতী অর্দ্ধশায়িত ভাবে অবস্থিত, সুললিত বেশ-বিন্যাস, শুভ্র পরিচ্ছদের

চমৎকার পারিপাট্য, কপালে কুঞ্চিত অলক, শিথিল কবরী সুঠাম গ্রীবার শোভা সম্পাদন করিতেছে ; সহাস অধর, সরল দৃষ্টি, প্রফুল্ল অসঙ্কোচ ঢল ঢল ভাব, শৈশব ও যৌবনের সন্ধিস্থলে অতি মধুর সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ—আমি দেখিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম। ইনি রোগী নাকি? রোগের চিহ্নের মধ্যে ইঁহার মুখমণ্ডল স্নিগ্ধ-পাংশুবর্ণে আরও সুকোমল শোভাময়! আমি দ্বারদেশে পদার্পণ করিয়া দেখিলাম সুন্দরীর হাতে একটি সুন্দর গোলাপ, ফুলটি সে আঘ্রাণ করিতেছিল আমাকে দেখিয়া হাত নীচু করিয়া একটু মৃদু হাসি হাসিয়া বেশ সপ্রতিভ ভাবে বলিল, "আপনার ত কই কিছুই পরিবর্ত্তন দেখিতেছি না, তেমনিই ত আছেন, কেবল সাজসজ্জা কিছু বদল হইয়াছে মাত্র।"

কথার ক্ষীণ স্বরে তাহার দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইল, তাহাতে তাহার সৌন্দর্য্য আরও যেন সহসা বর্দ্ধিত হইল। আমি কি উত্তর করিব ভাবিয়া পাইলাম না, আমার চক্ষে সমস্ত পরিবর্ত্তন! একি সত্যই মায়া! না আমি একটা মহা মায়ার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি! প্রাণকৃষ্ণ বাবু একখানি চৌকি টানিয়া কৌচের নিকটে রাখিয়া আমাকে বসিতে বলিলেন, আমি নিস্তব্ধে বসিলাম; তিনি জানালার নিকটে একখানি চৌকিতে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতে লাগিলেন।

বুঝিলাম আমি নিতান্ত জানোয়ার বনিতেছি, কোন একটা কথা কহা নিতান্ত আবশ্যক—ভাবিয়া বলিলাম "আপনি এখনও নিতান্ত দুর্ব্বল আছেন মনে হইতেছে?"

সে হাসিয়া বলিল "ইহার মধ্যে 'আপনি' হইয়া পড়িয়াছি! বিলাতের গুণ ধরিয়াছে বই কি!"

আমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম "তোমাকে কতটুকু দেখিয়া গিয়াছিলাম! ভুলিয়া যাইতে হয় যে তুমিই সেই?"

"কই আমিত ভুলি নাই—ভোলাটা দেখিতেছি পুরুষেরি ধর্ম্ম!"

কথাটা মায়া নিতান্ত আস্তে আস্তে বলিল, প্রাণকৃষ্ণ বাবু যাহাতে না শুনিতে পান। স্বাভাবিক স্বরে বলিলেও যে তিনি শুনিতে পাইতেন তাহাও নহে, এমনি একাগ্রচিত্তে তিনি খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন।

কথাটা আমার বুকে একটু বিঁধিল, তাই কিছু লাগিল ভাল! আমি বলিলাম "মায়া! তুমি এখনো তেমন দুষ্টু আছ, কথায় তোমাকে পারা ভার, তবে এখন তোমার দুষ্টুমিটা আরও কিছু বাড়িয়াছে। আমি যে তোমাকে ভুলি নাই, চিনিতে না পারাই ত তাহার যথেষ্ট প্রমাণ।"

মায়া বলিল—"শুনিয়া সুখী হইলাম—এখন আপনার বিলাতের গল্প করুন।"

"সে পরে—আগে তোমার ব্যারামের কথাটা শুনি। শুনিলাম যখন অজ্ঞান হও তাহার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও বুঝিতে পার না যে তখনি অজ্ঞান হইবে?"

"না।"

"কি কারণে যে ব্যামটা আক্রমণ করে তাহাও বুঝিতে পার না? আহারের অনিয়মে, কিম্বা বেশী কথা-বার্ত্তা কহিলে, কিম্বা বেশী পড়া শুনা করিলে, কিম্বা অন্য কোনরূপ চিন্তায়—"

মায়া আমার কথা শেষ পর্যন্ত না শুনিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আপনি ডাক্তার মানুষ, সে সব আপনি আবিষ্কার করুন্; অত কিসে কি হয় বুঝিবার ক্ষমতা আমার নাই। ওসব বৃথা প্রশ্ন না করিয়া আপনার গল্প করুন, তাতে আমি কিছু থাকিব ভাল।"

তাহার কথায় আমার মনে হইল—এ কথা সে এড়াইতে চায়, ভাবিলাম ক্রমে বাহির করিব, এখন তবে থাক। বলিলাম—"বিলাতের কথা! সে দেশ নন্দন ভুবন, একবার সেখানে গেলে আর ফিরিতে ইচ্ছা করে না।"

"তবু ফির্‌তে হ'ল,—কি মনস্তাপ! বোধ করি আধ খানা রাখিয়া আসিয়াছেন!"

"আধ খানা কেন সম্পূর্ণ রাখিয়া আসিতেও আমার আপত্তি ছিল না,—তবে কি জান, এ বোঝা যে কেহ বহিতে চাহে না!"

এতক্ষণ আমি এক টানা এক নিশ্বাসে আমার জীবনের কথা বলিয়া যাইতে-ছিলাম, এই খানে থামিয়া পড়িলাম, মৃণালিনী সহসা বলিয়া উঠিল "উদার বটে!"

আশ্চর্য্য! ঠিক এই কথা সে দিন মায়াও বলিয়াছিল; আমি থতমত খাইয়া মৃণালিনীর মুখের দিকে চাহিলাম। মৃণালিনী বলিল "তারপর!"

কি আর বলিব? আমি তখন সমস্ত কথার খেই হারাইয়া ফেলিয়াছি—বলিলাম, "তারপর আর কি? প্রাণকৃষ্ণ বাবুর খবরের কাগজ পড়া শেষ হইলে আমরা বাহিরে আসিলাম।"

মৃণা। অবশ্য হৃদয়টি সেই ঘরের মধ্যে রাখিয়া?

আমি। আমি first sight-এ love বিশ্বাস করি না—নইলে বলিতাম "হ্যাঁ।"

মৃণা। তবে সে জন্যে যে নিতান্ত বহু দর্শনের আবশ্যক হইয়াছিল তাহাও ত' বোধ হয় না।

আমি। এ কথা অস্বীকার করিতে পারি না! এখন বলিতে লজ্জা বোধ হইতেছে; কিন্তু তখন বিনা লজ্জায় এক সপ্তাহ পার না হইতেই আমি প্রাণকৃষ্ণ বাবুর নিকট মায়ার হস্ত প্রার্থনা করিয়া বসিলাম। ওঃ সে দিন কি ভয়ঙ্কর দিন! সে দিনের সে অভিসম্পাৎ লইয়া চির জীবন আমাকে নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইবে। সেই দিন জানিলাম মায়া আমার হইবে না; তাহার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে! তাহার অসুখের জন্য কিছু দিন বিবাহ স্থগিত রহিয়াছে মাত্র! শুনিলাম,—শুনিয়া নৈরাশ্যে অভিভূত হইলাম; কিন্তু সেই জন্যই কি আমার দগ্ধ যন্ত্রণা! না। এরূপ নৈরাশ্যের কষ্ট অনেকেই ভোগ করে, এবং তাহা অতিক্রম করিয়া আবার মাথা তুলিয়াও দাঁড়ায়! আমার এই ভয়ঙ্কর দগ্ধ যন্ত্রণা সে জন্য নহে—"

আমি থামিয়া পড়িলাম। মৃণালিনী সস্নেহে আমার হাত ধরিয়া সাশ্রুনয়ন অবনত করিল, বিন্দু বিন্দু অশ্রুজল আমার হাতে পড়িতে লাগিল। আমি বলিলাম "এই পর্য্যন্ত থাক ভগিনি, তুমি আর শুনিতে পারিবে না।"

মৃণালিনী কম্পিত অথচ ধীর স্বরে বলিল "পারিব, বলুন! আমি দেখি আপনি আমাকে কতদূর বিশ্বাস করিতে পারেন।"

"তবে তাহাই হউক! শোন। প্রাণকৃষ্ণ বাবুর বাড়ী ইংরাজী ক্যাসানের। মধ্যে একটি বড় ড্রইং রুম, উভয় দিকে দুইটি করিয়া কক্ষ। এক পাশের দুইটি কক্ষের একটিতে মায়া ও একটিতে প্রাণকৃষ্ণ বাবু শয়ন করেন; অন্য দিকের একটি আহারগৃহ এবং আর একটিতে আপাততঃ আমি থাকি। যেদিন আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল সে দিন সমস্ত দুপুর বেলা আর আমি মায়ার সঙ্গে দেখা করিতে যাই নাই; বিকালে যাইব ভাবিতেছি—শুনিলাম সেখানে শশী বাবু আছেন, আর দেখা করিতে যাওয়া হইল না। শশী বাবুর সহিত যে মায়ার বিবাহ হইবে সবে মাত্র সেই দিনই আমি জানিয়াছি; তাহার আগে তাঁহাকে এখানে আসিতে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু এ কথা জানিতাম না! সে দিন সন্ধ্যাবেলা আমরা তিনজনে আহারে বসিলাম, প্রাণকৃষ্ণ বাবু, শশী বাবু এবং আমি। মায়া কোন কোন দিন আমাদের সহিত এক টেবিলে খায়, কোন কোন দিন একাকী তাহার গৃহে খায়, সুতরাং তাহাকে টেবিলে না দেখিয়া কেহই আশ্চর্য্য হইল না, বা কারণ জিজ্ঞাসা করিল না। আহারের পর আমরা তিন জনে ড্রইং রুমে আসিয়া

বসিলাম, প্রাণকৃষ্ণ বাবু একটি কৌচে হেলান দিয়া গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে অর্দ্ধ নিদ্রায় মগ্ন হইলেন, আমরা দু'জনেই খানিকক্ষণ চুপচাপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। শশী বাবুকেও আজ নিতান্ত বিষণ্ন বলিয়া মনে হইল! আশ্চর্য্য! তাঁহার মত সৌভাগ্য হইলে আজ আমার আনন্দ ধরিয়া রাখা ভার হইত! খানিক পরে শশী বাবু উঠিয়া গৃহ-কোণ হইতে একটা বেহালা লইয়া তাহার কাণ টিপিতে লাগিলেন, আমি আস্তে আস্তে জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সুন্দর জ্যোৎস্না, শীতের অবসানে মৃদুমন্দ বসন্ত বাতাস বহিতেছে; সেই বসন্ত হিল্লোলে বাগানের গাছ পালা কাঁপিতেছে, ছায়া কাঁপিতেছে এবং জ্যোৎস্নালোকও যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। বেহালার কোমল সুর কম্পিত রজনীর প্রাণ সহসা আরও কাঁপাইয়া তুলিল। বেহালা কাঁদিয়া কাঁদিয়া গাইতে লাগিল, তাহার গভীর দুঃখে নীরব রজনীকে আকুল করিয়া তুলিয়া কি এক প্রাণফাটা সুর বাহির হইতে লাগিল। যখন প্রাণকৃষ্ণ বাবু আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তখন আমি এত বিহ্বল এত আত্মহারা হই নাই, বজ্রাহতের ন্যায় তখন আমি কেবল স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এখন বেহালার প্রতি সুরে আমার হৃদয়ের শিরায় শিরায় নৈরাশ্যের তীব্র যন্ত্রণা জাগিয়া উঠিতে লাগিল, সেই সুরে সুরে হৃদয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিতে লাগিল—

"সে আমার নহে! সে আমার নহে! জীবন মরুময়, জীবন শূন্যময়, জীবন মৃত্যুময়!" আমি যেন পাগল হইয়া উঠিলাম! আর সেখানে দাঁড়াইয়া বেহালার সেই মর্ম্মবিদারী আকুল গান শুনিতে পারিলাম না। গৃহ পরিত্যাগ করিলাম। সম্মুখে মায়ার গৃহ, গৃহদ্বার তখনও উন্মুক্ত, কষ্টের আবেগে মুগ্ধ হইয়া অজ্ঞানের মত তাহার কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলাম—দেখিলাম মায়া জানালার কাছে একখানি কৌচে শুইয়া। আমি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলাম! চন্দ্রালোকে সে সুষুপ্ত সুন্দর মুখখানি কি অনুপম সুন্দর দেখাইতেছিল! দেখিতে দেখিতে ক্রমে আর সকল ভুলিলাম। সে আমার নহে আমি তার নহি ইহাও আর মনে রহিল না! মোহ পরায়ণ হইয়া সেই সুপ্ত দেহ আলিঙ্গন করিয়া বার বার প্রাণ ভরিয়া মুখ-চুম্বন করিলাম।

মৃণালিনী সহসা উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল—"আপনি। চোরের মত—"

"হ্যাঁ—আমিই এই জঘন্য কার্য্য করিয়াছিলাম, ঘৃণা করিতেছেন করুন, কিন্তু মনে রাখিবেন আমি মানুষ—সেই অবস্থায় পড়িলে এখনও হয়ত আমি ঠিক

তাহাই করিতাম ! কিন্তু এ পাপের শাস্তি যাহা পাইয়াছি তাহা শুনিলে বোধ করি পাষাণেরও করুণা সঞ্চার হয় ।”

মৃণালিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, “বলুন ।”

“পরদিন প্রাতে প্রাণকৃষ্ণবাবু বলিলেন, “মায়া কাল রাত হইতে আবার অজ্ঞান হইয়াছে। আমি তাহাকে দেখিতে গেলাম। রাত্রিকালের ব্যবহার মনে করিয়া লজ্জায় অনুতাপে হৃদয় জ্বলিয়া যাইতে লাগিল ; কিন্তু বৃথা লজ্জা ! বৃথা অনুতাপ ! একথা প্রকাশ করিয়া তাহার মার্জ্জনা চাহিতে যে কখনও সাহস হইবে না, তাহা বুঝিলাম। তিন চারি দিনে মায়া আরোগ্য লাভ করিল। ইতিমধ্যে এক ঘটনা ঘটিল। প্রাণকৃষ্ণ বাবু একদিন আমাকে বলিলেন “এখনও তুমি মায়াকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছ ?” আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম “কেন শশী বাবু !” তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, “শশী বলিতেছে, এতদিন সে পিতা মাতাকে এ বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করে নাই এখন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছে তাঁহাদের ইহাতে মত নাই, সুতরাং বিবাহ করিতে সে অনিচ্ছুক।”

বলা বাহুল্য সহসা আমি স্বর্গ হাতে পাইলাম। দুই চারি দিনের মধ্যেই আমাদের বিবাহ হইয়া গেল।”

(৩)

এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমি নিশ্বাস লইতে থামিলাম। মৃণালিনী বলিল, “তারপর ?”

“তারপর ? তারপর জানিলাম কিছুতেই জীবনে সুখ নাই। যাহার জন্য এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, যাহাকে পাইলে জীবনের সুখ পূর্ণ হইবে ভাবিয়াছিলাম—তাহাকে পাইলাম, কিন্তু সুখ পাইলাম না।”

“আমার কর্ম্মস্থলে যাইতে এখনও প্রায় সপ্তাহ কাল বাকী আছে। বিবাহের পর সেই কয় দিনের জন্য আমরা সকলে মিলিয়া প্রাণকৃষ্ণবাবুর গঙ্গার ধারে একটি বাগানে বাস করিতেছিলাম। কিন্তু মনে সুখ থাকিলে তবেই প্রকৃতির শোভা সুখজনক। মায়ার এখন আর সে প্রফুল্ল ভাব নাই, তেমন খুলিয়া সে আমার সহিত কথা কহে না, সর্ব্বদাই বিষণ্ণ। আমি আদর করিলে মুহূর্ত্তের জন্য সে ভাব চলিয়া যায়, কিন্তু তাহার পর অধিকতর ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে, নয়ন অশ্রুতে ভরিয়া উঠে, আমার কাছ হইতে উঠিয়া সরিয়া বসে। ইহাতে কাতর

দেখিলে সে যেন কি বলিতে যায়, কিন্তু পারে না, মুখ ফিরাইয়া অন্য দিকে চায়। আমি বুঝিলাম সে আমাকে ভালবাসে না, শশীকেই ভালবাসিত, তাহার সহিত বিবাহ হয় নাই, তাই তাহার এ ভাব! আমি মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিলাম।

"একদিন দুজনে গঙ্গাতীরে বসিয়া আছি, তখন জ্যোৎস্না পক্ষ; আকাশে পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান্, জলে তাহার ছায়া নৃত্য করিতেছে। জ্যোৎস্নায় দিক্‌দিগন্ত চিত্রপটের মত প্রতিভাত হইতেছে, জলের সহস্র রশ্মি ঝক্‌মক্ করিয়া তরঙ্গিত হইতেছে, পার্শ্বের ছায়া তাহাতে আরও ঘনঘোর সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে,—আমাদের মনের অন্ধকারও এই সুন্দর দৃশ্যের সংস্পর্শে আরও গভীরতর হইয়া উঠিয়াছিল। হঠাৎ গঙ্গার বক্ষে বেহালার সুর বাজিয়া উঠিল, মায়া চমকিয়া সেই দিকে চাহিল—উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল—সেই দিনও ঐ সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল,—ঐ বুঝি—ঐ সে—"

"কে?"

"শশী বাবু। ঐ সুরে আমি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার দোষ নাই আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম,—এই কথা বলিব বলিব করিয়া আমি বলিতে পারি না, আমাকে ক্ষমা কর—"

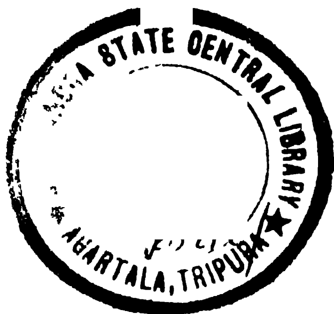
"আমি বুঝিলাম, সে কি বলিতেছে। অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া উঠিল—তবু বলিতে পারিলাম না যে সে ব্যক্তি শশী বাবু নহেন—আমি। লজ্জায় আমার মুখ বন্ধ হইয়া গেল। সে আবার বলিল, "সেই দিন দিনের বেলা আমি শশী বাবুকে বলিয়াছিলাম—তাঁহাকে আমি বিবাহ করিতে পারিব না, আমি তোমাকে ভালবাসি। তিনি কোন কথা না কহিয়া চলিয়া গেলেন, আমার বড় দুঃখ হইল। আপনাকে অভিসম্পাৎ করিতে করিতে আমি কাঁদিতে লাগিলাম। তাহার পর যখন অন্য ঘর হইতে তাহার বেহালা কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার হৃদয় প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন আমার হৃদয় যেন ফাটিয়া উঠিতে লাগিল; একটু পরেই আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। সেই সুর, সেই বিলাপ আমাকে অজ্ঞান করিয়াছিল, আমি তাঁহার জন্য প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার বিনিময়ে তাহার প্রতিশোধ স্বরূপ দুরাত্মা সেই অসহায় অবস্থায় আমাকে স্পর্শ করিয়াছে। আমাকে ক্ষমা কর, আমার দোষ নাই। আমি তোমাকেই ভালবাসি।" আমার হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল; আমি প্রাণপণে বল সংগ্রহ করিয়া তাহার হাতখানি ধরিয়া বলিতে

যাইতেছি "শশী বাবু নহেন আমিই সেই দুরাত্মা"—আর বলা হইল না, সহসা অজ্ঞান হইয়া মায়া সেই উচ্চ সোপান হইতে জলে পড়িয়া গেল, মুহূর্তকাল আমি স্তম্ভিত বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম, তাহার পর আমিও জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম কিন্তু—"

মৃণালিনী এই সময় সহসা কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "ভাই, আমি মরি নাই বাঁচিয়া আছি! যদি কেবল একবার তখন আজিকার এই কথা বলিতে!"

———





পরাজয়

অনুরূপা দেবী

তখন সবেমাত্র প্রভাত হইয়াছিল। সমুদ্রের নীল জলে নবোদিত সূর্য্যের গোলাপী রশ্মি সবেমাত্র পতিত হইয়া তাহার অনন্ত নীলকে বৈদূর্য্যমণিপ্রভ করিয়া তুলিয়া ক্রমশঃ তাহার চারিপাশে সুবর্ণচূর্ণ ছড়াইয়া তাহাকে আরও উজ্জ্বল করিতে করিতে যেন একখানি প্রশস্ত ইন্দ্রধনুর ন্যায় শোভা ধারণ করাইল। চলন্ত মেঘের মত সাদা পাল তুলিয়া ছোট নৌকাগুলি শুভ্র তরঙ্গের মুখে ভাসিতে লাগিল।

তীরে তালকুঞ্জে শ্যামল দূর্ব্বাসনে বসিয়া নবীন চিত্রকর অতৃপ্ত নেত্রে সমুদ্রের দিকে চাহিয়াছিল। বালুকাময় বেলার উপর শ্বেতফেনপুঞ্জ কিরীটী তরঙ্গ সকল মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া মধুর মূর্চ্ছনা গাহিতেছিল। পাখীরা তাহাদের সদ্যো-নিদ্রোত্থিত অলসনেত্র মেলিয়া আধস্বপ্ত আধজাগ্রৎ জগতের পানে চাহিতেছিল। চিত্রকরের পার্শ্বে তাহার অর্দ্ধসমাপ্ত চিত্র "ঊষা" ও তাহার অঙ্কনসামগ্রী সকল স্থাপিত ; চিত্রে বর্ণ ফলাইতে ফলাইতে বিমুগ্ধ চিত্রকর চিত্রাঙ্কন ভুলিয়া ভাব-বিভোর চিত্তে চাহিয়া আছে।

ক্রমে সূর্য্যের তেজ একটু খর হইল, পাখীরা প্রভাতী গাহিয়া চারিদিকে ছুটিল, নবীন চিত্রকর সচকিত নেত্রে চারিদিকে চাহিয়া চিত্রখানা টানিয়া লইল। তখন ঘাসের উপর শিশিরবিন্দু শুকাইয়া গিয়াছে। চিত্রের মধ্যে ঝলমল অর্দ্ধলোকে শিশিরসিক্ত কুসুমদলে দাঁড়াইয়া ঊষা-প্রতিরূপা বালিকা সহাস্যাননা! অতৃপ্ত

নেত্রে যুবক আলেখ্যলিখিত প্রতিমার পানে চাহিয়া মুগ্ধ কণ্ঠে উচ্চারণ করিল, "রেবা!" "কি?"

চিত্রের প্রতিমা সেই মুহূর্ত্তে যেন শরীর গ্রহণ করিয়া ছায়াচ্ছন্ন তালীবনান্তরাল হইতে চঞ্চলচরণে বাহির হইয়া আসিল!

"তুমি এসেছ? অনেক দেরী হ'য়ে গেছে, মনে হচ্ছিল—"

"কি?"

"বুঝি এলে না।"

"না এসে কি করি, তুমি আমার জন্য ভোর থেকে ব'সে আছ, তাই আমারও মন কেবলি আসবার জন্য অস্থির হয়, তবও কাজ শেষ করতে দেরী হ'য়ে গেল।"

"ছাই কাজ।" রেবা কলস্বরে হাসিয়া উঠিল, "কাজ ছাই-ই হোক্ পাশই হোক্ না করলে চলে কি? বাড়ীওয়ালী এমন না! আচ্ছা এখন নাও আমি বস্‌ছি, কিন্তু এই দেখ—এখনি হাসি পাচ্ছে!"

যুবক তুলি ধরিয়া হাস্যচঞ্চলা বালিকার মুখে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিল, তাহার মুখে চোখে হাসির উৎস যেন প্রস্রবণের মত চারিদিকে আনন্দ ছড়াইতেছিল। সেও অকস্মাৎ হাসিয়া ফেলিল, "এমন ক'রে যদি কেবল হাসাস্ রেবা তা হ'লে তো কোন কাজই হয় না। যাঃ!" এই বলিয়া সে তুলিটা ফেলিয়া দিয়া তাহার হাস্যোচ্ছ্বাসসুন্দর মুখখানার দিকে প্রীতি প্রফুল্লনেত্রে চাহিয়া থাকিল।

"আচ্ছা বিভূতি বাবু! তুমি বাড়ী গেলে ছবি আঁকা হবে কি ক'রে? অন্য 'মডেল' রাখ্‌বে?"

বিভূতি এই কথায় যেন চমকিয়া উঠিল। এ প্রশ্ন যেন তাহারি অন্তরের প্রশ্ন! তাহার মুখের ভাব সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল, কহিল, 'তাই ভাব্‌চি রেবা তখন কি হবে। আমার সঙ্গে তুমি কেন সেখানে চল না! যাবে?"

রেবা মৃদু হাস্যের সহিত ঈষৎ চিন্তিতভাবে কহিল, "আমি—সেখানে? না। যদি কেউ কিছু বলে?"

"কে, কি বলবে?"

কে, যে কি বলিতে পারে সে কথা সে ভাল বুঝে না, কিন্তু কিছু যে কথা উঠা সম্ভব শুধু এই একটুখানি অস্পষ্ট ধারণা তাহার আছে। সে ভাবিতে ভাবিতে উত্তর করিল, "এই বল্‌বে যে এ আবার কোথা থেকে এলো?"

"তা বল্‌তে হয় বলুক আমি তাদের উত্তর দিতে পারবো, তুমি চল, না,

তুমি আমার সঙ্গে চল রেবা—তা না হ'লে আমিও যাব না।" রেবা বিস্ময় বোধ করিল, এসব তো হাসি খেলার সুর নয়! তবে সত্যই তাহাকে যাইতে হইবে নাকি? সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি তাদের কি বলবে?"

"বল্‌বো? বল্‌বো রেবা আমার স্ত্রী, আমি ওকে বিবাহ কর্‌বো ব'লে নিয়ে এসেছি।" বনবিহঙ্গিনী বিস্ময়ে অস্ফুটধ্বনি করিয়া বিস্ফারিতনেত্রে প্রস্তাবকারীর মুখের দিকে চাহিল। একি পরিহাস!

॥ ২ ॥

বিভূতি বড়লোকের ছেলে। মায়ের সাধ শীঘ্র শীঘ্র সে একটি ডানাকাটা পরী ঘরে আনিয়া দিয়া মাতৃঋণ শোধ করে; কিন্তু ছেলে একেবারে ঘোর বিবাহ-দ্বেষী। সে গ্রামের বিদ্যা, সহরের বিদ্যা শেষ করিয়া ললিতকলার সাধনায় ইদানিং মন দিয়াছে; সে বলে বিবাহের সময় এখনও তাহার হয় নাই। যেদিন তাহার মনের মত পাত্রী মিলিবে সেদিন নিজেই সে বিবাহের উদ্যোগ করিতে মাকে খবর দিবে, এখন তিনি নিশ্চিন্ত থাকুন। বৎসরের পর বৎসর কাটিল কিন্তু এ পর্য্যন্ত মন কোন বিবাহমাল্য-ধারিণীকে নিজের মত করিয়া লইল না, কাজেই এখনও সে "আইবুড়"।

বন্ধু প্রমথনাথ দূরে দাক্ষিণাত্যে ভাস্কর শিল্পশিক্ষায় যশ অর্জন করিয়াছেন। বন্ধু বন্ধুর নিমন্ত্রণে আসিয়া দেখিল যে, সে এক মঞ্চোপরি স্থাপিতা বীণাধারিণী বাণীর প্রতিমা গঠন করিতেছে, আর তাহারি জীবন্ত প্রতিমা স্বল্পমাত্র দূরে দাঁড়াইয়া। সে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কে?"

"দেখ্‌তেই পাচ্চ 'মডেল'।"

"মডেল? ছোটলোকের ঘরের মেয়ে?"

"না ঠিক তা নয়, গরীব ব্রাহ্মণের মেয়ে, এখন অনাথা। যার বাড়ী থাকে, তাকে কিছু দিয়ে আমি মডেল করেছি চেহারাখানি ভাল, না?"

"কি সুন্দর মূর্ত্তিটি! আহা এর এত দুঃখ!"

"মন যে একবারেই গ'লে গেল, দেখ সাবধান! এত করুণাও ভাল নয়।"

বিভূতি ভৎ'সনাপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিল, "ছিঃ শুন্‌তে পাবে যে।"

"ওঃ ঐ রেবা? ও কিছুই বুঝ্‌বে না মেয়েটা ভারি বোকা!"

"হ্যাঁ দেখ্‌লেই বোঝা যায় খুব সরল।"

প্রমথ কহিল, "ও যাই বল, মোদ্দাৎ সংসারানভিজ্ঞ এমন দেখনি। এই জন্যে আমার ভয় হয় কোন্ দিন কোন্ পাপিষ্ঠের ফাঁদে প'ড়ে না জন্মের মত ব'য়ে যায়।"

ব্যথিত নেত্রে বিভূতি তাহার নীরব হাস্যোৎফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। 'মডেল' এতক্ষণ ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া অপাঙ্গে আগন্তুককে দেখিতেছিল, এবার আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে না পারিয়া সোজা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল—"তুমিও খড়ির পুতুল গড়্‌বে ? আজ কিন্তু বেলা হ'য়ে গেছে আমি আর দাঁড়াতে পার্‌ব না, কাজ কর্‌তে যাব।"

মুগ্ধ বিভূতি জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাজ তোমার ?" "কাজ কি জান না ?" বলিয়া সে হাসিল ; "এই জল তোলা, বাসন মাজা, ঝাঁটপাট দেওয়া— এই সব।"

বিভূতি কহিল, "আহা !"

প্রমথ তাহার মডেলকে একটা ধমক দিল, "স্থির হও রেবা ! পায়ের আঙ্গুল-গুলি ঠিক সমান করে রাখ।"

বিভূতি মাতাকে পত্রে জানাইল সে এইখানেই কিছুদিন চিত্রাঙ্কন শিক্ষার্থ প্রমথর নিকট থাকিবে, স্থান বড়ই ভাল। পত্র পাঠান্তে মাতা মোক্ষদায়িনীর দুই চক্ষু কপালে উঠিল। গ্রাম ছাড়িয়া যাহাকে গ্রামান্তরে যাইতে দিতে সাতবার হরির লুট মানত করেন, সে ছেলে কোন্ বিদেশে চলিয়া গেল! আবার সেইখানেই সে থাকিবে ? প্রথমে তিনি রাগিয়া বাড়ী মাথায় করিলেন, পরে ঠাকুরঘরে গিয়া মাথা কুটিয়া রক্তপাত করিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, "হে ঠাকুর ! আমার ছেলে ফিরিয়ে আন, আমার দুধের বাছা কোন্ দুঃখে বিদেশে বিবাগী হ'য়ে প'ড়ে থাকে ?"

কিন্তু ছেলে তথাপি ফিরিল না। মা কান্না-কাটি ও একাদশীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া শেষে নিস্ফল আক্ষোভে 'ললিত কলার' সমূল ধ্বংস কামনায় প্রত্যহ জপ সংখ্যা এক সহস্র পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া দিলেন। এমনি করিয়া বৎসর ঘুরিল। অনেক ভাল ভাল বিবাহ সম্বন্ধ আসিয়া ফিরিয়া গেল, ছেলে ঘরেই ফিরে না, বিবাহ করিবে কে ? পত্র আসে "আর দু'মাস দেরি কর, কার্য্য সফলপ্রায়।"

ইতিমধ্যে প্রমথ তাহার ছোট ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষে দেশে চলিল। অনেক অনুরোধ উপরোধেও বিভূতিকে সে সাথী করিতে পারিল না। কিন্তু প্রমথর নিকট হইতে পুত্রের সংবাদ গ্রহণকালে মোক্ষদায়িনী এমন কিছু

সংবাদাভাষও পাইলেন যাহাতে আবার একটা কান্নাকাটনা উপবাস-তিরাসের পালা পড়িয়া গেল এবং পালা সাঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই বিভূতির নিকট তারে সংবাদ পৌছিল যে তাহার মায়ের কঠিন পীড়া, শেষ সাক্ষাতের ইচ্ছা থাকিলে যেন শীঘ্র চলিয়া আইসে।

॥ ৩ ॥

বিভূতি নিজের মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল যে সে অনাথা ব্রাহ্মণ-কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবেই, ইহাতে তাহার ভাগ্যে যাহা হইবার হউক। এজন্য তাহাকে সমাজচ্যুত হইতে হয়, সে না হয় দেশের পল্লীভবন ত্যাগ করিয়া কলিকাতার জনস্রোতের মধ্যে নূতন গৃহপ্রতিষ্ঠা করিবে,—সে গৃহের গৃহলক্ষ্মী যখন লক্ষ্মীরূপিণী রেবা তখন তাহার আর কি চাই ?

রেবা আসিয়া তাহার সঙ্গীতময় হাস্যলহরে সে চিন্তামুকুলের পাপড়িগুলি যেন খুলিয়া দিল। "তুমি এখন পর্য্যন্ত ঘরের মধ্যে একা ব'সে আছ ; ঘুমুচ্চ নাকি ?"

"না রেবা ঘুম আমার চোখে কতদিন আসেনি তুমি তার কি জানবে ? এসো আমাব সামনে একবার দাঁড়াও, আমি তোমায় দু'চোখ ভ'রে শুধু দেখি !"

বিস্ময়ের হাত ধরিয়া কৌতুক যেন সেই দুটি বিশাল চোখের ঘন কালো তারার মধ্যে পাশাপাশি দাঁড়াইল। রেবা একটুখানি অগ্রসর হইল। "এম্‌নি ক'রে ছবি আঁক্‌বে আবার ?"

অতৃপ্তনেত্রে চাহিয়া চিত্রকর কহিল, "না রেবা, ও মুখের চিত্র এই বুকেই থাক, বাহিরে ও ব্যর্থ চেষ্টা আর নয় ! এখন এসো তুমি আমার কাছে এসো, তুমি আমার হও,—আমার ঘরে চল।"

"ফের সেই কথা ? তুমি খালি খালি পাগলের মতন ওসব কি বল ? আমার গয়না নেই, ভাল কাপড় নেই, আমি তোমার বউ কেমন ক'রে হব,—লোকে যে হাস্‌বে !"

"আমি সে সব তোমায় দেব, কেউ তাতে হাস্‌বে না, তুমি কি আমায় ভালবাস না ?"

রেবা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, বাসে। "তবে আবার ওসব বল্‌চ কেন ? আর দেরি নয়, দুএক দিনের মধ্যেই বিয়ে হ'য়ে যাক্।" এই বলিয়া

আবেগোত্তেজিত বিভূতি তাহার হাতটা ধরিল। "এখন ব'স, দু'জনে পরামর্শ করি কেমন করে—" সহসা হাত ছাড়াইয়া লইয়া রেবা সভয়ে দুই পা পিছনে সরিয়া গেল। "না বিভূতি বাবু! কাজ নেই সবাই যদি তোমায় বকে?" বিভূতি ব্যাকুলকণ্ঠে কহিল, "তুমি সবার কথাই কেবল ভাব্চ, আমার জন্য একবারও ভাব্চ না রেবা! যদি তুমি আমায় ত্যাগ কর, আমি ওই সমুদ্রে ডুবে মরবো;"—সভয়ে বালিকা তাহার দিকে সরিয়া দাঁড়াইল, ভীতিপূর্ণস্বরে কহিয়া উঠিল, "না তুমি ম'রো না; আমি তোমার কথাই শুনবো"—"তবে আজ কিম্বা কালই আমাদের বিয়ে হ'য়ে যাক্, প্রমথ এলে হয়ত সে এতে বাধা দেবে।"

সেই দিনই হঠাৎ প্রমথ বাড়ী হইতে ফিরিল। সংবাদটাও তাহার নিকট গোপন রহিল না। সে ঘোর আপত্য করিয়া কহিল, "একি শুনি? এ অসম্ভব!"

বিভূতি ধীরকণ্ঠে কহিল, "জগতে কিছুই অসম্ভব নয়, আমি চিত্ত স্থির করেছি।"

"সে কি বিভূ? দেশে মা আছেন, সমাজ আছে, এমন কাণ্ড কি করে? নিজের দেশে সুন্দর কনের অভাব কি?"

দৃঢ়কণ্ঠে বিভূতি উত্তর করিল, "কেন মিথ্যা উপদেশ দিবে? ঢের তো দিয়েছ আগেও। ও সব কথাই আমি জানি, কিন্তু আবার এও জানি যে রেবাকে না পেলে আমার জীবন অন্ধকার—বেঁচে থাকা বিড়ম্বনামাত্র।" ক্ষুণ্ণ প্রমথ সবিষাদে কহিল, "তবে আর কি বল্‌ব? মোহটা ত্যাগ কর্‌লেই ভাল করতে!"

"প্রমথ! ছিঃ, তুমি একে মোহ বল? জান না তার 'পরে আমার ভালবাসা কত গভীর।"

সেইদিনই সন্ধ্যার পূর্ব্বে আবার বাড়ী হইতে আরজেন্ট টেলিগ্রামে সংবাদ আসিল, "তোমার মা মৃত্যুশয্যায়, শেষ সাক্ষাতের যদি ইচ্ছা হয় অবিলম্বে আইস।" এ আবেদন অতি বড় পাষণ্ডও উপেক্ষা করিতে অক্ষম। রাত্রের গাড়িতেই বিভূতি বাড়ী রওনা হইল।

॥ ৪ ॥

বিভূতি চলিয়া গেলে, প্রমথ রেবাকে ডাকাইয়া আনিল। সেই তাহাদের চিত্রশালা, সেখানে গৃহভিত্তির চারিধারে, আসনে, মঞ্চে, পটে, প্রতিমায়

তাহারি সুললিত মূর্ত্তিটি অর্দ্ধস্ফুট মুকুলের মত ফোটে ফোটে হইয়া আছে। বেত্রাসনে বসিয়া নত মস্তকে ভূমে ক্রসটা ঠুকিতে ঠুকিতে প্রমথ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রশ্ন করিল, "বিভূতি তোমায় বিয়ে করতে চায়,—না রেবা?" রেবা মস্তক হেলাইয়া জানাইল যে 'হাঁ', তারপর ঈষৎ সঙ্কুচিত ভাবে সে প্রশ্ন করিল, "আপনি কি ক'রে জান্‌লেন? একথা কাউকে বল্‌তে তিনি বারণ করেচেন, আমি যে ব'লে ফেল্‌লাম?"

প্রমথ কহিল, 'তা হোক্, তাতে কিছু ক্ষতি হয় নি; তাকে বিয়ে কর্‌তে তোমারও কি ইচ্ছা আছে?" মারাঠি বালিকা আবার নীরবে নিজের সম্মতি জ্ঞাপন করিল। প্রমথ কিছু বিপন্ন বোধ করিল, একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "কিন্তু তাতে ওর ভারি ক্ষতি হবে, ওর মা কাঁদ্‌বে, সকলে ওকে ত্যাগ কর্‌বে, নিন্দা কর্‌বে,—তবু তুমি ওকে বিয়ে করবে?"

এবার মুখ তুলিয়া বালিকা প্রশ্নকর্ত্তার মুখের দিকে ব্যাকুল প্রশ্নপূর্ণ নেত্রে চাহিল। প্রমথ কহিল, "বুঝ্‌তে পার্‌চ না, তুমি গরীব মারাঠির মেয়ে, সে বাঙ্গালী ভদ্রঘরের সন্তান।"

এই কথায় যেন অনেকখানি দুর্ভাবনা দূর হইয়া গেল, এমনি সহজ ভাবে হাসিয়া সে কহিল, "তিনি বলেছেন আমায় অনেক গহনা দেবেন, আমি তো তখন গরীব থাক্‌বো না!"

"হা নির্ব্বোধ! একে আমি কেমন ক'রেই বা বুঝাবো! না রেবা তুমি জানো না এই বিয়েতে তার তুমি কি সর্ব্বনাশ করতে যাচ্চ। শুধু তার নয় তার বংশের, পিতৃপুরুষের, তার ভবিষ্যৎ বংশ ধরের পর্য্যন্ত কলঙ্ক, অপযশ, অপমান! তবুও এ বিয়ে কর্‌বে?"

রেবার চিরপ্রফুল্ল মুখখানি শুকাইয়া গেল, সে আতঙ্ককম্পিতকণ্ঠে ব্যাকুলভাবে তৎক্ষণাৎ কহিল, "না!" তারপর প্রমথর গম্ভীর দৃষ্টি হইতে সভয়ে দৃষ্টি নামাইয়া লইল।

তখন সন্তুষ্টচিত্তে প্রমথ কহিল, "তবে এক কাজ কর রেবা,—এখান ছেড়ে তুমি কোথাও, কোন দূর দেশে যাও,—তোমার কি কেউ কোথাও নেই?"

রেবা নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িল। তাহার ঘন চোখের পাতা তখন ভারি হইয়া আসিয়াছিল।

"তবেই তো! আচ্ছা এক কাজ কর, সোলাপুরে আমার একটি আত্মীয়

স্ত্রীপুত্র নিয়ে আছেন, আপাততঃ সেইখানেই তুমি যাও, তারপর আমি তোমার যা হয় ভাল একটা ব্যবস্থা ক'রে দেব। কেমন যাবে তো?"

রেবা আবার শিরঃসঞ্চালন করিল, তাহার পুষ্পপেলব তুল্য অতি কোমল অধরোষ্ঠ ঈষৎ কাঁপিতেছিল। "তবে আর বিলম্ব কি? আজই যাও। বাড়ীওয়ালীকে আমি রাজী করিয়েছি, রাত্রের ট্রেণেই বেরিয়ে পড়—"

সহসা এই কথায় চমকিয়া উঠিয়া বালিকা মুখ তুলিল। ব্যাধের তীর হরিণীকে যে এখনি বিঁধিবে, তাহা সে বুঝি বুঝে নাই! তাহার এই যন্ত্রণা ব্যথিতভাবে প্রমথ একটুখানি থতমত খাইয়াও জোর করিয়া বলিল, "হ্যাঁ রেবা আজই যাও, দেরি করা ভাল নয়।"

এবার বালিকার বিশালনেত্র হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া তাহারই পায়ের তলার মাটিতে পড়িয়া গেল। অকস্মাৎ সে দুই হাতে মুখ ঢাকা দিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রমথ হতবুদ্ধির মত তখন নীরবে চাহিয়া রহিল, মনের মধ্যে সেও বুঝি একটু অনুতপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আহা! এই কচি কিসলয় প্রাণটি সে স্বহস্তে দলিত করিবার ভার কেনই লইল? কিন্তু না, এ দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় অনুচিত। সমাজ সব চেয়ে বড়, এবং তারপরেও বন্ধুত্ব! বন্ধু হইয়া বন্ধুকে এই মোহ হইতে রক্ষা করিবে না? কত দিনের এ পরিতাপ? মনকে কঠিন করিয়া তাহাকে দৃঢ়স্বরে কহিল, "তুমি সব ঠিক ক'রে রাখগে রেবা, আমি এখনি গিয়ে তোমায় তুলে নিয়ে আস্‌ব, যাও লক্ষ্মীটি অমন ক'রে আর কেঁদ না—" রেবা চোক মুছিবার ছলে কাপড় দিয়া মুখ ঝাঁপিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল, কিছুতেই সে নিজেকে সংবরণ করিতে পারিল না। আর যে একটি ক্ষুদ্র শেষ অনুরোধ তাহার দুর্ব্বল বুকখানার মধ্যে প্রকাশের জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছিল, তাহাও সে ফুটাইতে না পারিয়া কিছুক্ষণ পরে নতনেত্রে কোনদিকে না চাহিয়াই চলিয়া গেল। প্রমথর মনে হইল তাহারি অনুকৃতি করা প্রাণহীন একটা গড়া মূর্ত্তি যেন এই চিত্রশালা হইতে কোন যন্ত্র চালাইয়া লইয়া যাইতেছে।

॥ ৫ ॥

বিভূতি বাড়ী গিয়া দেখিল দ্বারে নহবৎ বাজিতেছে এবং দাস-দাসীরা রঙিন কাপড় পরিয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া কর্ম্ম কাজ করিতেছে। বিস্মিত হইয়া সে অন্দরে প্রবেশ করিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, 'মা'! গৃহিণী তখন একটা ঘরের মধ্যে শুভচণ্ডী ও সত্যনারায়ণের পূজায় কত গণ্ডা কদলীর আবশ্যক, একজন

আশ্রিতাকে তাহাই বুঝাইয়া দিতেছিলেন, এবং মটকাসাড়ীর প্রান্তটা জানুর কাছ পর্য্যন্ত গুটাইয়া ধরিয়া, অতি কষ্টে শুচিতা রক্ষা করিয়া, বাড়ীময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলকার প্রতি হুকুমজারী করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইতেছিলেন। বিস্মিত বিভূতি দেখিল কঠিন পীড়ার পরিবর্ত্তে বেশ একটি বড় রকম উৎসবের সূচনা হইয়াছে। মুহূর্তের জন্য তাহার বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল,—"তবে কি—না তাহা হইলে বাজনা বাজে কেন?" ছেলের মুখের 'মা' ডাক শুনিয়া মোক্ষদায়িনী শুচিতা, কদলী সব ভুলিয়া দ্রুতপদে ছুটিয়া আসিলেন। এ ডাক যে তিনি কতকাল শুনিতে পান নাই। তরি জন্য যে প্রাণ তাঁহার যায় যায় হইয়াছে। "বাবা আমার এলি রে?"

মাকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখিয়া বিভূতির মনটা মুহূর্ত্তে বাঁকিয়া দাঁড়াইল, ঈষৎ রুক্ষস্বরে সে কহিল, "এই বুঝি তোমার অসুখ।" মাতা পুত্রের পরিশ্রমম্লান মুখখানি সযত্নে আঁচল দিয়া মুছাইয়া বলিলেন, ও বাবা বড় অসুখ হয়েছিল বে, মর্‌তে মর্‌তে বেঁচেছি।"

পুত্র এ কৈফিয়তে বিশেষ খুসী হইল না, সে মুখটা সরাইয়া লইয়া একটু উদ্ধতভাবেই আবার বলিল, "ভালতো আছ তবে অনর্থক আমায় এতদূর থেকে টেনে আনা কেন? এ সব কি?" আঙ্গুল দিয়া সে বাজনদারদেব দিকে নির্দ্দেশ করিল।

গৃহিণী একটু ঢোক গিলিয়া বলিলেন, "ও একটা কাজ আছে, তা তুই নেয়ে-খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হ' বল্‌বো তখন।"

বিভূতি কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় বাড়ীর পুরাতন সরকাব একটা ছবি আনিয়া গৃহিণীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "এই ছবি কনের বাড়ী থেকে এসেছে। তা এ দিব্যি মেয়ে, বিভু তুমি নিজেই দেখে কেন বল না।"

বিভূতি প্রথমটা ভাল করিয়া না বুঝিয়া ফটোগ্রাফখানা হাতে করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু যেমনি ইহার মধ্যের সত্যটা তাহার নিকট একটি দিব্য ফুটফুটে বালিকার মূর্ত্তিতে প্রকাশ হইয়া আসিল, অমনি আকস্মিক ক্রোধ ও বিরক্তি তাহাকে মুহূর্ত্তে উন্মত্তপ্রায় করিয়া তুলিল। সক্রোধে ছবিখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মায়ের পানে ফিরিয়া বলিল, "এইজন্য বুঝি আমায় ছল ছুতো ক'রে এখানে আনা হ'ল? এমন যদি কর তাহ'লে আমি জন্মের মতন চলে যাবো জেনে রেখ, কিছুতেই আর এ-মুখো হবো না। আমি যাকে পছন্দ করেছি তাকে ছাড়া অন্য

মেয়ে আমি বিয়ে কর্‌বো না, তোমরা মিথ্যে মিথ্যে এমন ক'রে আমায় জ্বালিও না বল্‌ছি!"

গৃহিণীও আর সহ্য করিতে পারিলেন না, সক্রোধে বলিলেন, "তাকে কক্ষণো তুই বিয়ে কর্‌তে পাবি না। কোথাকার ছোটলোকের মেয়ে, একটা ধিঙ্গি মারহাট্টির মেয়ে আমার শ্বশুরবংশের বউ হবে! তোর এত বড স্পর্দ্ধা?"

বিভূতি চীৎকার করিয়া বলিল, "নিশ্চয় আমি তাকে বিয়ে কর্‌বো, তোমার খুসী না হয় তুমি তাকে তোমার শ্বশুরবংশের বউ ব'লো না, তাকে ঘরে নিও না, আমি তাকে বিয়ে কর্‌বই।

যেমনি আসিয়াছিল তেমনই সে বাড়ী ছাড়িয়া পায়ে হাঁটিয়া ষ্টেশনের দিকে তখনি চলিয়া গেল। তাহার রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া কেহ একটু বাধাও দিতে সাহস করিল না। অপমানিতা মোক্ষদায়িনী অবমানিত কর্ত্তৃত্বের এবং আহত মাতৃত্বের তীব্র আঘাতে বহুক্ষণ রোষক্ষুব্ধ দণ্ডাহত বিষধর সর্পের মতই গর্জ্জিতে লাগিলেন, রুদ্ধরোষে জ্বলন্ত বস্ত্রখণ্ডের মত আপনার আগুনে আপনিই দগ্ধ হইতে লাগিলেন। মাতৃত্বের স্নেহগর্ব্বে এত বড আঘাত কে কবে পাইয়াছে?

তারপর পুত্র সত্যসত্যই ফিরতি ট্রেণেরও অপেক্ষা না করিয়া একটা পেসেঞ্জারে চড়িয়া সেই দূর পথে ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া পূজার ঘরে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন। "আমি তোমার কাছে কবে কি অপরাধ করেছিলুম ঠাকুর? এমন করে তুমি আমার বুক থেকে ডাকিনীকে দিয়ে যে আমার ছেলে কেড়ে নিলে? হে অনাথনাথ হরি! অনাথার ধন ফিরে দাও, আমি তোমার সোণার বেদি বাঁধিয়ে দোব। আমার যে আর কেউ নেই গো, আমার যে আর কেউ নেই!"

॥ ৬ ॥

অস্তমান সূর্য্যের রাঙ্গা আলোটুকু বর্ষার বর্ষণক্লান্ত মেঘের স্তর ভেদ করিয়া চারিদিকে উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই সোণালি আলোকে প্রমথনাথ নিজেদের ক্ষুদ্র বাগানটির একটা নূতন গোলাপগাছের চারার নূতন মুকুল, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। কয়দিন ধরিয়াই সে সর্বদা সশঙ্কিত হইয়া আছে,—দেশের খবর পায়ও না, লইতেও সাহস করে না, কি জানি যদিই তাহার চোখ পড়ে!

এমন সময় পশ্চাতে দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল, মুখ ফিরাইতে না

ফিরাইতে ঝড়ের মত বেগে বিভূতি আসিয়া উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "রেবা কোথায় ?"

আকস্মিক বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া প্রমথ উত্তর করিল, "আমি কি জানি ?"

"বাঃ তুমি জানো না তো কে জানে ? শীঘ্র বল তাকে কি করেছ ?"

"আমি আবার তাকে কি করবো ?"

"বল্‌বে না ?" "আমি জানি না।"

বিভূতি সবলে প্রমথর হাত চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "শীঘ্র বল না হ'লে আমি আত্মঘাতী হব।"

ভীত হইয়া প্রমথ উত্তর করিল, "ছাড়, ছাড়, হাতে লাগে,—শোন বল্‌চি, সত্যই আমি জানি না, তাকে যেখানে পাঠিয়েছিলুম সেখানে সে যায় নি। খবর পেয়েছি, গাড়িতে একজন সন্ন্যাসী ছিলেন বোধ হয় তাঁরই সঙ্গে অন্য ষ্টেশনে নেমে গেছে। আমিও তার জন্য উদ্বিগ্ন।" বিভূতি মাটিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "কেন তুমি তাকে পাঠিয়েছিলে ?"

প্রমথ ধীরে ধীরে কহিল, "তোমাকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য।"

"আমার সর্ব্বনাশ কর্ব্বার জন্য বল, তুমি আমার বন্ধু না ?'

"হ্যাঁ, তাই তোমার বন্ধুরই কাজ করেছি। স্থির হও,—ওঠো, শোন।"

বিভূতি উঠিয়া বলিল, "তুমি না বল আমি পৃথিবী খুঁজে তাকে বা'র কর্ব্বো।"

সে যাইতে উদ্যত হইল, প্রমথ বাধা দিয়া এবার তাহার হাত ধরিল। "কি কর্‌চ, তুমি কি পাগল হয়েছ ?"

"হ্যাঁ হয়েছি, কিন্তু আমায় তোমরাই পাগল করলে, উপকার যদি বল ঐটুকুই যা করেছ !"

"বিভু ! বিভু ! ভেবে দেখ সমাজ, সংসার—"

বিভূতি হাত ছিনাইয়া লইল। "গোল্লায় যাক্ সমাজ সংসার ! সমাজ সংসার আমার কে ? অগ্রসর হইয়া প্রমথ বলিল, "কিন্তু পিতৃপুরুষ, মা ?"

বিকট-চক্ষে চাহিয়া সে উত্তর করিল, "আমার কেউ নয়, আমি কারু নই।"

তারপর উন্মাদ কঠোর হাসি হাসিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

॥ ৭ ॥

কলিকাতা বিডন উদ্যানে সেদিন ভারি ভিড়। পাশাপাশি দুইটা বেদি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। বেদান্ত-প্রচারক আনন্দস্বামী, তিব্বত, চীন, জাপান ও আমেরিকা ভ্রমণান্তে ফিরিতেছেন। পথে সমস্ত সহরে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা হইতেছে এবং শিক্ষিত অশিক্ষিত জনমণ্ডলী ঝুঁকিয়া পড়িয়া মহাআগ্রহে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতেছে। আজ তিনি কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন তাই তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য নগরবাসিগণ উৎসুক হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। একখানা গাড়ির ঘোড়া খুলিয়া, ফুল দিয়া সাজাইয়া তাঁহার ভক্তেরা তাঁহার জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিল, সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "অনাবশ্যক ভারবহনে তোমরা এতই ব্যগ্র কেন? শক্তি সঞ্চয় ও পরিপোষণ কর অস্থানে শক্তির অপচয় করিও না।" সহস্র নগ্নপদ ভক্তের মাঝখান দিয়া গৈরিকধারী বিদেশী শিষ্যদের সহিত সৌম্যমূর্ত্তি মহাপুরুষ পদব্রজে টালার বাগানবাড়ীতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে যে গৈরিকবসনা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ নারী প্রসন্নমুখে সর্ব্বাগ্রে গমন করিতেছিলেন সকলেই ভক্তিসম্ভ্রমে নত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলাবলি করিল, "ইনিই সেই বিখ্যাতা বিদুষী কুমারী ত্রিগুণাতীতা।"

॥ ৮ ॥

রেভারেণ্ড ইমানুয়েল মুখার্জ্জী প্রোটেষ্টান্ট খৃশ্চান পাদরী। যেখানে যত হিন্দুধর্ম্মের বিষয়ে বক্তৃতা বা আলোচনা হয়, ঠিক তাহার পরেই অত্যন্ত তীব্রভাষায় তাহাদের প্রতিবাদ করাই যেন তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত। মাসিকপত্রের প্রবন্ধগুলার উপর কখনো নিজের সম্পাদিত 'পরিত্রাতা' কাগজে বা মিশনারীদের অধীনস্থ অন্যান্য কাগজগুলায় কখন বা বক্তৃতা দ্বারা তীব্রতাপযুক্ত ভাষায় আক্রমণ করিতে একবারও তাঁহার ভুল হয় না। রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি হিন্দুর পূজনীয় মহাত্মাদিগের সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য অতিশয় কঠোর। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণই বিশেষ করিয়া তাঁহার অশ্রদ্ধার পাত্র। একদিন একটা প্রবন্ধের একস্থলে তিনি লিখিয়াছিলেন এমন 'সেলফিশ্ গডের' কথা কেহ কখন শুনিয়াছ? হিন্দুদের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ গীতায় তাহাদের ভগবান্ বলিতেছেন, 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ!' 'অহং'-এ পরিপূর্ণ চিত্ত এই দাম্ভিকই উহাদের পূজ্য দেবতা। হিন্দুর পূর্ণাবতার!", ইহার প্রতিবাদের তরফ হইতে বাইবেলের

যে সকল বচন তুলিয়া দেখান হইয়াছিল, তাহাতে দুই দলে অনেক দিন পর্য্যন্ত লেখালেখি চলিয়া পাঠকগণকে একটু নূতনত্ব দান করিয়াছিল। মুখামুখি বিবাদের অপেক্ষা এই লেখার কোন্দল দর্শক অর্থাৎ পাঠকদলের অধিকতর মুখরোচক হইয়া থাকে।

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গির্জ্জায় তাঁহার চারিপাশে যে সমুদয় ভক্ত সমাগত হইত, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই অতি নিম্ন শ্রেণীর লোক। তাঁহার বক্তৃতায় কিনা জানি না হয়ত তাহা অপেক্ষা কোন বিশেষ প্রলোভনে পড়িয়াই গোটা কতক গ্রামের তাঁহারই কতকগুলি প্রজা তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের জন্য ফ্রি স্কুল এবং দাতব্য চিকিৎসালয়েরও তিনি বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে কোন একটি অন্ধ খঞ্জ হিন্দু ভিখারীর অথবা পাঠার্থী দরিদ্র হিন্দু বালকের স্থান হইত না। এই গোঁড়া খৃশ্চান পাদরীটি এই অস্বাভাবিক হিন্দুদ্বেষের জন্য সর্ব্বত্রই বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। লোকে ইঁহাকে 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' আখ্যা দিয়াছিল। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা পদটাকে আর একটু নামাইয়া নারীপদাহত কোন কাষ্ঠময় পদার্থের সহিত উপমেয় করিয়া বলিত 'ঘরের ঢেঁকী কুমীর'! ইংরাজ মিশনারীরা তাঁহাকে বাহিরে অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া মনে মনে তীব্র ঘৃণার হাসি হাসিত। কিন্তু রেভারেণ্ড মহাশয়ের কাহারও স্তুতি নিন্দায় দৃক্‌পাত ছিল না। তিনি নিন্দা স্তুতিতে তুল্য মৌনী থাকিয়াই অটল ভাবে নিজের কর্ম্ম করিয়া যাইতেন। প্রতিমা-পূজক বা ব্রহ্ম-উপাসক সমস্ত হিন্দু সম্প্রদায়ই তাঁহার তীব্র ঘৃণার পাত্র ছিল। কিন্তু ধর্ম্মের চেয়েও সামাজিক আচার ব্যবহারের উপরই তাঁহার আক্রোশটা যেন একটু অধিকতর। ভারতবর্ষীয় হিন্দুজাতি যে আর্য্যজাতি সম্ভূতই নয়, তাহারা কোল সাঁওতালের গোষ্ঠি এবং তাহাদের শাস্ত্র ও আচার যে অনার্য্য অসভ্যদের শাস্ত্র ও আচার—এসকল প্রমাণ ইউরোপীয় সর্ব্বজ্ঞদের এবং তাঁহাদের প্রসাদজীবী দলের কল্যাণে তাঁহার যথেষ্টই জানা ছিল এবং সে জ্ঞান তিনি অন্যকেও প্রদান চেষ্টায় বিশেষরূপই অধীর ছিলেন।

সেদিন দেশী বিদেশী সংবাদপত্র যখন বেদান্তপ্রচারক আনন্দস্বামীর প্রত্যাগমন ও তাঁহার সফলতার সংবাদে কলেবর পূর্ণ করিয়া বিজয়দুন্দুভিনাদ ঘোষণা করিল, রেভারেণ্ড মুখার্জ্জী তখনই তাঁহার উপর জাতক্রোধ হইয়া তাঁহার বক্তৃতার যে সকল অংশ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাদের উপর যৎপরোনাস্তি কঠোর ভাষায় কঠিন মন্তব্য প্রকাশ করিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিলেন যে, এই ধর্ম ও

ইহার প্রচারক উভয়ই ঝুঁটা! পরসপ্তাহের কাগজে তাঁহার সমালোচনার একটা আলোচনা বাহির হইল; বিরক্তিকুঞ্চিত ললাটে পাদরী দেখিলেন প্রবন্ধটার নীচে নাম স্বাক্ষরিত রহিয়াছে "ত্রিগুণাতীতা।"

এমন ভাষার লালিত্য, এমন রচনার মাধুর্য্য আর কখনও তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইয়াছে বলিয়া স্মরণ হইল না পক্ষপাতশূন্য মার্জ্জিতভাষায় লেখিকা তাঁহার বিদ্বেষ-বিষ-দগ্ধ আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রবল খণ্ডনযুক্তি সকল প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন মাত্র, কোথাও ফিরিয়া আক্রমণ করেন নাই। এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন, "আমরা আমাদের জ্ঞানের বহির্ভূত বিষয়কে জানিতে পারি না, কেন না আমার পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন বস্তুতত্ত্বকেই ধারণা করিতে পারে, তাহা অপরিচ্ছিন্ন পদার্থকে জ্ঞেয় করিতে অক্ষম, এবং আমি যাহা বুঝি নাই তাহার অস্তিত্ব স্বীকারে আমার অনাদি-অবিদ্যারূপী অহংই আমায় বাধা প্রদান করিয়া থাকে। শিশুর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ ভূমিরাকাশেই ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা স্থির রাখে; কিন্তু বয়োবৃদ্ধি হইলে যখন তাহার কূপমণ্ডূকতা ঘুচিতে থাকে, জ্ঞানেরও সেই সঙ্গে তেমনি প্রসার হয়। এমনি করিয়া যখন পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান অপরিচ্ছিন্ন ও বৃহত্তম হইয়া যায়, তখনি তাহা পরাকাষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু ইহা সাধনাসাপেক্ষ। সেইজন্য ইহার পূর্ব্বে তাহার জন্য একটা অবলম্বন বা জ্ঞানপ্রসারের মার্গও তো প্রয়োজনীয়। বালিকা মাটির ঢেলাটিকে সন্তানস্নেহে বক্ষে ধরিয়া চুম্বন করে। সে তাহার বাহ্যচেতনবিরহিত প্রতিমায় একটা গোপন মানবত্ব অনুভব না করিলে, এ স্নেহাস্বাদ কোন মতেই পাইত না। কিন্তু তৎকর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ অনুরুদ্ধ হইলেও সেই শিশুর জননী তাহার মৃৎপাঞ্চালিকাকে সেই স্নেহ দান করিতে সক্ষম হইবেন কি? না, তাঁহার উচ্চজ্ঞান তখন আর সেই মানব-হস্তগঠিত সন্তানকে স্বীকার করিতে চাহিবে না, তথাপি শিশুর বিশ্বস্ত আনন্দে আঘাত করিতেও তাঁহার মাতৃকর্ত্তব্য যে আহত হয়; সেই জন্য তিনি হাসিয়া বলিবেন, 'বাছা তোমার ছেলেকে তুমি আদর কর আমারটিকে আমি আদর করি।' কিন্তু তথাপি তাহার এই অল্পজ্ঞতার জন্য তাহাকে তিরস্কার করিবেন না। তিনি জানেন ইহা সত্য বস্তু নয় বটে কিন্তু ইহা সত্য বস্তু লাভেরই প্রথম সোপান। সত্যের একান্ত বা অত্যন্ত বিরোধী নয়, তাহা কিন্তু মাতৃত্বেরই অঙ্কুর। যে শিশু, যে অজ্ঞ, যে সর্ব্বব্যাপককে নিজের ক্ষুদ্র চিত্তে ধারণা করিতে সক্ষম নহে, সে যদি সর্ব্বাত্মাকে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রে;—তৃণে, স্তম্বে, বৃক্ষে, শিলায় অর্চ্চনা করে, তাহাতে এমন ক্ষতিই বা কি?······মানব! ভ্রান্ত হইও না! বাহিরের

রৌদ্র ঝলসিত আকাশ হইতে শান্ত অন্তরাকাশে দৃষ্টি ফিরাও, দেখিবে সেখানে যথার্থতঃ কোন ভেদ নাই। তোমার সঙ্গে আমার পৃথক সত্তাও নাই,—আছেন কেবল অখণ্ডৈকরস, সত্যজ্ঞানানন্দময় পরাত্মা। তিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত। যখন জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে তখন, সকল ভ্রান্তি ঘুচিয়া এই এক মহাবাণী অন্তরাকাশে চিরধ্বনিত শুনিবে—"ব্রহ্মাহং, শিবোহহং, সোহহম্!"

এই প্রবন্ধপাঠে খৃষ্টান প্রচারকের বিদ্বেষবহ্নিতে ইন্ধন পড়িল মাত্র, দহন কমিল না। ঘৃণার হাসি হাসিয়া কহিলেন, "হিদেন স্ত্রীলোকটার স্পর্ধা তো বড় কম নয়? এ অমার্জ্জনীয়!"

আবার 'পরিত্রাতা'য় নূতন তেজে প্রবন্ধ বাহির হইল।

পাঠ করিয়া বৃদ্ধ পুরোহিত পিটার্স কহিলেন, "এটা কলহের মত শুনাবে না?" ধর্ম্মভীরু বৃদ্ধের ব্যক্তিগত কোন বিদ্বেষ ছিল না। রেভাবেণ্ড মুখার্জ্জী সদম্ভে কহিলেন, "হয় হউক, উহার বড় অহঙ্কার দেখ্‌ছি। এ আমার সহ্য হয় না।" এবারেও "ত্রিগুণাতীতা" ইহার প্রতিবাদ করিলেন। আবার প্রতি সংবাদপত্র তাহার প্রশংসায় ভরিয়া গিয়া রেভারেণ্ড মুখার্জ্জীর আক্রোশ বাড়াইয়াই দিল।

ত্রিগুণাতীতা একস্থলে লিখিলেন, "যাহা জানিলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর কিছু অজ্ঞাত থাকে না, তাহা না জানিয়া সেই মহাতর্কের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। অজ্ঞের প্রতি করুণাই স্বাভাবিক, তাহার সহিত তর্ক সম্ভব নয়। যদি কেহ বলে, 'আমি তাহা জানি' তবে তাহা তাহার ভ্রান্তি! উপনিষদ বলিয়াছেন, "যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূন ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণোরূপম্" 'যে তাঁহাকে জানিযাছে বলে সে তাহাকে অল্পই জানে।' যে যথার্থই জানিয়াছে তাহার সম্বন্ধে উপনিষদ বাক্য এইরূপ "যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানু-পশ্যতি। সর্ব্বভূতেষু চাত্মানাং ততো ন বিজুগুপ্সতে।' যাহার সর্ব্বভূতে আত্ম-দৃষ্টি হইয়াছে তাহার চিত্তে ঈর্ষা দ্বেষের স্থান কোথায়?"

প্রবন্ধযুদ্ধ চলিতে লাগিল। একটা সমালোচনার প্রতিবাদে ত্রিগুণাতীতা লিখিয়াছিলেন, "সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' এস্থলে শ্রীভগবান কোন জাগতিক ধর্ম্মমতকে লক্ষ্য করিয়া একথা বলেন নাই, তাহা সার্ব্বভৌমিক সত্য-ধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব। 'মাং একং' শব্দ এখানে আত্মার স্বরূপে (অর্থাৎ সমষ্টিরূপে পরমাত্মায়) প্রযোজ্য। সর্ব্বপ্রকার ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করত একমাত্র যে আত্মসত্তা অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তা তাহাতেই নিমগ্ন হও, একমাত্র ইহাতেই সর্বকলুষবিমুক্ত

হইতে পারিবে। কারণ জন্ম মৃত্যুর নিবৃত্তিই জীবের চরম উন্নতি, আর তাহা এই আত্মজ্ঞান দ্বারাই লভ্য আর কিছুতেই নয়।" ইত্যাদি।

পিটার্স বলিলেন, "আমাদের লর্ড তাঁহার পুত্রের দ্বারা বলাইয়া ছিলেন, "If you forsaketh others and taketh me I.......". অধীর হইয়া রেভারেণ্ড মুখার্জ্জী বাধা দিলেন, "থাম থাম পিটার্স এই স্ত্রীলোকটা আমাকে অস্থির করেছে, ওকে পরাজয় করতেই হবে। ওদের ভিত্তিহীন ধর্ম্ম বলে, 'এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা মূলতঃ অযথার্থ, সমস্তই স্বপ্ন! কিছুই হয় নাই, কিছু হইতেছে না, কিছুই হইবে না, কেবল মাত্র মায়ার বিজৃম্ভণে ইন্দ্রজালের মত অলীকের স্ফূর্ত্তি হচ্ছে। জ্ঞানের উদয়ে অবিদ্যাধ্বান্ত অন্তর্হিত হ'লেই মায়াউপরত জীব নিজের স্বরূপে মিলিত হ'য়ে শান্ত হবে! আবার তর্ক করে "ভগবদ্ বাক্য"! যদি মায়ারই খেলা তবে "ভগবদ্ বাক্যও" তো সেই মায়াই? 'এক পরমাত্মা মাত্র সর্ব্বভূতে অবস্থিত প্রত্যগাত্মারূপে প্রতীয়মান হচ্ছেন, বস্তুতঃ জীব ঈশ্বর দ্বিত্ব মানব কল্পনা মাত্র!' কি স্পর্দ্ধা। ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র মানব সে বিশ্ব জগতের রাজাধিরাজের সহিত এক হ'তে চায়। বামন হয়ে চন্দ্রে হস্ত প্রদানের সাধ করে—আশ্চর্য ধর্ম্ম! আমার ইচ্ছা করে, এক দিন গুরু শিষ্যা দু'জনকেই আমি ঘোরতর তর্ক বিচারে আহ্বান করি, দেখি তাদের কত দর্প!"

॥ ৯ ॥

তখন বর্ষা ঋতু না হইলেও অকাল বর্ষণে সহসা সেদিন অসময়ে সভাভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। অসমাপ্ত বক্তব্য পরদিন শেষ করিবার অনুরোধ গ্রহণ করিয়া বেদান্তশাস্ত্র প্রচারক স্নিগ্ধ হাস্যের সহিত নিজের সম্মতি জানাইয়া চলিয়া গেলেন; তাঁহার ভক্তগণ, শিষ্যগণও তাঁহার অনুসরণ করিল। ভগ্নোৎসাহ খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক শূন্যনেত্রে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহাদের পার্শ্বচারিণী ভস্মাচ্ছাদিত-হোমানলের মত দীপ্তমূর্ত্তি সন্ন্যাসিনীর দিকে তাঁহার অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ইনিই যে তাঁহার মসীযুদ্ধের অচেনা প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রহ্মবাদিনী কুমারী ত্রিগুণাতীতা তাহাতে সন্দেহলেসও ছিল না। ঈর্ষায় কি কি উত্তেজনায়, আনন্দে কি বিষাদে, কে জানে কি একটা ভাবে তাঁহার অজেয় চিত্ত সহসা বালকের ন্যায় একান্ত বিকল হইয়া উঠিতে লাগিল। মঞ্চ হইতে নামিয়া দ্রুতপদে কাছে গিয়া তাহাকে ফিরাইতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। ফিরাইয়া কি বলিবে? বলিবে "গর্ব্বিতা রমণি! যে হিন্দু সমাজ আমার চির

জীবনের শান্তি হরণ করিয়াছে, জন্মান্তরের আশা ভরসা পর্য্যন্ত আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছে, তুমি তাহারি হইয়া আমার সহিত বিবাদ করিতে চাও? এ অপরাধে অন্যকে বরং ক্ষমা করিলে করা যায়, তোমাকে কিন্তু আমি কোনমতেই ক্ষমা করিব না। কেন তাহা আমি নিজেই জানি না, কিন্তু আমার হৃদয় মন সর্বান্তঃকরণে তোমার পরাজয় কামনা করিতেছে।"

কিন্তু তিনি কিছুই করিলেন না। মেঘাচ্ছন্ন প্রকৃতির ম্লানতার গর্ভে সচল মেঘে আবরিত চন্দ্রের ন্যায় তপস্বিনী সঙ্গীদের সহিত অদৃশ্যা হইয়া গেলেন। তাহারা দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেলে ইমানুয়েল সহসা যেন জাগিয়া উঠিয়া সঙ্গীর পানে ফিরিয়া সদম্ভে কহিলেন, "বেচারা আজ তার দেবতার কল্যাণেই শুধু বাঁচিয়া গেল।" পিটার্সের মনের মধ্যে হাসি না পাইলেও মন রাখা হাসি হাসিয়া উপরওয়ালার মান সে ঠিক বজায় রাখিল।

পরদিন আবার বিডন উদ্যানে ভিড় আরম্ভ হইল। সেদিন আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল। পূর্ব্বদিনের বৃষ্টিতে গাছপালার উপর বেশ একটি শ্যামল চিক্কণতা প্রকাশ পাইতেছিল, দিবসের শেষ আলোটুকু অতি রমণীয় ভাবে একটি শুভ্র মেঘজালের মধ্য দিয়া সরক্ত আভায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। উৎসুক জনমণ্ডলী চারিদিকে চাহিতেছিল, বিখ্যাত বাগ্মী বা প্রসিদ্ধ বিদুষীর তখনও আগমনচিহ্ন দেখা যায় নাই।

কলিকাতার উপকণ্ঠাবস্থিত গ্রাম হইতে ইমানুয়েলের অনেকগুলি দেশীয় খৃষ্টান শিষ্য আজিকার সমারম্ভে দর্শকরূপে আগমন করিয়াছিল। সকলের মুখেই একটু অবজ্ঞাপূর্ণ রকমের হাসি। রেভারেণ্ড মুখার্জ্জী কহিলেন, "কি হে পিটার্স! 'হিদেন' স্ত্রীলোকটা ও তার গুরুটা বেগতিক বুঝে সরে পড়ল নাকি?"

পিটার্স হস্তদ্বারা বক্ষস্থলে ক্রশ চিহ্ন করিয়া ভাবযুক্ত মুদিত নেত্রে কহিলেন, "প্রভু বলিয়াছেন তাঁর নামের আলোকে অজ্ঞান তমসা দূরে পলায়ন করবে।"

কিন্তু জয়ী হইয়াও ইমানুয়েলের মনে জয়ের আনন্দ তেমন স্থায়ী হইল না। কই সেই অহংকৃতা নারী তো তাঁহার নিকট তর্কে নতমুখ হইল না? সে তো এখনও বলে নাই যে,—'তোমার ধারণাই ঠিক। হিন্দু বলিয়া জগতে একটা জাতি, একটা কোন কিছু নাই। তাহাদের ধর্ম্ম হইতে কর্ম্ম অবধি সব মিথ্যা— সমস্তই জুয়াচুরি। তাহারা জাহান্নামে যাক,—তাহাদের নাম এ পৃথিবী হইতে যত শীঘ্র হয় বিলোপ হোক।'

এমন সময় দূরে বৃক্ষান্তরাল পথে সচল রক্তমেঘখণ্ডসদৃশ সন্ন্যাসীদের গৈরিক

দেখা গেল। উৎকণ্ঠিত জনসমূহের মধ্যে একটা কোলাহলের সহিত অনেকখানি আনন্দও জাগিয়া উঠিল।

ঠিক এই সময়ে একটা যেন পরিচিত স্বরে ইমানুয়েল চমকিয়া উঠিল, শুনিল অদূরে কে কাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, "হ্যাঁ এখন নিরাত্মীয়ই বইকি। আর সেটা অভাগা আত্মীয়দেরই সৌভাগ্য বল্‌তে হবে। ওর মা মাগী কি কম জ্বালায় জ্বলে পুড়ে হা ছেলে যো ছেলে ক'রে মরেছে। সে সব কথা মনে হ'লে এখনও বুক যেন ফেটে যায়। এত বড় হৃদয়হীন পাষণ্ড, ও।"

"আসল নামটা কি ছিল মশায় ?"

"আর সে নাম কেন অমৃতবাবু? আজ চৌদ্দ বৎসর আমাদের সে বিভূতিভূষণ ম'রে গেছে ওটা তার প্রেতাত্মা, সে বিভূতি কি ওই।" উত্তরদাতা গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

এতদিন পরেও তাহার প্রমথর কণ্ঠ চিনিতে বাধিল না। মুহূর্ত্তের জন্ম বুকের মধ্য দিয়ে একটা অগ্নিময় তরঙ্গ প্লাবিত হইয়া গেল। দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে আত্মদমন করিয়া সে ঘৃণার হাসিতে সমস্ত গ্লানি ধুইয়া ফেলিয়া সম্মুখে চাহিতে হঠাৎ নিজের দৃষ্টিতে অবিশ্বস্ত হইয়া উঠিল। সে দেখিল চীরধারী সন্ন্যাসীর পরিবর্ত্তে তাঁহারি পাদপীঠে উন্নমিতাননা মুক্তকুন্তলা সন্ন্যাসিনী সহাস্য মুখে দাঁড়াইয়া! আজ তিনি ভস্মচিহ্নবিরহিতা মেঘমুক্ত শরচ্চন্দ্রের ন্যায় শোভমানা। সে মূর্ত্তি হইতে তাই যেন আরও তেজ, আরও জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছিল। পদচুম্বিত গৈরিক বসনের উপর অনাবৃত মৃণাল ভুজদ্বয় নমিত হইয়া পরস্পর মিলিয়া রহিয়াছে; শান্ত অথচ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত সন্ধ্যাতারার মত দুইটি সমুজ্জ্বল নেত্রতারকা ভক্তিনত জনমণ্ডলীর উপর সংস্থাপিত। সে মূর্ত্তির পানে চাহিয়াই খৃষ্টধর্ম-প্রচারক বারে বারে শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। এই মহিমময়ী দেবীমূর্ত্তির প্রত্যেক অঙ্গুলীর গঠন কি তাঁহার অনন্ত সুপরিচিত নয়?

তখন চারিদিকে "মাতাজীর জয়" ধ্বনিয়া উঠিয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বী মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় তাহার আবদ্ধ দৃষ্টি ফিরাইতে না পারিয়া অনিমেষে তাঁহারই পানে; তাহার সেই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরই পানে চাহিয়া রহিল।

ত্রিগুণাতীতা তখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার গুরুর আকস্মিক অসুস্থতাই তাঁহাকে এইরূপ অযোগ্যতর হস্তে উচ্চাধিকার গ্রহণে বাধ্য করিয়াছে—নম্রসঙ্কোচে ইহা প্রকাশ করিয়া ভক্তিকৌতূহল মিশ্রিতচিত্ত সন্তানগণের সাগ্রহ নিবেদনে পূর্ব্বদিনের অসমাপ্ত আলোচ্য বিষয় তথা হইতে পুনরারম্ভ করিলেন।

তাঁহার বলিবার ভঙ্গি, বুঝাইবার ক্ষমতা, শাস্ত্রার্থ-বিচার-শক্তি ও শাস্ত্রজ্ঞান শিক্ষকেরই প্রতিরূপ। কেহ বুঝিতেও পারিতেছিল না যে, তাহারা পুরাতন কালের কোন উগ্রতপা ঋষির উপদেশ প্রাপ্ত না হইয়া একজন সুকুমারী নারীর বাণী শ্রবণ করিতেছে। পিটার্স সঙ্গীর কাণের কাছে নত হইয়া কহিল, "কি দুর্দ্দৈব! দেশের লোকগুলা এরই এত প্রশংসা করে! এ তো মুখস্থ করা শ্লোক আওড়াচ্ছে, যেন কোন শিক্ষিতা নটী অভিনয় করছে।"

রেভারেণ্ড মুখার্জ্জী কিন্তু এমন সুযোগ সত্ত্বেও একটি কথা কহিলেন না। তাঁহার চক্ষু সে সময় পলকহীন হইয়া গিয়াছিল। শরীরে স্পন্দন ছিল কি না তাহাও ঠিক করিয়া বলা যায় না। এই মূর্ত্তি কি বলিতেছিল, অথবা কিছুই বলিতেছিল কি না তাহা তাঁহার কর্ণে বা মস্তিষ্কে পৌছিতেও ছিল না। শুধু কি যেন একটা স্মৃতির তরঙ্গ মনের মধ্যে উত্তাল হইয়া উঠিতেছিল। শুভ্রশরতের এক অম্লান প্রভাতে ঘনতালী-কুঞ্জতলে এক ক্ষুদ্রকায়া চপলা বালিকার সীমাবদ্ধ সৌন্দর্য্য না এ অতনু সৌন্দর্য্য তো সে নয়,—তথাপি বুঝি সে এই! এ' কি! এ' কে? কোথা হইতে সহসা সকল ঘুমন্ত নিবন্ত বৃত্তিগুলা জাগাইয়া তুলিয়া এ মায়াবিনী আজ অকস্মাৎ কোন্ অতল হইতে তলাইয়া, কোন্ স্বপ্নলোক হইতে জাগিয়া উঠিল? এই সমুন্নতদেহ, জ্ঞানজ্যোতিঃ বিস্ফারিত ওই দুটি নেত্র যাহার তুলনা ত্রিজগতে কোথাও খুঁজিয়া মিলে না,—মহিমার গৌরবে উন্নত, আবার করুণার ভারে নম্র, এমন দৃষ্টি তো কই স্মৃতিসাগরের তলে কোথাও জাগিয়া নাই! তথাপি যেন কি আছে! একি তাহার চির পরিচিতা? না তাহা নয়। তবে তাহার অপরিচিত কি এ মূর্ত্তি? না ঠিক তাহাও নয়। তবে কে এ নারী? এ' কে? কে? কে?

পুরাতন চিত্রকর বজ্রবাণবিদ্ধের ন্যায় নিস্পন্দে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার তপস্যা আজ তপস্যামার্জ্জিতা দেবীর আসনে দাঁড়াইয়া, আর সে কোথায়!

দর্শকগণ তখন নবীন তপস্বিনীর শক্তিমন্ত্রে মন্ত্রসম্মোহিত, কেহ তাঁহার মুহ্যমান অবস্থা লক্ষ্য পর্য্যন্ত করিল না। বহুক্ষণ পরে সসংজ্ঞ হইয়া খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক যখন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর পানে ফিরিলেন, তখন তাঁহার বক্তব্য সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, তিনি তখন করুণাপূর্ণ নেত্রে ললিতগ্রীবা ঈষৎ ফিরাইয়া দেবী-প্রতিমারই মত অবিচল দাঁড়াইয়া প্রতিপক্ষের শরক্ষেপণ প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার মুখের উপর একটি বিমল ঔদার্য্য ভিন্ন কোন প্রকার ভাবোত্তেজনা মাত্রও ছিল না। বুঝি জগতের আদিসৃষ্টিতে সর্ব্বপ্রথম বিশ্বস্রোতে জাগরণের সুর চড়াইয়া বেদমাতা

বাণী এমনি করুণাপূর্ণ চিত্তেই ঘুমন্ত জগতের নিদ্রাভঙ্গ প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন।

সংজ্ঞাপ্রাপ্ত পাদরীর কর্ণে কেবলমাত্র তাঁহার মুখের একটী কথা ধ্বনিত হইতেছিল—"আমরা যাহা পাইবার যোগ্য নই তাহাই পাইতে চাহি,—কিন্তু যদি বিচার করিয়া দেখি, তবে অনায়াসেই বুঝিতে পারিব যাহা আমার পাওয়া দরকার ছিল ঠিক সেইটুকুই আমি পাইয়াছি। তার চেয়ে কমও নয়, বেশীও নয়। ঈশ্বর—এবং এমন কি ধর্ম্ম, সমাজ কেহই আমাদের যোগ্যতানুসারে যাহা আমাদের পাওনা তাহা হইতে আমাদিগকে বঞ্চনা করিতে পারেন না।"

পিটার্স সঙ্গীর পিট চাপড়াইয়া সোৎসাহে কহিল, "আর কেন বন্ধু তোমার শত্রুর গর্ব্ব এইবার চূর্ণ ক'রে দাও।"

রেভারেণ্ড মুখার্জ্জী সচমকে আবার একবার সেই সানন্দ, প্রশান্ত, অপরাজিত মুখের পানে পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। সত্য! সে কাহাকে কোথায় টানিতে চাহিয়াছিল? জগতের হৃদয়তন্ত্রীর মাঝখানে যাহার মহৎ জীবনের সুর মহান্ ছন্দে বাজিয়া উঠিয়া ভারতপারবর্ত্তী মহাদেশ সমূহকেও আজ প্লাবিত করিতেছে, যে আজ পাপপঙ্কিল অতল গহ্বরে মগ্নপ্রায় তাহাকে আবার তাহার অম্লান প্রভাতের আনন্দস্মৃতি জাগাইয়া দিয়া হাতে ধরিয়া কূলে উঠাইতে আসিয়াছে—সে তাহারই প্রতি করুণায় তাহাকেই নিজের মোহের মধ্যে টানিয়া আনিতে না পাইয়া নিজের এই ব্যর্থ জীবন কর্দ্দমাক্ত করিয়া মাটি হইয়াছে!—আর সে? তাহার উন্মত্ত আবেগের হস্ত হইতে দূরে চলিয়া গিয়া আজ মানবত্বের সর্ব্বোচ্চ শিখরে যশের অক্ষয় মুকুট শিরে ধারণ করিয়া করুণাপূর্ণ চক্ষে তাহারি দিকে চাহিয়া জগতের বক্ষে আলোকদায়িনী দীপ্তিমতী সন্ধ্যা তারার ন্যায় তাহার সম্মুখেই ঐ দণ্ডায়মানা! এ কি অপূর্ব্ব রহস্য!

সে আর্ত্ত দৃষ্টিতে একবার প্রতিদ্বন্দ্বীর অপরিবর্ত্তিত মুখের দিকে চাহিয়াই নীরবে আপনার পরাজয় মানিয়া লইল। তারপর নিজের শ্রদ্ধানত ললাটে ভক্তিবদ্ধাঞ্জলি স্পর্শ করাইয়া বিস্মিত জনমণ্ডলীর মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে মঞ্চ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক দ্রুতপদে কোথায় চলিয়া গেল, একবার আর পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলও না। বিজয়িনী তখন তাঁহার সুবিমল করুণানির্ঝরের ন্যায় স্নিগ্ধ দুইটি নেত্রতারকা তাহার পানে ফিরাইয়া প্রসন্ন মধুর হাসিটুকুর সহিত কহিলেন—

"জয়োস্তু!"



আলেয়া

নিরুপমা দেবী



সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। নব-নির্ম্মিত বম্পাস টাউনে একটি অসমতল মাঠের মধ্যস্থ একখানি "কুটীরের" ছাতে ত্রিকূট দর্শন-ক্লান্ত আমরা জন কয়েকে মাদুর পাড়িয়া গড়াইতেছিলাম। আজিকালিকার এই মাত্রাধিক্য বিনয়ের ফ্যাসানে দেওঘরকে কেহ জিতিতে পারিবে না। আবাস—'ভিলা', বা 'লজ'—দুই একখানা দেখা গেলেও অনেক প্রাসাদতুল্য অট্টালিকাও এখানে 'কুটীর' নামে অভিহিত। ৺বৈদ্যনাথধামে গৃহবাসী হইতে বোধ হয়, কাহারও কাহারও লজ্জা বোধ হয়, তাই অনেকে এখানে ঐরূপ এক একখানি "কুটীর"ই বাঁধিয়াছেন এবং সেই "কুটীরের" অভ্যাগতবর্গও সুবেশা সঙ্গিনীগণ সমভিব্যাহারে শ্মশানে মশানে বিচরণ করিয়া কুটীর বাসের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। বঙ্গের গৃহকোণা-বদ্ধারা ও বাঙ্গালা হইতে দুই পা মাত্র অগ্রসর হইয়া, এখানের রাস্তাঘাটে এমন ভাবে বিচরণ করেন যে, তাহা দেখিয়া তাঁহারা কোন কালেও যে অন্তঃপুরচারিণী ছিলেন, এমন যেন বোধই হয় না।

সেকথা যাউক। পূর্ব্বে ত্রিকূট, পশ্চিমে দিগ্‌ড়ীয়া, এবং দক্ষিণে অজ্ঞাতনামা একটা পাহাড় দেওঘরকে বেষ্টন করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। (নন্দন পাহাড় বা তপোবন-শিখর ইহাদের নিকটে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে!) আকাশ নক্ষত্র-বিরল, ঈষৎ মেঘাচ্ছন্ন। গৃহবিরল বম্পাস টাউনের কয়েকটি গৃহ হইতে আলোক-শিখা সেই অন্ধকারময় প্রান্তরের জমাট অন্ধকারকে স্থানে স্থানে যেন দ্বিগুণ ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে। ভ্রমণকারী নরনারীর দল তখন নিজ নিজ আবাসে ফিরিয়াছেন। কোথাও কোনও গৃহ হইতে গ্রামোফোনের নানা-রসসমন্বিত সঙ্গীত উঠিয়া উদ্দাম বায়ুপথে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

দুইদিন হইতে পশ্চিমের দিগ্‌ড়ীয়া পাহাড়ে আগুন ধরিয়াছিল। সেরাত্রে

অগ্নি পাহাড়ের শিখর দেশ হইতে নামিয়া তাহার বিস্তীর্ণ কণ্ঠদেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া একগাছি উজ্জ্বল মালার ন্যায় জ্বলিতেছিল। আমরা মুগ্ধনেত্রে পর্ব্বতের এই অপূর্ব্ব দীপালি দেখিতে, সেই অগ্নি মনুষ্যহস্তদত্ত অথবা দাবানল হইতে পারে কিনা, তাহারই বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিতেছিলাম। এমন সময়ে সহসা কাষ্টেয়াস´ এবং বম্পাস টাউনের মধ্যস্থিতা বালুতলবাহী সঙ্কীর্ণা শুষ্কশরীরা "যমুনা-জোড" নদীর তীরে একটা আলোক অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যের সহিত দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠায় সকলের দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট হইল আলোকটি কয়েক মুহূর্ত্ত একভাবে জ্বলিয়া সহসা দক্ষিণ দিকে চলিতে আরম্ভ করিল এবং খানিক অগ্রসর হইয়াই দপ্ করিয়া নিবিয়া গেল। ক্ষণপরেই আবার দেখা গেল সেই আলোক বামদিকে চলিয়া আসিয়াছে। এবং জ্বলিতে জ্বলিতে বিশৃঙ্খলভাবে একস্থান হইতে অন্যস্থানে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে।

সকলে একযোগে বলিয়া উঠিল, 'আলেয়া'-'আলেয়া'। আমরা আগ্রহের সহিত সেই আলোকের নির্ব্বাণ প্রজ্বলন এবং ইতস্ততঃ সঞ্চরণ লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। আলোক জ্বলিতে জ্বলিতে, যমুনা-জোড়ের তীরে তীরে পূর্ব্বাভিমুখে চলিল এবং বহুদূর গিয়া আবার নিবিয়া গেল; কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত পরে দেখা গেল, বম্পাস টাউনের দক্ষিণস্থ "কানহাইয়া জোড" নামে 'যমুনা-জোড়' অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণা একটি পর্ব্বতপথবাহিনী নদীর তীরে তেমনই একটি আলোক জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং সেইরূপ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। উত্তরের যমুনা-জোড়-তীরের আলোক তখন নির্ব্বাপিত। সকলেই মৃদুমন্দ বিস্ময়-গুঞ্জন আরম্ভ করিতেই পল্লীবাসী একজন বন্ধু বলিলেন, "ও তো ভুলোর আলো! ও তো মাঠে মাঠে অমনি একদিক থেকে আর একদিকে ছুটোছুটি ক'রেই বেড়ায়। 'রাত-বিরাত্' বা রাস্তা ঘাটে ওদের নাম ক'রলেও বিপদ ঘটে। যেমন অপদেবতার নাম করলেই তাঁরা সেখানে অধিষ্ঠান হন, তেমনি রাস্তায় ভুলোর নাম করলে বা আলো ধ'রে চল্‌লে, মরণ ত' নিশ্চিত! তা' ছাড়া আবার ঘরে বসে রাত্রে ওর নাম করলে, কোন না কোন পথিক, সে রাতে ওর খপ্পরে পড়বেই!"—তাঁহার কথায় তখন আর আমাদের কান দিবার অবসর ছিল না। এখন শিক্ষিত বন্ধু কয়টির মধ্যে বিষম তর্ক বাধিয়া গিয়াছে! হাত-পা গুটাইয়া বয়োজ্যেষ্ঠ বিজ্ঞ বন্ধুর কোল ঘেঁসিয়া শুইয়া, থিয়জফিষ্ট বন্ধু তাঁহাকে ধমকের উপর ধমক দিয়া নির্ব্বাক করিয়া দিতেছেন। একই সময়ে দুই ধারের দুইটি

নদীর তীরে উক্ত আলোক জ্বলিয়া উঠার অপরাধে তিনি আর তাহাকে কিছুতেই "আলেয়া" বলিতে দিবেন না,—এই তাঁহার পণ। বিজ্ঞ বন্ধুর তাহাতে আপত্তি দেখিয়া, তাঁহার বোখ্ আরও চড়িয়া উঠিতেছিল। বিজ্ঞ বলিতেছিলেন, "নিসর্গের মধ্যে এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার অনেক সময়ই ঘটে, আপাতদৃষ্টিতে যার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কে বলতে পারে যে, দুটো নদীর মুখে যোগ নেই! মাঝের মাঠটা ত খুব বেশী বড় নয়।" তাহার কথা তখন কে শোনে! ঐ আলোকটি যে ভৌতিক, ইহারই প্রমাণের জন্য সকলেই প্রায় একযোগে এ বিষয়ে যাহার যত অভিজ্ঞতা আছে, তাহার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। থিয়জফিষ্ট তো পরম বৈজ্ঞানিক ক্রুক্স্ ও মহামান্য ওয়ালাস্ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষীরোদবাবু, মণিলালবাবুর "অলৌকিক রহস্য" এবং ভূতুড়ে কাণ্ডের গল্প পর্য্যন্ত সে সভায় উপস্থিত করিলেন। আমাদের বিজ্ঞ এইবার শ্রোতাদের জন্য একটু উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "এ গল্পগুলো কাল্‌কের জন্যে রাখ্‌লে হত না?" শ্রোতৃবর্গের একস্থানে তাল-পাকানোর গতিক দেখিয়া তিনি সকলের রাত্রে অনিদ্রা এবং দুঃস্বপ্নের আশঙ্কা করিতেছিলেন। থিয়জফিষ্ট ইতি মধ্যে নিকটে আলোক আনাইয়াছিলেন; এক্ষণে ব্যূহিত বন্ধুবর্গের মধ্যে আপনাকে সুরক্ষিত দেখিয়া, বন্ধুর বাহুতে মাথাটিও তুলিয়া দিয়া বলিলেন, "কিসের ভয়!" তাঁহাকে আঁটিতে না পারিয়া জ্যেষ্ঠ বন্ধু বিনীত ভাবে বলিলেন, "না, ভয় আর কিসের? তবে এই গল্প-কলার উত্তেজনা ফুরিয়ে গেলে, হয়ত সিঁড়িতে পা বাড়াতেও কষ্ট হবে, তার চেয়ে চল নীচে যাওয়া যাক।" তখন একথার সারবত্তা বুঝিয়া সকলে উঠিতে চাহিতেছিল, এমন সময়ে নীচে হইতে একব্যক্তি সংবাদ লইয়া আসিল, আমাদের ত্রিকূট দর্শনের সঙ্গী কাষ্টেয়ার্স-টাউনস্থিত বন্ধুবর্গ সম্প্রতি বৈকালে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়া হারাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের চাকরের রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া এক্ষণে তাঁহাদের খুঁজিতে বাহির হইয়াছে এবং তাহাদের ভীতি-সমাচ্ছন্ন মুখে এতত্ত্বও প্রকাশ পাইল যে, তাহারাও সন্ধ্যার সময় বাজার করিতে গিয়া পথ হারাইয়াছিল এবং অতিকষ্টে রাত্রি নয়টার সময় বাসা খুঁজিয়া পাইয়াছে বটে, কিন্তু মনিবদের এখনও ফিরিতে না দেখিয়া, তাঁহাদের সম্বন্ধেও সেই আশঙ্কা করিতেছে। পল্লীবাসী বন্ধু সগর্ব্বে বলিলেন, "রাত্রে 'ভুলো'র নাম করার ফল হাতে হাতে দেখ্‌লে ত'? তোমরা মান না কিন্তু আমরা এম্‌নি কতশত প্রত্যক্ষ ফল ফল্‌তে দেখেছি।"

"এতক্ষণ হয়ত তাঁরা বাসায় ফিরেছেন। কাল সকালে অতি অবশ্য তাঁদের

পৌঁছানো খবর আমাদের দিয়ে যেও।"—(তাঁহারা সত্যই সেদিন সদলে পথ ভুলিয়াছিলেন এবং বহু কষ্টে রাত্রি দশটার সময় বাসায় উপস্থিত হন ! কিন্তু তাঁহাদের আত্মীয় পুরুষ অভিভাবকটি সর্ব্বাপেক্ষা মজা করিয়াছিলেন ! তিনি কোনও কার্য্যানুরোধে একাই সে রাত্রে একদিকে যান এবং পথ ভুলিয়া একেবারে উইলিয়মস্ টাউনে গিয়া হাজির হন ! শেষে সেস্থান হইতে গাড়ী করিয়া রাত্রি বারোটার সময় গৃহে ফিরিয়া এই "প্রহসন প্রাপ্তিকে" তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য করিয়া তুলেন।—কিন্তু তাঁহারা কেহই 'আলেয়া'র আলো দেখেন নাই, এটুকু এখানে বলা উচিত।) তাঁহাদের চাকরদের এই কথা বলিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া হইল এবং ঘটনাচক্রে পল্লাবাসী বন্ধুর কথিত "ভুলোর আলো"র নাম মাহাত্ম্য এইরূপে সত্যপ্রমাণিত হওয়ায় অগত্যা বিরুদ্ধবাদীদের মস্তক নত করিতে হইল। তাঁহার আর গর্ব্বের সীমা রহিল না।

আমাদের কবিবন্ধুটি এতক্ষণ ঝিমাইতেছিলেন। ডাকাডাকিতে তিনি চক্ষু চাহিয়া হস্তের ইঙ্গিতে সকলকে নিকটে বসিতে বলিলেন, তাঁহার রকমসকমে আবার কি ব্যাপার না জানি ভাবিয়া সকলেই তাঁহার নিকটে নিঃশব্দে বসিয়া পড়িলাম। তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ও আলোর তথ্য আবিষ্কার হ'য়েছে? যদি কেউ এখন সাহস ক'রে ঐ আলোটার সন্ধানে যেতে পার, তা'হলে দেখতে পাও, যমুনা-জোড়ের ধারে একজন সন্ন্যাসী একটা ধূনী জ্বেলে বসে আছে, এবং মাঝে মাঝে জলন্ত ধূনীর কাটটা দপ্ দপ্ করে জ্বালিয়ে নদীর ধারে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্চে।"

বিস্ময়ে আতঙ্কে শ্রোতৃবর্গ আমরা অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া পড়িলাম। বিজ্ঞ ঈষৎ মাত্র হাসিলেন—তাঁহার সেই হাসিটুকুতেই আমরা তাহার উপর চটিয়া উঠিলাম। এমন সময় হাসি!—তিনি বলিলেন, "তা তো এখন আমরা কেউ যেতে পারছি না, অতএব"—

থিয়জফিষ্ট ইহারই মধ্যে আবার তাঁহার ক্রোড়ের নিকটস্থ স্থানটি দখল করিয়া (মত ও বিশ্বাস লইয়া সর্ব্বদা বিজ্ঞের সহিত থিয়জফিষ্টের বিবাদ চলিলেও ভয় পাইলেই থিয়জফিষ্ট—অভিজ্ঞতা বয়স ও সাহসে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ বন্ধুটির ক্রোড়দেশটি সর্ব্বাগ্রে অধিকার করিতেন।) এক্ষণে তাহার মুখ হইতে কথাটি কাড়িয়া লইয়া বলিলেন—

"তাতে কাজ নেই, তুমিই কি বল্‌তে চাও বল!" ভয় পাইতে এবং গল্প শুনিতে, উভয়েই তিনি অগ্রগণ্য।

সকলের আতঙ্কে এবং আগ্রহে অচল অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অগত্যা বিজু বলিলেন, "যতক্ষণ নীচের লোকেরা এসে আমাদের টেনে নীচে নিয়ে না যায়, ততক্ষণ তবে তোমার ধুনীর গল্পই চলুক !"

কবি চক্ষু মুদিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সে বহুদিনের কথা ! দেওঘরের অধিকাংশ স্থানই তখন শাল-পলাশ-মহুয়া প্রভৃতি বৃক্ষে এবং ঘনবৃহৎ কণ্টকময় গুল্মে একেবারে গভীর বনের পর্য্যায়ভুক্ত। এই অসমতল কঙ্করময় কঠিন ভূমির স্থানে স্থানের উচ্চতারেখা তখন ঐ নন্দন-পাহাড়ের বক্ষ স্পর্শ করিত। সেই গভীর বনমধ্যে এবং বৃক্ষবিরল অসমতল রুক্ষ প্রান্তরে ঐ যথাতথা-উদ্ভূত সুকৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বতের ক্ষুদ্র সংস্করণগুলা অথবা তাহাদের বহুদূরবিস্তৃত শিকড়গুলা বন্য মহিষ, হস্তী বা বনচর কোন বিকট পশুর ন্যায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া, দেবদর্শনাকাঙ্ক্ষী যাত্রিগণের ভীতি উৎপাদন করিত। প্রাচীন 'পুরন্দহ'ই তখন কেবল মাত্র দেওঘরের জনপদ। উইলিয়ামস্ সাহেব তখনও বন কাটাইয়া উইলিয়ামস্ টাউনের পত্তন করেন নাই ; কাষ্টেয়ার্স বা বম্পাস টাউনের কল্পনাও তখন দেওঘর অধিবাসীরা স্বপ্নে দেখে নাই।

গভীর বন মধ্যবাহিনী 'যমুনা-জোড়' ও 'কান্হাইয়া-জোড়'ও তখন এইরূপ বালুকাবিশিষ্ট-শরীরা ছিল না। তাহারা 'দিগ্ড়ীয়া' পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া সেই শ্যামল শালবনের নিম্নে অতিখর বেগেই বহিয়া যাইত। খাত এইরূপ সঙ্কীর্ণ ছিল বটে, কিন্তু জল অগভীর ছিল না। বিশেষ বর্ষায় যখন পাহাড়ের 'ঢল' নামিয়া নদীতে 'বুহা' আসিত, সে দিন সেই সঙ্কীর্ণা আখ্যাতনাম্নী পার্ব্বতীদ্বয়ের স্রোতবেগে পড়িলে, বোধ হয়, মত্তহস্তীও ভাসিয়া যাইত।

এই দেবঘরের পাঁচক্রোশ পূর্ব্বে গভীর বনের মধ্যে ঐ ত্রিকূট পর্ব্বতের গুহায় একজন সন্ন্যাসী বাস করিতেন। সাধুরা তীর্থে বাস করিয়াও যেমন লোকচক্ষুর অগোচরেই থাকিতে ভালবাসেন, সন্ন্যাসীও সেই উদ্দেশ্যে সেই নির্জ্জন পর্ব্বত-গুহায় থাকিতেন। তখন দেওঘরে বাঙ্গালী বাবুদের এত হুড়াহুড়ি পড়ে নাই ! যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের এত দুরন্ত সখ ছিল না যে, সেই বন ভাঙ্গিয়া ব্যাঘ্র-ভল্লুকের মুখে পড়িবার জন্য পাহাড়ে উঠিতে আসিবেন। দূর গ্রামস্থ অধিবাসীরা সেই পাহাড়ে "দেও" ছাড়া অন্য কেহ যে বাস করিতে পারে, এ বিশ্বাস করিত না। সেই লোকচক্ষুর অগোচরে সন্ন্যাসী কতদিন হইতে যে সেখানে বাসস্থান করিতেছেন, তাহাও কেহ জানিত না ; কেবল কয়েক বৎসর হইতে শিবচতুর্দ্দশী

কিংবা ঐরূপ কোন কোন দিবসে একজন সন্ন্যাসীকে ৺বৈদ্যনাথের পূজকেরা বনফুল হস্তে শিবমন্দিরে পূজার্থে উপস্থিত দেখিতে পাইত।

সেদিনও সন্ন্যাসী ৺বৈদ্যনাথের পূজান্তে সেই বনপথ ধরিয়া নিজ বাসস্থান অভিমুখে ফিরিতেছিলেন। হস্তে একটি লোহিত বর্ণের অর্ধস্ফুট শতদল। শ্যামল শালপত্রের ঠোঙ্গায় কতকগুলি পলাশ আকন্দ প্রভৃতি বনফুল তুলিয়া লইয়া গিয়া তিনি বৈদ্যনাথের পূজা করিয়াছিলেন; কিন্তু পূজান্তে উঠিবার সময় একজন পাণ্ডা শিবনির্ম্মাল্য ও প্রসাদ-স্বরূপ "ত্যাগী বাবা"র হস্তে শিবসাগর উদ্ভূত একটি ক্ষুদ্র শতদল ও কিছু মিষ্টান্ন প্রসাদ তুলিয়া দিয়াছে। সন্ন্যাসী মন্দিরের বাহিরে আসিয়া অন্যান্য দিনের ন্যায় সেই প্রসাদের কণামাত্র ধারণ করিয়া, বাকিটুকু কোন ব্যাধিগ্রস্থ ভিক্ষুকের হস্তে দিয়াছেন। তখন দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তি ভিন্ন বৈদ্যনাথে এখনকার মত ভিক্ষুকের পাল ছিল না। কিন্তু কি জানি কেন, তিনি ফুলটি সেদিন হস্তে লইয়াই চলিয়া আসিয়াছেন। গিরিতলস্থ বনভূমি সেদিন বসন্তের পূর্ণতা-বিহ্বল। সতেজ, সরল শ্যামবর্ণ শাল-শাল্মলী, পশাল-মধূক ও বনপুষ্পের গন্ধে পবন সুরভিত। পাখীর গানে যেন বনদেবীদেরই কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত বলিয়া কর্ণের ভ্রম জন্মিতেছে। তাহাদের মঞ্জরী রবে এবং অঙ্কুল গন্ধে মাঝে মাঝে বন যেন শিহরিয়া উঠিতেছে। কোথাও কীচক-রন্ধ্রে প্রবিষ্ট বায়ু কিন্নরের ওষ্ঠস্পর্শী বংশীস্বরের অনুকরণ করিতেছে। বন্য মহিষ, চমরীগাভী, কোথাও বা হরিণদল অদ্য যেন অধিকতর নির্ভয়ে—অধিকতর নির্ব্বিরোধ ভাবে—যুগ্মে যুগ্মে চরিয়া বেড়াইতেছে, পরস্পর পরস্পরকে নানারূপে স্নেহ জানাইতেছে। সন্ন্যাসী দেখিতে দেখিতে যাইতেছেন। সেই তরুণ যৌবনের পঠিত কুমার সম্ভবের শ্লোকগুলা সহসা অদ্য তাঁহার মনের মধ্যে আপনা হইতে যেন বাজিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল। বনস্থলীর এই বসন্ত সমাগমকে যেন অদ্য তাঁহার সেই অকাল-বসন্তোদয়ের দিনের মতই বোধ হইল। ঠিক যেন সেই দৃশ্য।

"কাষ্ঠাগতস্নেহরসানুবিদ্ধং দ্বন্দ্বানি ভাবং ক্রিয়য়া বিবব্রুঃ॥
মধুদ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনু-বর্ত্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডুয়ত কৃষ্ণসারঃ॥
দদৌ রসাৎ পঙ্কজরেণুগন্ধি গজায় গণ্ডূষজলং করেণুঃ।
অর্দ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা॥"

সন্ন্যাসী ক্রমশঃই অধিকতর বিমনা হইতেছিলেন। সহসা ত্রিকূটের উন্নত শৃঙ্গে

দৃষ্টি পড়িবামাত্র তিনি মনের এই দুর্ব্বলতায় লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিলেন, এ কি! এখনো কি তাঁহার অন্তরের কোন কোণে লুকাইয়া আছে। অথবা এ কাহারও ছলনা? সেই "অকালিকী মধু-প্রবৃত্তি"র দিনে মহাদেবের তপোবনবাসী তপস্বীদের মনও বুঝি অকারণে এইরূপই সংক্ষুব্ধ হইয়াছিল। এইবার গর্ব্বের হাসি হাসিয়া সন্ন্যাসী মনে মনে উচ্চারণ করিলেন—"কাহার ধ্যান ভাঙ্গিতে তোমার এ আয়োজন বসন্ত? এ আশ্রমের রক্ষী ত্রিকূটের উন্নত শিখর ঐ যে নন্দীর মতই মুখে দক্ষিণ অঙ্গুলী স্থাপন করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। এ চাপল্য সংবরণ কর—নহিলে মুহূর্ত্তে ভস্ম হইয়া যাইবে। তোমার এ মায়ার ওখানে প্রবেশাধিকার নিষেধ।"

সহসা সন্ন্যাসীর গতি-রোধ হইল। দক্ষিণের ডালপালাগুলা বড় জোরে নড়িয়া উঠায় কোনও হিংস্র জন্তু ভাবিয়া সন্ন্যাসী চকিত দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিলেন এবং পরমুহূর্ত্তেই বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। এই দৃশ্যটি সম্পূর্ণ অচিন্ত্যপূর্ব্ব! দুই হস্তে সেই কণ্টকময় ঘন বনের শাখা-প্রশাখা ঠেলিয়া একটি কিশোর বালকমূর্ত্তি সন্ন্যাসীর নিকটস্থ হইবার চেষ্টা করিতেছে। কণ্টকগুল্ম ও বনলতার শ্যাম বাহুতে বালকের সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টিত, অর্দ্ধমলিন হরিদ্রাভ উত্তরীয়খানি এবং বাহু ও পৃষ্ঠদেশ—লম্বিত গুচ্ছ গুচ্ছ কুঞ্চিত কেশগুলি পর্য্যন্ত তাহারা সম্পৃহভাবে অধিকার করিবার চেষ্টায় জড়াইয়া ধরিয়াছে। প্রভাত প্রস্ফুটিত তরুণ পদ্মের ন্যায় অনবদ্য সুন্দর মুখের উপর হরিণের ন্যায় তরল চক্ষু দুইটি ভয়চকিত, ঈষৎ আর্ত্তভাবযুক্ত। নবনীত অপেক্ষা সুকুমার বাহুলতা দুইখানির দ্বারা বন ঠেলিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টায় বালক সরল মৃগের মত বনলতায় অধিকতর জড়িত হইয়া পড়িতেছিল।

সন্ন্যাসী তখনও স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন। সেই বনের মধ্যে সহসা এই কিশোর বালককে দেখিয়া তাঁহার আবার কেমন মোহ আসিয়াছিল। ভাবিতেছিলেন, "এই মূর্ত্তিমান বসন্তের ন্যায় কে এ বালক? এ যে কোন দেবতা তাহাতে সন্দেহই নাই, নতুবা দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ের সঙ্গে এমন অহেতুকী আনন্দ—অননুভূতপূর্ব্ব সুখ অন্তরে কেন জাগিতেছে? দেবতা, কিন্তু কোন্ দেবতা তুমি? হে কিশোর! যার আগমনে বনস্থলীর এই উতরোল ভাব, এই চাঞ্চল্য, সেই কি তুমি! তোমায় কোন্ মন্ত্রে আবাহন করিয়া পাদ্যঅর্ঘ দিতে হইবে? কি কথা বলিতে হইবে?—কোন্ মন্ত্র সে?"

সহসা একটা স্বর কর্ণে প্রবেশ করায় সন্ন্যাসী আবার চকিত ভাবে চাহিলেন।

স্বরটিও অশ্রুতপূর্ব শ্রুতিসুখকর। বীণাবেণুর মত নহে তথাপি অধিকতর মোহময়। সেই স্বরের উৎপত্তি স্থান নির্দ্দেশে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, যেন বায়ুবেগে সেই প্রভাত পদ্মের আরক্তিম পর্ণ দুইখানি কাঁপিতেছে এবং সেই তরল চক্ষে প্রশ্নভরা চকিত দৃষ্টি! সেই সন্ন্যাসীর উপরই নিবদ্ধ!—"ইয়ে পাহাড়মে ক্যা মহারাজকে ডেরা হায়?"

বালককে তাঁহার নিকটস্থ হইবার চেষ্টায় অধিকতর বিপন্ন দেখিয়া, এইবার সন্ন্যাসীর বাক্যস্ফূর্তি হইল, বাধা দিয়া বলিলেন—"আর অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিও না, কষ্ট পাইবে। স্থির হইয়া দাঁড়াও। তোমায় কেহ সাহায্য না করিলে এ কণ্টক-লতা-বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবে না!" সন্ন্যাসীর দিকে স্থির-দৃষ্টি করিয়া বালক নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী বালকের নিকটস্থ হইয়া অপর দিক হইতে সুকৌশলে বালককে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই লতা-পাশ-বেষ্টিত উত্তরীয়-জড়িত কিশোর কমনীয় দেহখানি, এবং কণ্টকাঘাতে আরক্ত মৃণালনিন্দিত বাহু দুইটি স্পর্শ করিতে তখনও যেন সন্ন্যাসীর বিভ্রম উপস্থিত হইতেছিল! তাহার সেই ঘনকৃষ্ণবিলম্বিত কেশগুলি, যাহার মধ্যে সেই সুন্দর মুখখানি পদ্মের মতই ফুটিয়া আছে, বনলতার অত্যাচারে সেই বিপর্যাস্ত কেশগুলির আকুঞ্চনের মধ্যে লতাচ্যুত যে ফুল কয়টি বাধিয়া গিয়া বালকের প্রতি বনের প্রীতি ও পূজার সাক্ষ্য দিতেছে, তাহা দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসীর এখনও তাহাকে বিপন্ন বনদেব বলিয়াই মনে হইতেছিল!

কিছুক্ষণ চেষ্টার পর বালক মুক্ত হইল। অগ্রসর হইয়া শির নত করিয়া যুক্তকরে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিল। "ঠাকুরজি! পাঁও লাগে! আপ ইয়ে পাহাড় পর ডেরা রাখিন হেঁ?"—কি সুধাময় মধুর স্বর? সন্ন্যাসীর মনে হইতেছিল, কর্ণ যেন এমন সুখ আর কখনও পায় নাই। মনের সে ভাব দমন করিয়া সন্ন্যাসী বালককে প্রতি প্রশ্ন করিলেন—"এই পাহাড়ে যে কাহারও আবাস থাকিতে পারে, তাহা বালক কিরূপে জানিল? সেই বা কে? এ জঙ্গলে কোথা হইতে সে আসিল?" বালক তাহার চক্ষু দুইটি সন্ন্যাসীর দিকে স্থির করিয়া ধীরে ধীরে বিশুদ্ধ হিন্দীতে বলিতে লাগিল, কিছু দূর হইতে তাহারা পর্ব্বতের গাত্রে একটা ধূম-রেখা লক্ষ্য করিয়া সেখানে কোন সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রমের আশা করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সঙ্গে তাহার রুগ্ন দুর্ব্বল পিতা। তাহারা 'হরদোয়ার' (হরিদ্বার) হইতে পুরুষোত্তম দর্শনে যাইবার জন্য গৃহত্যাগ করিয়া অদ্য কয়েক মাস হইতে পথ চলিতেছিল। পথে পিতা রুগ্ন হইয়া পড়িলেন,

তিনি এখন ৺বৈদ্যনাথ জীর ধামে পৌঁছিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন,—কিন্তু আর তাঁহার পথ চলিবার ক্ষমতা নাই, তিনি প্রায় মুমূর্ষু! আশ্রয় প্রাপ্তির জন্য উভয়ে এই ধূম লক্ষ্য করিয়া পর্ব্বতের নিকটে অগ্রসর হইতেছিল, এক্ষণে পিতার আর চলিবার শক্তি না থাকায় তাঁহাকে একস্থানে শোয়াইয়া বালকই আশ্রয়ানুসন্ধানে চলিয়াছে, পথমধ্যে ঠাকুরজীর সহিত সাক্ষাৎ!

সন্ন্যাসী একটু দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "অবোধ বালক! লোকালয়ের অনুসন্ধান না করিয়া এই ধূম লক্ষ্য করিয়া গভীর বনের মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছ? ও ধূম তো পর্ব্বতের দাবাগ্নিও হইতে পারিত?" বালক বলিল—"তাহাদের মনে এক একবার সে আশঙ্কা হইলেও ইহা ভিন্ন তাহাদের আর অন্য গতি ছিল না। কেননা কয়েক দণ্ড বেলা থাকিতেই তাহারা এই বনে পথ হারাইযাছে; এক্ষণে দিবা অবসানপ্রায়! লোকালয় প্রাপ্তির কোন পথ না পাইয়া অগত্যা তাহারা অনিশ্চিত আশায় এই দিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া, অন্য কোন উপায় দেখিতে পায় নাই। তাহার পিতাও বলিয়াছিল যে, পাহাড়ে সাধুমহাত্মারা বাস করিয়া থাকেন। হৃষীকেশ পাহাড়ে এরূপ অনেক সাধু আছেন। যাহা হউক এক্ষণে পাহাড়ে কেহ না থাকিলেও আর দুঃখ নাই, কেননা তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, সেই ধূম লক্ষ্য করিয়াই সে ঠাকুরজীর নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে! ঠাকুরজী নিশ্চয়ই তাহার রুগ্ন মুমূর্ষু পিতাকে রাত্রির মত একটু আশ্রয় দিবেন।" সন্ন্যাসী সস্নেহে বালকের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তোমার পিতা কোথায়?" বালকের সুমধুর কথাগুলি এবং নিঃসঙ্কোচ সাহায্য প্রার্থনার সারল্যে বিপন্ন আর্ত্তভাবের মধ্যেও তাহার এই সরলতায় সন্ন্যাসী বালকের উপর কেমন একটা স্নেহ অনুভব করিলেন। তাহার অনন্যসাধারণ কিশোরকান্তি তো পূর্ব্বেই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, এক্ষণে সে আকর্ষণে যেন অধিকতর শক্তি সংযোগ হইল; বালকের সাহায্য করিতে আগ্রহ ও ইচ্ছা হইতে লাগিল।

বালকের সঙ্গে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সন্ন্যাসী এক রুগ্নকে বনমধ্যে শায়িত দেখিলেন। রুগ্ন মাঝে মাঝে যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিতেছিল; এক্ষণে নিকটে মনুষ্য পদশব্দ বুঝিয়া ডাকিল, "পার্ব্বতী!" বালক ছুটিয়া গিয়া পিতার মস্তক হস্তে তুলিয়া ধরিল এবং বলিতে লাগিল, "বাবা! আর কুছ, ডর্ নেহি হ্যায়! ঠাকুরজী সে মূলাকাৎ হুয়া, উননে আভি তুম্‌কো দেখ্‌নে আতে হেঁ। তুম আচ্ছা হো যাওগে, পুরুষোত্তম কো দরশন করোগে, আব্ কুছ ডর্ নেহ, ঠাকুরজী আগিহিন্।"

বালকের অকৃত্রিম সারল্যে এবং নির্ভরযুক্ত বাক্যে সন্ন্যাসীর চক্ষু দ্বিগুণ স্নেহে সজল হইয়া উঠিল। তিনি রুগ্নের সম্মুখে দাঁড়াইবা-মাত্র রুগ্ন বিস্ফারিত নয়নে তাঁহার দিকে চাহিল। চাহিয়া চাহিয়া অতি কষ্টে হস্ত দুইটি বদ্ধাঞ্জলি করিল। যুগ্মহস্তে ললাট স্পর্শ করিয়া মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল, "বৈজু বাবা, মেরে জনম সফল হো গয়ি বাবা। পার্‌বতী তুম্‌কো বহুৎ ফুকারা। অব্‌ হামারে আরজ্‌ ইয়া যোঁকি হামারা পার্‌বতী'কা তেরি চরণ পর উঠা লেও! হামারে লিয়ে মেরা কুছ্‌ হর্‌জ নেই। মেরি জনম, মোগারৎ হো গিয়া বাবা। লেকিন্‌ পার্‌বতী কো লিয়ে—"

সন্ন্যাসী সজল চক্ষে বালকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আর বিলম্ব করা উচিত নয়—সন্ধ্যা আগতপ্রায়। অন্ধকারে বনে পথ পাওয়া এবং পর্ব্বতারোহণ উভয়ই দুরূহ। তাঁহার ঐ পর্ব্বতেই ডেরা বটে কিন্তু পথ দুর্গম বা আশ্রম অত্যন্ত দূরে নয়! এই বেলা তিনি তাহার পিতাকে আশ্রমে লইয়া যাইতে চান!" বালক ম্লানমুখে তাহার পিতা পর্ব্বতে উঠিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ প্রকাশ করায় সন্ন্যাসী বলিলেন, "সে উপায় আমি করিতেছি, তুমি তোমাদের তল্পী যাহা কিছু আছে, লইয়া আমার সঙ্গে চল।" দীর্ঘোন্নত দেহ, বলশালী, অনতিক্রান্ত যৌবন সন্ন্যাসী, সেই রুগ্নকে অল্প আয়াসেই স্কন্ধের উপর তুলিয়া লইলেন। রুগ্ন নিজ মনে মৃদু মৃদু আপত্তি ও কুণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া ডাকিলেন, "এস পার্ব্বতীপ্রসাদ!"—বালক স্কন্ধে তল্পী তুলিয়া লইয়া সহসা মৃত্তিকার পানে চাহিয়া বলিল, "আপনার পদ্ম ফুলটি!" রুগ্নকে স্কন্ধে লইবার সময় সন্ন্যাসী সেই শতদল ভূমিতে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, এক্ষণে বালককে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া বলিলেন, "উহার কোন প্রয়োজন নাই, নিষ্প্রয়োজনীয় ভাবে পড়িয়া থাকুক!" "না। বৈদ্যনাথজীর নির্ম্মাল্য নয় কি এটি?" সন্ন্যাসী সম্মতি-সূচক মস্তক হেলাইবা মাত্র বালক তল্পী রাখিয়া ফুলটি উঠাইয়া লইয়া মস্তকে ঠেকাইল। তৎপরে ত্রস্তে একবার তাহার গন্ধ-আঘ্রাণের সঙ্গে 'আঃ' শব্দ করিয়া ফুলটি কানের উপরে চুলের গুচ্ছের মধ্যে গুজিয়া দিল এবং তল্পী উঠাইয়া সন্ন্যাসীর পশ্চাদনুসরণ করিল। বালকের ফুলের উপর লোভ ও এই শিশুর মত ব্যবহার দেখিয়া, সন্ন্যাসী প্রথমে হাসিলেন; কিন্তু যখন সেই ঈষৎ মুদিতদল পদ্মপুষ্পটি বালকের কেশের উপর স্থান পাইল, তখন আর তিনি হাসিলেন না। স্নেহপূর্ণ নয়নে ফুলটির এই নূতন শোভা একবার দেখিয়া লইয়া, ভারস্কন্ধে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন।

কয়েক মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। রুগ্ন লছ্‌মীপ্রসাদ সন্ন্যাসীর চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় আরোগ্য হইয়াছেন এবং পার্ব্বত্য নির্ঝরের জল ও স্বাস্থ্যকর বায়ু সেবনে ক্রমে সবল হইয়া উঠিতেছেন। সন্ন্যাসীকে ইহাদিগকে লইয়া অনেকটা ব্যস্ত থাকিতে হইতেছে। নিকটে লোকালয় নাই, রুগ্নের বলকর পথ্যের জন্য তাঁহাকে প্রায়ই গ্রামাভিমুখে যাইতে হয়। লছ্‌মীপ্রসাদের অর্থের অভাব নাই। সন্ন্যাসীকে তাহাদের জন্য ভিক্ষা করিতে হয় না, তথাপি অতদূর হইতে প্রাত্যহিক খাদ্যসংগ্রহই এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার, সন্ন্যাসী কিন্তু অবিরক্ত ভাবে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতেছেন। ইহারা যে চিরদিন এখানে থাকিবে না, তাহা তিনি জানেন এবং তাহাদের জন্য এই শ্রম-স্বীকার তাঁহার কর্ত্তব্যেরই অঙ্গ বলিয়া তিনি মনে করেন। কিছুকাল হইল, তাঁহার একা গ্রাম হইতে খাদ্য বহিয়া আনার কষ্টের লাঘব হইয়াছে। পিতা একটু সুস্থ হওয়ার পর পার্ব্বতীও তাঁহার সঙ্গে যায়; উভয়ে একেবারে কিছুদিনের মত আহার্য্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া আসে। সে জন্য সর্ব্বদা আর তাঁহাকে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে হয় না।

একদিন বৈদ্যনাথ দর্শন করিয়া আসার পর লছ্‌মীপ্রসাদের পুরুষোত্তম দর্শনের সাধ আবার প্রবল হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসী বুঝাইলেন যে, এই সঙ্কল্প তাঁহাকে পুনরায় মৃত্যুমুখে ফেলিবে, কিন্তু বৃদ্ধ তাহাতে দমিল না। বলিল, মরিতে তো একদিন অবশ্যই হইবে, সে জন্য পুরুষোত্তম দর্শনের ইচ্ছা ত্যাগ করা উচিত নয়। যে প্রকার অবস্থা হইয়াছিল, কে জানিত যে, তাহার কপালে তাঁহার ন্যায় সাধুর আশ্রয় লাভ এবং ৺বৈদ্যনাথ-দর্শন ঘটিবে। বাবা ৺বৈদ্যনাথ যখন মনুষ্য দেহ ধরিয়া তাহাকে রোগমুক্ত করিয়া স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দিয়াছেন, তখন কে জানে হয়ত পুরুষোত্তম দর্শনও তাহার ললাটে লেখা আছে। তাহাদের তো একদিকে যাইতে হইবে; ঠাকুরজীর তাহাদের জন্য বহুত তকলিব হইয়াছে, যদিও বাবার ইহা নিত্যকার্য্য তথাপি তাঁহার সাধনার বিঘ্ন করিয়া আর তাহাদের থাকা উচিত নয়। সন্ন্যাসী সে বিষয়ে আর কিছু না বলিয়া অন্য কথা তুলিলেন, 'সম্মুখে ঘোর বর্ষা। যদি তাঁহার পুরুষোত্তম যাইতে একান্তই ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে এই দুইমাস কাটাইয়া শরতের প্রারম্ভে যাত্রা করাই উচিত; নহিলে তিনি সে দুরন্ত পথের কতটুকু যাইতে পারিবেন বলা কঠিন। বৃদ্ধ, সন্ন্যাসীর কথার সারবত্তা বুঝিয়া অগত্যা আরও দুইমাস সেই পর্ব্বতেই

অতিবাহিত করিতে স্বীকৃত হইলেন।

সন্ন্যাসীর বালকের প্রতি সেই প্রথম দর্শনের অকারণ উদ্ভূত স্নেহ এই কয় মাসের অবিরত সাহচর্য্যে সুদৃঢ় বন্ধনেই পরিণত হইয়াছিল। বালকেরও তাঁহার উপর অগাধ নির্ভরতা এবং স্নেহাকাঙ্ক্ষা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া সেই স্নেহপাশে সন্ন্যাসীকে যেন অধিকতর জড়িত করিয়া তুলিতেছিল। বালকের পিতা তাঁহার পার্ব্বতীর প্রতি এই স্নেহভাব লক্ষ্য করিয়া একদিন বলিল—'ঠাকুরজীর নিকটে যদি পার্ব্বতীকে রাখিয়া যাইতে পাইতাম, তাহা হইলে বুঝি নিশ্চিন্ত হইয়া পুরুষোত্তমের চরণে গিয়া পড়িতে পারিতাম। আমিও বুঝিতেছি, সেখান হইতে আমি আর ফিরিতে পারিব না। ঠাকুরজী পার্ব্বতীকে 'চেলা' করিয়া চিরদিন কাছে কাছে রাখিলে, তাহার জন্য আর ভাবিতে হইত না. কিন্তু তাহা আমাদের ভাগ্যে ঘটিবার উপায় নাই। ঠাকুরজী বিরাগী সন্ন্যাসী—তাহাকে লইয়া কি করিবেন।' বৃদ্ধের নিঃশ্বাসটি যেন অন্তঃস্থল হইতেই পড়িল। সন্ন্যাসী একটু হাসিলেন,—তাঁহার আবার চেলা? তাহাও আবার এই ত্রয়োদশ কি চতুর্দশবর্ষীয় বাল-কার্ত্তিকেয়-তুল্য কিশোরকুমার! তাঁহার এই বনবাসী নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী হওয়া কি ঐ বালকের সাধ্য? কি সুখে কি জন্য সে চিরকালের নিমিত্ত এই পর্ব্বতগুহায় কাটাইতে চাহিবে? তিনিই বা কোন্ প্রাণে তাহাকে রাখিতে চাহিবেন? বৃদ্ধ ও বালক যদি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় এই সঙ্কল্প করিত, তাহা হইলেও ইহাতে তাঁহার বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য। সেই নবজাত সুকোমল কাণ্ডচ্যুত বৃক্ষটি এই ত্রিকূটের নীরস কঠিন প্রস্তরের মধ্যে আনিয়া বসাইয়া দিলে তাহাতে বৃক্ষ বা এই প্রস্তর কাহার কোন্ সার্থকতা লাভ হইবে? তিনি জনসঙ্গত্যাগী সন্ন্যাসী, এ বালকের সঙ্গে তাঁহারই বা কি প্রয়োজন?

তাঁহার আবাস-গুহাটি বালক ও বৃদ্ধ কর্ত্তৃক অধিকৃত, তাই তিনি পর্ব্বতের আরও একটু উচ্চতর স্থানে অন্য একটি গুহায় রাত্রিযাপন করিতেন বা ধ্যানাদি কার্য্যে নিঃসঙ্গ হইবার জন্য দিবসেও মাঝে মাঝে সেই স্থানে উঠিয়া আসিতেন। সেদিনও সন্ন্যাসী উপরে উঠিয়া আসিয়া সেই গুহাসম্মুখস্থ শিলাখণ্ডে বসিয়া এই ভাবিতেছিলেন। এই বালককে নিকটে রাখিতে কেন এমন ইচ্ছা আসিতেছে? কেন মনে হইতেছে—সে চলিয়া গেলে আর তাঁহার কিছুই থাকিবে না। সন্ন্যাসী শিহরিয়া উঠিলেন। স্নেহের মোহ এখনও তাঁহার অন্তরে এত অদম্য? ভগবান্ শঙ্কর এই মমতাকে এই জন্যই 'পাশ' বলিয়াছেন। সেই মমতা এখনও

তাঁহার অন্তরে এত প্রবল? আর না,—এ পাশ শীঘ্র ছিন্ন হওয়াই তাঁহার পক্ষে মঙ্গলের।

সেই প্রস্তর খণ্ড ঘেরিয়া ত্রিকূটের কঠিন নীরস হৃদয়োত্থিতা স্নিগ্ধ স্নেহধারা, প্রস্তর হইতে প্রস্তরে কল্ কল্ ঝর্ ঝর্ শব্দে বহিয়া যাইতেছিল। উপল-ব্যথিত গতি নির্ঝরিণী সন্ন্যাসীর পায়ের গোড়ায় ঝুরুঝুরু রবে, করুণ সুরে যেন কাঁদিয়া নামিতেছিল। সন্ন্যাসী আকাশ পানে চাহিয়া দেখিলেন, স্তরে স্তরে মেঘ সেখানে পুঞ্জীকৃত হইয়া পর্ব্বতের অঙ্গে তাহার ছায়া ফেলিতেছে। আলোকস্নাত লতা-পাদপ সহসা কজ্জলাভা ধারণ করিয়াছে, উজ্জ্বল লৌহফলকের মত নির্ঝরিণীর স্বচ্ছ অঙ্গও দলিতাঞ্জন আভা হইয়া উঠিয়াছে। বুঝিলেন, এখনি শ্রাবণ গগন ভাসাইয়া বৃষ্টি নামিবে। নিঃশ্বাস ফেলিয়া গুহা মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখিলেন, সেই বৃহৎ শিলাখণ্ডের নিম্নে নির্ঝরের জলে পা ডুবাইয়া পার্ব্বতী উৰ্দ্ধমুখে চাহিয়া বসিয়া আছে। তাহার সেই নির্ঝরণীর-ধারার ন্যায় স্বচ্ছ তরল বিশাল চক্ষেও মেঘের কৃষ্ণ ছায়া যেন কাজল পরাইয়া দিয়াছে। সন্ন্যাসীর দৃষ্টি মিলিবামাত্র পার্ব্বতী একটুখানি হাসিল, সে হাসিতেও পূর্ব্বের ন্যায় ঔজ্জ্বল্য বা কলতান নাই, সে হাসিতেও যেন আজ সেই মেঘের ছায়া পড়িয়াছে। পার্ব্বতী আজ অন্য দিনের ন্যায় হরিণের মত চপল গতিতে তাঁহার নিকটে ছুটিয়াও আসিল না দেখিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে নিকটে ডাকিলেন। ধীরমন্থর গতিতে বালক উঠিয়া আসিয়া শিলার এক পার্শ্বে পা ঝুলাইয়া বসিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "ওখানে এতক্ষণ একা বসিয়াছিলে কেন? আমার নিকটে কেন এস নাই?"

বালক নতনেত্রে বলিল, "আপনি তো ডাকেন নাই।"

"প্রত্যহ কি আমি ডাকিয়া থাকি?"

"না, কিন্তু আজ আসিতে কেমন ভয় করিতেছিল।"

"কেন পার্ব্বতী?"

বালক একটু ইতস্ততঃ করিয়া আবার নতদৃষ্টি হইয়া বলিল, "আপনি আজ সারাদিনই আমার সঙ্গে কথা কহেন নাই, আর—"

"আর কি পার্ব্বতী?"

"আর কয়দিন হইতেই আপনি যেন আমার উপর—'গোসা' হইয়াছেন, আর কাছে ডাকেন না, ভাল করিয়া কথা"—বলিতে বলিতে অভিমানে বালকের স্বর বদ্ধ হইয়া আসিল। সন্ন্যাসী বেদনা পাইলেন—বালকের নিকট সরিয়া

গিয়া, তাহার মস্তকে হস্তস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "না পার্ব্বতী, তোমার উপর তো রাগ করি নাই। মন ভাল ছিল না, একটু অন্যমনা ছিলাম, তাই তোমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিতে পারি নাই।' পার্ব্বতীর অভিমান পড়িল না,—দ্বিগুণ গম্ভীর মুখে বলিল—"কিন্তু আমরা আর বেশীদিন এখানে থাকিব না—তাহা তো জানেন। তখন আপনার আর কাহারও সহিত কথা কহিতে হইবে না, একা একা বেশ অন্যমনেই তো থাকিতে পারিবেন।" অত্যন্ত বেদনার স্থান স্পর্শ করিলে যেমন লোকের মুখ মুহূর্ত্তে বিবর্ণ হইয়া যায় সন্ন্যাসীর মুখ সহসা তেমনি ম্লান হইয়া গেল, বালক ক্রীড়াচ্ছলে তাঁহার কোন্ বেদনার স্থান যে স্পর্শ করিয়াছে তাহা সে বালক, সে কি বুঝিবে! সন্ন্যাসী মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ—তাহা জানি পার্ব্বতী!' সন্ন্যাসীর হস্ত ধীরে ধীরে বালকের মস্তক হইতে কখন যে স্খলিত হইয়া পড়িল, তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না। তিনি অন্যমনে সেই অন্ধকারময় বনের দিকে চাহিয়াছিলেন। পার্ব্বতী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সহসা ঈষৎ হাসিয়া ফেলিল। অন্ধকার গগন-বক্ষে সহসা বিদ্যুৎ স্ফুরণে সন্ন্যাসী দৃষ্টি ফিরাইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। দুষ্ট বালক তাহার সন্ধান যে অব্যর্থ লক্ষ্য হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। এইবার সে তাহার স্বাভাবিক মধুর কণ্ঠে বলিল—"ঠাকুরজী! এখান হইতে পুরুষোত্তম যাইতে কত দিন লাগে?"

সন্ন্যাসী একটু ভাবিয়া উত্তর দিলেন,—"তাহা তো ঠিক বলা যায় না। তবে তোমার পিতার যেরূপ শরীর তাহাতে অন্য যাত্রী অপেক্ষা তাঁহার পক্ষে কিছু বেশী সময় লাগিবারই সম্ভাবনা।"

"ছয় মাস? ইহা অপেক্ষাও কি বেশী দিন লাগিবে?"

"না, উনি যদি সুস্থ থাকেন—শীতের প্রথমেও সেখানে পৌঁছিতে পার।"

"ধরুন ঐ দুই মাস, তাহার পরে ফিরিতেও না হয় ছয় মাস। বাবা হয় ত দিনকতক সেখানে থাকিতেও চাহিবেন। এই আগামী শীতের পর বৎসরের শীতের মধ্যেই আমরা নিশ্চয় এখানে পৌঁছিতে পারি, নয় কি ঠাকুরজী?"

সন্ন্যাসী একবার একটু ক্ষোভের হাসি হাসিলেন। সরল বালক কাল ও ঘটনা স্রোতকে এখন হইতেই ইচ্ছার বন্ধনে বাঁধিতে চায়। জানে না যে মানুষ তাহার দাস মাত্র। তথাপি বালকের এই অযৌক্তিক অসম্ভাবিত ইচ্ছাতেও তাঁহার অন্তর কেমন যেন ঈষৎ সুখানুভব করিল। সেও তাহা হইলে এখানে অসুখে অনিচ্ছায় অবস্থার গতিতে মাত্র পড়িয়া নাই, এখানে থাকিতে তাহার

ভাল লাগিতেছে, নইলে কেন ফিরিতে চাহিবে? কিন্তু বালক সে, বোঝে না যে, তাহা হইবার নয়! চিন্তাকে আর অগ্রসর হইতে না দিয়া সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "এখানে আসিয়া কি হইবে পার্ব্বতী?"

"কেন, আমি আপনার 'চেলা' হইব।"

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া এইবার গম্ভীর মুখে বলিলেন, 'তোমার পিতা বলিয়াছেন তাহা সম্ভব নয়। তোমার এই তরুণ জীবন। অধ্যয়ন আদি এখনও কিছু হয় নাই, তোমার পিতা কোন উপযুক্ত গুরুর হস্তে হয়ত তোমায় সমর্পণ করিবেন। বিদ্যাশিক্ষার পর তোমায় হয়ত বিবাহ করিয়া গৃহী হইতে হইবে। এ পর্ব্বতবাসে তোমার তো কোন উপকার নাই পার্ব্বতী? এখানে আর কিছু দিন থাকিতে হইলেই হয়ত তোমার আর এস্থান ভাল লাগিত না। তোমাদের ন্যায় নব উন্মেষিত জীবনের বাসের উপযুক্ত স্থান এ তো নয়।" পার্ব্বতী সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল,—"কেন নয়? আমি এইখানেই থাকিব। পুরুষোত্তম হইতে আমি নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিব। আপনি আমার গুরু হইবেন, আপনার কাছেই আমি অধ্যয়ন করিব।" সন্ন্যাসী হাসিলেন।—"হাসিলেন যে, 'চেলা'কে গুরুই ত পাঠ দিয়া থাকেন! আমি হরদোয়ারে কত গুরু ও চেলা দেখিয়াছি।"

"তুমি আমার চেলা হইবে পার্ব্বতী?"

"তাহাই ত বলিতেছি।"

"তুমি যাঁহাদের কথা বলিতেছ, তাঁহারা মহান্ত বা পরমহংস! আমি নিঃসঙ্গ, সন্ন্যাসী! নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসীর 'চেলা' থাকিতে নাই।"

বালক যেন সেকথা কানেই লইল না। বলিল, "বৃষ্টি আসিতেছে, নীচে চলুন।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি এইখানেই থাকিব। অন্ধকার বাড়িতেছে, তুমি এই বেলা শীঘ্র যাও"। তখন হু হু শব্দে বায়ু আসিয়া বন্য পাদপদিগকে পর্ব্বতের অঙ্গে আছড়াইয়া ফেলিয়া নির্ঝরিণীর জলকে ইতস্ততঃ উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছে, মেঘ ত্রিকূটের সর্ব্বোন্নত শিখরে যেন লগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ঝম্ ঝম্ শব্দে বৃষ্টিও আসিয়া পড়িল। বালক সগর্ব্বে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "মনে করিবেন না যে, বৃষ্টি বা ঝড়ের ভয়ে আপনার গুহার মধ্যে আশ্রয় চাহিব, আমি ইহার মধ্যে ফিরিয়া যাইতে পারি।" সেই বৃষ্টিধারা প্লাবিত শিলাময় পথে বায়ুবেগে ইতস্ততঃ সঞ্চলিত পাদপ ও লতার শাখা ধরিয়া বালক বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে পর্ব্বত অঙ্গে অবতরণ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী ডাকিলেন, "পার্ব্বতী—পার্ব্বতী! ফিরিয়া এসো।" বালক ফিরিল না, কিংবা বায়ুর শব্দে সে কথা তাহার কর্ণেই

প্রবেশ করিল না! সন্ন্যাসী দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া তাহাকে ধৃত করিলেন "অবাধ্য বালক! বিপদের ভয় নাই?" প্রকৃতির সেই তুমুল বিপ্লবের মধ্যে তড়িৎপ্রভার মত হাসি দুরন্ত বালকের ওষ্ঠে খেলিয়া গেল—"আমরা যে আর বেশি দিন এখানে থাকিব না, তাহা কেন আপনার মনে থাকে না?"—বালক ফিরিল না, পর্ব্বত বাহিয়া নামিতে লাগিল, অগত্যা সন্ন্যাসী তাহার সঙ্গেই চলিলেন। মুহুর্মুহুঃ তিনি তাহার পতন শঙ্কায় হস্তপ্রসারিত করিয়া বালককে ধরিতে যাইতেছিলেন কিন্তু সে গর্ব্ব ও জয়ের হাসি হাসিয়া তাঁহার সে সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিতেছিল।

নিম্নস্তরে গুহার নিকটে পৌঁছিয়া বালক ভিতরে প্রবিষ্ট হইলে সন্ন্যাসী একটা শিলার নিম্নে আশ্রয় লইয়া দাঁড়াইলেন। পর্ব্বতের সর্ব্ব অঙ্গ বাহিয়া তখন নির্ঝরিণীর আকারে মেঘ-গলিত জলস্রোত কল্ কল্ ঝর্ ঝর্ শব্দে নিম্নাভিমুখে ছুটিতেছিল। প্রবল বৃষ্টিপাতে বায়ুর প্রকোপ তখন কমিয়া গিয়াছে, বৃক্ষলতা সব স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঘন মেঘ পাহাড়ের উপরে ধূমের আকারে নামিয়া তাহার শিখর দেশে অনবরত জল ঢালিতেছে। সন্ন্যাসী সম্মুখস্থিত গুহা-দ্বারে চাহিয়া দেখিলেন—বালক বোধ হয়, তাহার পিতার তিরস্কারে দ্বিগুণ অভিমানে মুখ অন্ধকার করিয়া, সেখানে বসিয়া সিক্ত কেশগুলা লইয়া অঙ্গুলিতে জড়াইতে জড়াইতে এক একবার অভিমান ভরা দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিতেছে। অন্ধকার আকাশে বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মত তাহার কৃষ্ণ কেশের মধ্যে চলন্ত অঙ্গুলী প্রভা এবং সেই দৃষ্টি, অন্ধকার গুহার মধ্যে খেলিয়া বেড়াইতেছে। দেখিতে দেখিতে বালকের সেই অভিমানও যেন সেই বৃষ্টিধারার সঙ্গে গলিয়া মিশিয়া জল হইয়া গেল। ধারা কমিয়া আসিয়াছে দেখিয়া সন্ন্যাসীও আবার নিজ নির্দ্দিষ্ট গুহায় উঠিয়া গেলেন।

শরতের প্রারম্ভেই লক্ষ্মীপ্রসাদ পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন। অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির বিমল অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকটে বিদায় লইলেন কিন্তু পার্ব্বতীর একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব। উত্তেজনার কয়েকটা অস্বাভাবিক দীপ্তি তাহার মুখে চোখে যেন জল জল করিতেছে। যাত্রার জন্য সে পিতাকে পুনঃ পুনঃ সত্বর হইতে বলিতেছিল। বিদায়কালোচিত কৃতজ্ঞতা-সূচক অভিভাষণের বয়স যদিও তাহার হয় নাই, কিন্তু এইজন্য একটু বিষণ্ণ ভাব কিংবা এককোঁটা অশ্রুও তাহার চক্ষে দেখিতে না পাইয়া, তাহার পিতা যেন সন্ন্যাসীর কাছে লজ্জিত হইয়া পড়িল। সন্ন্যাসী যে বালককে অনেকখানিই

ভালবাসিয়াছেন তাহা বৃদ্ধ বেশ জানিত; এক্ষণে পুত্রের এই বিসদৃশ ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ ও ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবে বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে সহসা কি যেমন বলি-বলি করিয়া বলিল—"উহাদের জাতই এইরূপ, উহারা বড় চঞ্চল, স্নেহের প্রকৃত সম্মান জানে না!"—সন্ন্যাসী বৃদ্ধকে বাধা দিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন, "বালক ও পাহাড়িয়া হরিণে কোন প্রভেদ নাই। উভয়কেই ভাল না বাসিয়া উপায় নাই; উভয়েই স্নেহের পাত্র, কিন্তু উভয়েই বন্ধন মানে না, সেইজন্য দুঃখের কোন কারণ নাই, উহাই উহাদের প্রকৃতি।" বালক এইবারে পিতাকে যেন ঠেলিয়া লইয়া চলিল। সন্ন্যাসী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সন্ন্যাসীর সঙ্গে বহুবার নিম্নে গমনাগমন করিয়া পার্ব্বতী বনপথ বেশ ভাল রূপেই চিনিত। পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর মত চপল গতিতে পার্ব্বতী বৃদ্ধের অগ্রে অগ্রে পোঁটলা স্কন্ধে ছুটিয়া চলিল। তাহার চঞ্চল কেশগুচ্ছযুক্ত ক্ষুদ্র মস্তক এবং বৃহৎ "মুরাঠা" বাঁধা বৃদ্ধের শির শীঘ্রই সন্ন্যাসীর দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গেল, পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া চাহিতে গিয়া, শিলাখণ্ডে "হোঁচোট" খাইয়াছিলেন, কিন্তু বালক একবারও পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল না।

তাহারা দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে সন্ন্যাসী তাঁহার নবনির্দ্দিষ্ট গুহায় উঠিয়া যাইবেন মনে করিতেছেন, এমন সময়ে পুনর্ব্বার পদশব্দ হইল। এ পদশব্দ অদ্য ছয়মাস যে তাঁহার অত্যন্ত পরিচিত। সন্ন্যাসীর দ্রুতবাহিত বক্ষস্পন্দনের সমতলেই সেই পদশব্দের তাল ও লয় হইতেছে, ঊর্দ্ধগতিতে হরিণীর মত সে-ই ছুটিয়া আসিতেছে।

সন্ন্যাসী চেষ্টার সহিত একটু হাসিয়া বলিলেন "ফিরিলে যে?" "একটি জিনিস ভুলিয়া ছিলাম!" পার্ব্বতী তেমনি দ্রুতপদে গুহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তখনি আবার বাহিরে আসিল। হস্তে শুষ্কপত্রের মত কি একটা দ্রব্য মুঠোয় বাঁধা। সন্ন্যাসী বলিলেন, "কি জিনিস?" সে কথার উত্তর না দিয়া পার্ব্বতী গুহার সম্মুখে যেন থমকিয়া দাঁড়াইল। এক পার্শ্বে একটি অগ্নিযুক্ত কাষ্ঠ ধীরে ধীরে ধূমাইতেছিল, পার্ব্বতী নিকটস্থ একখানা বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড টানিয়া সেই অগ্নিতে সংযোগ করিয়া দিতে দিতে অবিকৃত হাসিমুখে বলিল, "এই ধূম লক্ষ্য করিয়াই ত আমরা এইদিকে আশ্রমের খোঁজে আসিয়াছিলাম। আপনার ধূনীতে তো সর্ব্বদাই আগুন থাকে, দেখিবেন যেন ইহার অগ্নি না নিভে! এক বৎসর কি দেড় বৎসর পরে যখন আসিব, তখন 'ডেরা' খুঁজিতে তাহা হইলে আর কষ্ট পাইতে হইবে না। এই ধূম দেখিতে পাইলেই পাহাড়ের পথ খুঁজিয়া পাইব।

কেমন ? এ কথাটি মনে রাখিবেন ত ?—ইহার অসম্ভাব্যতার বিষয়ে শত উত্তর সন্ন্যাসীর মনে উদয় হইলেও তিনি নীরবে শুধু ঘাড় নাড়িলেন, পার্ব্বতী আর বাক্যব্যয় না করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল, মুহূর্ত সময়ও যেন তাহার নষ্ট করিলে চলিবে না।

ধীরে ধীরে কাঁপিতে কাঁপিতে সন্ন্যাসী সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া তাহাদের গতিপথ লক্ষ্য করিবার যে ইচ্ছা কয়েক মুহূর্ত পূর্ব্বে মনে জাগিয়াছিল, সে ইচ্ছা মুহূর্ত্তে যেন স্পন্দনশক্তিহীন হইয়া তাঁহাকে বিকলাঙ্গ করিয়া দিল। সমস্ত শরীরে একটা কম্প, ভয়ানক শীত করিতেছে, অথচ কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া যে গুহামধ্যে প্রবেশ করিবেন, এমন ক্ষমতা নাই।

প্রদোষে যখন সন্ন্যাসী তাঁহার উপরের গুহায় যাইতেছিলেন, তখন একবার নিম্নে চাহিয়া দেখিলেন, ছয়মাস পূর্ব্বে এই পার্ব্বত্য ভূমি যেমন নিস্তব্ধ গম্ভীর মুখে অটল মহিমায় দণ্ডায়মান থাকিত, আজ আর তেমন নাই! আজ তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন কাহার কুঞ্চিত কেশযুক্ত ক্ষুদ্র মস্তক, শুভ্র সুকুমার সরলতা চকিতে খেলিয়া আবার তখনই বনান্তরালে অদৃশ্য হইতেছে। সমস্ত পর্ব্বত অঙ্গেই সে যেন মিশিয়া রহিয়াছে। অথচ ঐ যে পর্ব্বত বক্ষে তাহার আবাস স্থলটি, কয়েক খণ্ড শিলায় আবদ্ধা ঐ যে নির্ঝরিণী ধারা ও তাহার শিলাময় ঘাট, গুহাদ্বারের ঐ যে সোপান সমন্বিত বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড, ঐ যে বাল-অশ্বত্থটি যাহার সঙ্গে তাহার হস্তের শতচিহ্ন রহিয়াছে, উহারই অঙ্গে তাহার হরিদ্রাভ বস্ত্রখানি শুকাইত—শূন্য সব শূন্য। নাই—সেখানে সে নাই, তবু কেন এমন ভ্রম হইতেছে? কেন মনে হইতেছে সে যায় নাই। বনের মধ্যে কোথায় লুকাইয়া আছে, এখনি তাঁহার বক্ষ স্পন্দনের সমতলে পা ফেলিতে ফেলিতে ছুটিয়া আসিবে! একি এ—ভ্রান্তি?

গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী পর্ব্বতনিম্নস্থ বনতলের প্রতি চাহিলেন, বনাচ্ছাদনে পথ দৃষ্ট হইবার উপায় নাই, তথাপি বহুদিনের গতায়াতের অনুভবে সন্ন্যাসী বনতল দিয়া সেইপথ যেখানে দূর প্রান্তরে মিশিয়াছে, সেইদিকে বহুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। কেহ নাই, কিছু নাই,—প্রান্তর মনুষ্য চিহ্ন বর্জ্জিত।

প্রভাতে তাহারা যাত্রা করিয়াছে, এখন প্রদোষ! যাত্রার প্রথম উত্তেজনা ও উৎসাহে তাহারা এখন কতদূরই চলিয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসী অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, পর্ব্বতের অন্তরালে ধীরে ধীরে তিনি মুখ লুকাইতেছেন। তাঁহার আরক্তিম বর্ণেও অদ্য এ কি বিবর্ণতা!

তারাচন্দ্রমজ্জিতা রজনী সেই শিলাতলে উপবিষ্ট সন্ন্যাসীর মস্তকের উপর দিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল, আবার প্রভাত অরুণ ত্রিকূটের অঙ্গে আলোকধারা মাখাইয়া উদিত হইলেন। নির্ঝর-স্নাত সন্ন্যাসী উঠিয়া সূর্য্যের আবাহন করিলেন ; মনে হইল, বনের মধ্যেও কে যেন লুকাইয়া লুকাইয়া অন্য দিনের মত সূর্য্যের বন্দনা গাহিতেছে। দুখানি কোমল বাহু উৎক্ষিপ্ত করিয়া আরক্তিম করতল পাতিয়া "এহি সূর্য্য" বলিয়া সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিতেছে! সে কোথায়? নিম্নস্থ গুহাদ্বার হইতে তাহারই করসংযুক্ত বহ্নির অস্পষ্ট ধূম এখনও একটু একটু উঠিতেছে। সন্ন্যাসী ধ্যান করিতে গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

যখন নামিয়া আসিলেন, তখন বেলা দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত। শূন্য হতশ্রী গুহার দ্বারে বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডের ধ্বংসাবশিষ্ট ভস্মস্তূপ মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে, ধূম রেখা নাই! সন্ন্যাসীর অন্তরটি সহসা ধক্ করিয়া একটা গুরুস্পন্দন জানাইল! তবে কি অগ্নি নিবিয়া গিয়াছে? সে যে বলিয়া গিয়াছে—সেই বালকোচিত প্রার্থনা মন আর উচ্চারণ করিতে অগ্রসর হইল না; কিন্তু অন্য মনে সন্ন্যাসী সেই ভস্মরাশি নাড়িয়া দেখিলেন, সামান্য একটু কাষ্ঠ খণ্ডে ভস্মাচ্ছাদিত অবস্থায় অগ্নি তখনও জাগিয়া রহিয়াছে। অন্যমনেই সন্ন্যাসী আর একখানা শুষ্ক গুঁড়ি-কাষ্ঠ টানিয়া লইয়া, সেই অগ্নিতে সংযোগ করিয়া দিলেন।

তাহার পরে শরৎ-হেমন্ত-শীত-অতীত হইয়া আবার সেই বসন্ত পার্ব্বত্য বনভূমিতে উপস্থিত হইল ; কিন্তু কোথায় এবার তাহার সেই রূপ। তাহার পত্রপুষ্পে কোথায় সে রাগ? কোথায় সে সুগন্ধ!

নিদাঘ কাটিয়া বর্ষা আসিয়া আবার পর্ব্বত শিখরে দাঁড়াইল।

সন্ন্যাসী সেই সদ্য প্রজ্জ্বলিত ধূনীটি গুহার ঈষৎ অভ্যন্তরে টানিয়া লইলেন, জলধারায় তাহার অগ্নি না নিবিয়া যায়।

বর্ষচক্র ঘুরাইয়া শরৎ-হেমন্ত ক্রমে শীত আসিল, উদ্বেগে এবং মানসিক উত্তেজনার চাঞ্চল্যে সন্ন্যাসী ক্রমেই যেন শীর্ণ হইতে ছিলেন। প্রভাতে প্রদোষে দ্বিপ্রহরে প্রায় সর্ব্বক্ষণই তিনি নিজ গুহা সম্মুখস্থ শিলাখণ্ডের উপরে বসিয়া প্রান্তর পানে চাহিয়া থাকিতেন আর নিম্নস্থ গুহা হইতে সেই দেড় বৎসরের অনির্ব্বাণ অগ্নি ধূমরাশি দ্বি-গুণতর করিয়া শূন্যপথে প্রেরণ করিতে থাকিত। হায়, এ কি বাসনার ইন্ধন সে তাহাতে সংযোগ করিয়া দিয়া গিয়াছে, যাহার প্রভাব সংক্রামক রোগের মত সন্ন্যাসীর অন্তরের একান্ত অনিচ্ছা সত্বেও যেন জোর করিয়া নিত্য তাঁহাকে সেই অগ্নির পোষণ বস্তু যোগাইতে বাধ্য করিয়াছে! সে আসিবে মনে

করিতেও সন্ন্যাসী অন্তরে যেন একটা কম্পন অনুভব করিতেন কিন্তু সে কম্পন আনন্দ কিংবা ভয়ের তাহা যেন তিনি সব সময়ে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। তাঁহার নিঃসঙ্গ অনাসক্ত জীবনের উপরে সেই বালকের এই প্রচণ্ড প্রভাব লক্ষ্য করিয়া এক্ষণে তিনি যেন তাহাকে একটু ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন! এক একবার যেন মনে হয়, সে আর না আসিলেই মঙ্গল। শীত যতই বাড়িতে লাগিল, সন্ন্যাসীর ততই মনে হইতে লাগিল, এইবার সে নিশ্চয়ই আসিতেছে, আজ কালই সে আসিবে, ততই তাঁহার মনে এই ভয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বাতাস একটু জোরে বহিলে কিংবা কোন শব্দ হইলেই মনে হইত, ঐ বুঝি সে আসিল, ঐ তাহার পায়ের শব্দ, ঐ তাহার নিঃশ্বাস। উত্তেজনার অশান্তিতে সন্ন্যাসী দিন দিন শীর্ণ ও অসুস্থ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এক একটি শান্ত প্রভাতে ধ্যানভঙ্গের পর তিনি আন্তরিক ভাবে প্রার্থনা করিতেন—আর যেন সে না আসে, বালক যেন তাহার সে ইচ্ছা ভুলিয়া যায়, কিন্তু সেই অনির্ব্বাণ অগ্নিকুণ্ডের পানে চাহিলেই তিনি বুঝিতে পারিতেন, আসিবে—সে নিশ্চয় আসিবে। তাহার সেই অদম্য ইচ্ছার ধূনীতে কাষ্ঠ নিক্ষেপ না করিয়া তাঁহার গত্যন্তর নাই।

শীত অতীত হইয়া আবার বসন্ত আসিল, সে আসিল না। বুঝি সন্ন্যাসীর প্রার্থনা সফল হইয়াছে, বালক তাহার সে ইচ্ছাকে ভুলিয়া গিয়াছে। এতদিন সে আর একটু বড়ও হইয়াছে, বুঝিয়াছে যে, সে সংকল্পটা নিতান্তই বালকোচিত! তাহাতে উভয় পক্ষেরই সম্পূর্ণ ক্ষতি। হয়ত ত্রিকূটের কথা তাহার তরুণ তরল মনে এখন আর উদয়ই হয় না? সন্ন্যাসী স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেটা যেন বুকে আটকাইয়া রহিল,- নাসাপথে অগ্রসর হইল না।

বসন্তের পর গ্রীষ্ম আসিল। সন্ন্যাসী দেখিলেন, বসন্তের নবীন সাজকে শুষ্ক, দগ্ধ এবং ভস্মসাৎ করিয়া নিদাঘ রুদ্রপ্রতাপে নেত্রানল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রকৃতির শ্যামল আবরণ ও সেই পাষাণহৃদয়োত্থিত স্নেহধারা শুষ্ক বিশীর্ণ, লুপ্তকায় হইয়া পড়িতেছে।

আবার বর্ষা। দগ্ধ দেহের কালিমা ও ভস্ম, নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া দিয়া আবার বনতল শ্যামশোভায় ভরিয়া গেল;—গিরিনির্ঝরিণী নবজীবন লাভ করিল। দগ্ধ তাম্রবর্ণ দিগন্তের ঘন মেঘ তাহার স্নেহধারা-সঞ্চিত স্নিগ্ধ শ্যাম সজল আভায় নিখিলের তপ্ত রুক্ষ হৃদয়-নয়নকে শীতল করিয়া দিল। দেবতার করুণা

ধারার মত ধারায় ধারায় আশীর্ব্বাদ বারি জগতের মস্তক ও বুকের উপর পড়িতে লাগিল। সন্ন্যাসী সংশয়াপন্ন হইলেন। ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃতির এ কি বিরোধী ভাব! এই যেন সে অনুতাপে ক্ষোভে হৃদয়স্থ সমস্ত কোমল প্রবৃত্তিকে দগ্ধভস্ম করিয়াই ফেলিয়াছিল—আবার তাহার এ কি রূপান্তর! যাহাকে পুড়াইয়া ফেলিয়াছে, তাহাকেই আবার বাঁচাইতে এ কি অজস্র স্নেহাশ্রু-নিষেক! কই এত অগ্নিতেও তাহার বক্ষে উপ্ত সেই মায়ার বীজকে সে তো ধ্বংস করিতে পারে নাই! সে তো আবার নবজীবন পাইয়া তেমনি ফলেফুলে সুশোভিত হইয়া উঠিতেছে, উঠিবে। তবে এ সবই তাহার ক্রীড়া মাত্র! হায় প্রকৃতি! তোমার যাহা ক্রীড়া, দুর্ব্বল মানবের পক্ষে তাহা যে একেবারেই প্রাণান্তকর। তাহারও অন্তরের ফল, ফুল, স্নেহ, আশা সব একদিন নিঃশেষ হইয়া যায়। অমনি করিয়া পোড়ে,—কিন্তু কই, তোমার মত তো আর তাহারা বাঁচিয়া উঠে না। তাহার শেষ যে একেবারেই নিঃশেষ হওয়া।

বহুদিনের নির্মেঘ আকাশে সহসা সে দিন প্রবল মেঘ করিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীর শুষ্ক চক্ষু ও শীর্ণ দেহ ভাসাইয়া দিয়া তাঁহাকেও যেন প্রকৃতির মত শীতল করিল। শীর্ণতা ও অসুস্থতা গিয়া ক্রমে তিনি সবল হইতে লাগিলেন।

॥ ৩ ॥

রাত্রিতে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। সন্ন্যাসীর নিজ গুহা হইতে নামিয়া নিম্নস্থ গুহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে তাঁহার বোধ হইল, রাত্রির প্রবল বৃষ্টিপাতে পূর্ব্বদিন দত্ত কাষ্ঠখণ্ডগুলি পুড়িয়া নিঃশেষ ভস্মরাশি ধুইয়া বহিয়া গিয়াছে। ধূনীর অগ্নি অদ্য একেবারে নির্ব্বাপিত!

নিবিয়াছে?—অদ্য দুই বৎসর যাহার প্রবল ইচ্ছাশক্তিকে সন্ন্যাসী নিজের অনিচ্ছায়ও সাগ্নিকের ন্যায় সেই অগ্নি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন—তাহার সমিধ যোগাইয়া আসিয়াছেন, অদ্য দুই বৎসরের সেই বাসনার সন্ধুক্ষিত অগ্নি-স্রোত আজ নিবিয়াছে? তাঁহাকে স্বেচ্ছায় নিষ্কৃতি দিয়াছে। কেহ জোর করিয়া নিবায় নাই। আর এ মিথ্যা স্তোকের প্রয়োজন নাই বুঝিয়া প্রকৃতিই অদ্য তাঁহার প্রতি এই দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মুক্তির গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া সন্ন্যাসী অবশিষ্ট ভস্মগুলি একদিকে নিক্ষেপ করিলেন ও নির্ঝর হইতে কলসে করিয়া জল আনিয়া গুহাতল সম্পূর্ণরূপে ধৌত করিলেন। যেন তাঁহার স্মৃতি পর্য্যন্ত পর্ব্বত গাত্র হইতে অদ্য তিনি ধুইয়া মুছিয়া দিলেন। তাঁহার মনে হইল,

পর্ব্বত অদ্য ভরত রাজার মত মৃগস্নেহান্ধতার ফলযোগ স্বরূপ কালব্যাপী জড়ত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিল। তাঁহার পাপই যদি হইয়া থাকে তো অদ্য তাহার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইয়াছে; ঐ ধূনীর আপনা হইতে নির্ব্বাণই তাহার প্রমাণ। সন্ন্যাসী আজ বহুদিন পরে পূর্ব্বের মত নিজের আশা, তৃষ্ণা, স্মৃতি-চিন্তালীন, মায়াবন্ধহীন, নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসীত্বকেও যেন অনুভব করিলেন!—এতদিন ভয়ে তিনি সে গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই।—মনে হইত, এখনি সে কোন্ নিভৃত স্থান হইতে "ঠাকুরজী" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া জানু জড়াইয়া ধরিবে। অদ্য আর সে কথা মনে হইল না। সন্ন্যাসী নিজের আসন দ্রব্যাদি সেই গুহায় বহিয়া আনিয়া পূর্ব্বের মত স্থাপিত করিলেন এবং স্নানান্তে ধ্যানে বসিলেন।

ধ্যানভঙ্গের পর যখন উঠিলেন, তখন সূর্য্য পশ্চিম আকাশে গিরি অন্তরালে অস্তমিত। গুহার মধ্যে প্রায় অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে—বাহিরে প্রদোষের স্তিমিত আলোক। বহুদিন তিনি এমন গভীর ভাবে ধ্যানমগ্ন হইতে পারেন নাই। শান্তিতৃপ্ত অন্তরে সন্ন্যাসী গুহার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই কোমল মৃদু আলোকে শিলাপটে পা ঝুলাইয়া বসিয়া ও কে! রুক্ষ কেশের রাশি তাহার অঙ্গস্থ গৈরিক বসনের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সায়াহ্নে আকাশতলে মেঘমনে যেন মূর্ত্তিমতী জ্যোতির্ম্ময়ী প্রাবৃট্-সন্ধ্যা। সন্ন্যাসীর পদশব্দে সে মুখ ফিরাইতেই সন্ন্যাসীর বোধ হইল, সেই সন্ধ্যার ললাটে দুইটি অতি উজ্জ্বল বিশাল জ্যোতিষ্ক ফুটিয়া উঠিয়া, তাহার মধুরোজ্জ্বল রশ্মি-প্রভায় তাঁহার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া তুলিল। বিস্ময়ে একটা অজানিত পুলকে তাঁহার সমস্ত শরীর যেন স্তব্ধ ও কণ্টকিত হইয়া উঠিল কি এ! কে এ! সান্ধ্য-রবিকরোজ্জ্বল চলন্ত স্বর্ণ মেঘখণ্ডের ন্যায় সে সন্ন্যাসীর নিকটে আসিবামাত্র তাহার অধরোষ্ঠ হইতে একটা "প্রভা-তরল জ্যোতিঃর" ছটা ছুটিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীর চক্ষে লাগিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী সমস্ত দেহমনে চমকিয়া উঠিলেন "কে এ! কার এ হাসির বিদ্যুৎ বিভ্রম?"

"ঠাকুরজী!"

"কে তুমি? কে? তুমি কে?"

উত্তর না দিয়া সে সন্ন্যাসীর চরণতলে নত হইল, তাহার পরে সম্মুখে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইতেই সন্ন্যাসী চিনিলেন, হাঁ—সেই মুখই বটে। কিন্তু তবু এতো সে নয়। এই দুই বৎসরে তাহার একি বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন! সন্ন্যাসী

স্খলিতকণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন, "পার্ব্বতী?—না,—তবে কে তুমি? পার্ব্বতীরই মত, অথচ সে নও।—কে তুমি—তবে?" সে কথারও কোন উত্তর না দিয়া—সেই গৈরিক-বসনা সন্ন্যাসীর পানে পুনর্ব্বার দৃষ্টি স্থির করিয়া বলিল—"কই আপনি ত ধূনী জ্বালিয়ে রাখেন নাই? আজ সমস্ত দিন আমি এই পাহাড়তলীতে পথ খুঁজিয়া কত কষ্ট পাইয়াছি।"

হাঁ সেইই বটে! ঐ যে পর্ব্বত-অঙ্গে তাহার আগমনের সাড়া পড়িয় গিয়াছে। সমস্ত পার্ব্বত্য প্রকৃতি, স্থির ভাবে অন্ত দুই বৎসর পরে সেই স্বরসুধা পান করিতেছে। পূর্ব্বের তরলতা লুপ্ত হইয়া একটি মধুর স্নিগ্ধভাবে সে স্বর যেন এখন অধিকতর মোহময় হইয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যানিলসঞ্চলিত বনের ব্যগ্র বাহু তাহার হারান ধনটিকে বক্ষে চাপিয়া লইবার জন্যই যেন ব্যগ্র হইয়া উঠিল; পর্ব্বতের অঙ্গেও এক শ্যাম-স্নিগ্ধ স্নেহ-বাষ্প ঘনীভূত হইয়া তাহার প্রাপ্ত নিধিকে যেন অঞ্চলে ঢাকিয়া লইতে চাহিল। হায়,—কাহাকে ধরিতে তাহাদের এই স্নেহ-ব্যগ্র বাহু প্রসারণ, এই বক্ষ-বিস্তার!—"আসিয়াছে, সে আসিয়াছে!" কাহার আগমনে নির্ঝরিণীর এই আনন্দোচ্ছল কলধ্বনি! যাহার আগমন প্রত্যাশায় তাহারা অন্ত দুই বৎসর অন্তরে বাহিরে পথ চাহিয়া আছে, সে আজ আসিয়াছে বটে, কিন্তু তবু এ বুঝি সে নয়! সে যে বুকে ধরিবার বস্তু—স্পর্শক্ষম বস্তু, আর এ কি? এ যে প্রজ্বলিত অনল-শিখা! তাহার স্বর, তাহার মুখ, তাহার হাসি, তাহার নাম লইয়া আজ এ কে আসিল? এই ব্যগ্রবুকে তাহাকে একবার টানিয়া শিরোঘ্রাণ লইবারও যে উপায় নাই; এ যে স্পর্শেরও অতীত। সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে সেই শিলাপটের উপর বসিয়া পড়িলেন। পার্ব্বতীর অতীতদৃষ্ট বালক-মূর্ত্তির স্মৃতি এখনকার এই তরুণীর সঙ্গে মিলিয়া সন্ন্যাসীর মনের মধ্যে উভয়ের সামঞ্জস্য বোধের একটা আলোক জ্বালিয়া দিল।

পার্ব্বতী ক্ষণেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া আপনা হইতেই নিঃশব্দে সন্ন্যাসীর পায়ের নিকটে বসিয়া পড়িল। সন্ন্যাসী সহসা সচকিত হইয়া সরিয়া বসিলেন, মৃদু স্বরে প্রশ্ন করিলেন,—"তোমার পিতা?"—পার্ব্বতী নতমুখে উত্তর দিল, "আজ ছয় মাস হইল, পুরীসমুদ্রের স্বর্গদ্বার-সৈকতে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।" সন্ন্যাসী ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন,—"পার্ব্বতী?—তাহার কি হইল?" তরুণী আবার তাঁহার পানে দৃষ্টি স্থির করিয়া বলিল, "আপনি কি আমায় চিনিতে পারিতেছেন না, ঠাকুরজী!"

"না, কারণ, তুমি ত সে পার্ব্বতী নও। তুমি ধূনী জালিয়া না রাখার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলে,—দুই বৎসরের প্রজ্বলিত ধূনী এই পর্ব্বত আজই নিবাইয়া দিয়াছে। তুমি বোধ হয়, তখন এই বনতলেই ঘুরিতেছিলে। সেই পার্ব্বতীর দেহ লইয়া অন্য একজন তাহার নিকটে আসিতেছে দেখিয়াই সে এ অগ্নিহোত্র নিবাইয়াছে। এ পার্ব্বতীকে তাহারা কেহই চিনে না।" সন্ন্যাসীর এই প্রচ্ছন্ন তিরস্কারে পার্ব্বতী মস্তক নত করিল, কিন্তু উত্তর দিতে বিরত হইল না। "আমি আজ আসিয়া পৌছিয়াছি দেখিয়াও ত সে অনাবশ্যক অগ্নিটা নিবাইয়া দিতে পারে!" পার্ব্বতীর এ উত্তরে সন্ন্যাসী চমকিত হইয়া উঠিলেন। 'তাই কি? তাই কি তাঁহার অন্তরও আজ এত শান্ত স্নিগ্ধ শুদ্ধ-বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল? আকর্ষণকারী অথবা আকৃষ্ট বস্তু নিকটে আসিয়াছে বলিয়াই কি এই নিশ্চিন্তভাব?"

পার্ব্বতী বলিয়া যাইতেছিল,—"পিতা আমার জ্ঞানোন্মেষ হইতেই আমায় বালক সাজাইয়া রাখিতেন, আমিও চিরদিন ঐ ভাবেই কাটাইয়া আসিয়াছি। তিনি প্রথমেই এ কথা আপনাকে জানান নাই বলিয়া পরে পাছে আপনি কিছু মনে করেন, এই আশঙ্কায় আর সে কথা আপনাকে বলিতে পারেন নাই। বিশেষ পথে বালিকা সঙ্গে লইয়া চলা অপেক্ষা আমায় বালক-বেশে রাখিতেই তিনি ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু তাহাতে কি এমন অন্যায় হইয়াছে? আমি তখনও পার্ব্বতী ছিলাম, এখনও তাহাই আছি। কেবল পিতা শেষে এ জন্য অনুতাপ করিয়াছিলেন বলিয়া আপনার সম্মুখে আর ছদ্মবেশে আসি নাই। আপনি ছদ্মবেশ মনে করিতেছেন বলিয়াই একথা বলিতেছি, নইলে আমি জানি, সেইই আমার চিরদিনের বেশ! সারা পথ আমি বালক সাজিয়াই আসিয়াছি। পিতা পুরুষোত্তমের পথে অল্পদূর অগ্রসর হইয়াই পুনর্ব্বার রুগ্ন হইয়া পড়িল। সেখানে পৌছিতে আমাদের প্রায় এক বৎসর লাগে। ছয়মাস হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।"

"তাহার পরে?"

"তাহার পরে আর কি? শ্রাদ্ধ সারিয়াই আমি বাহির হইয়া পড়ি।"

"কেন বাহির হইলে?"

"কেন বাহির হইলাম?" বিকশিত পদ্ম নেত্রে যেন ব্যথার তড়িৎ স্পর্শ করিল!—"কেন? আপনার কাছে না আসিয়া তবে কোথায় যাইব?"

সন্ন্যাসী মস্তক নত করিলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন, "পিতা কি তোমার কোন

ব্যবস্থা করিয়া যান নাই? সেখানে ত তোমরা প্রায় ছয়মাস ছিলে, সেখানে কাহারও সহিত কি তোমাদের পরিচয় হয় নাই? কাহারও আশ্রয়ে কি তোমাকে রাখিয়া যান নাই?"

"রাখিয়া গিয়াছিলেন।"

তবে? তাহারা কি তোমায় যত্ন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে নাই?"

"কেন করিবে না? আমি সেখানে থাকিব না? আমি না থাকিলে তাহারা কি আমায় জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারে?"

"কেন এমন কাজ করিলে?"

কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক থাকিয়া পার্ব্বতী উত্তর দিল, "বেশ করিয়াছি"। তাহার ব্যথিত ক্রোধপূর্ণ স্বর শুনিয়া সন্ন্যাসী পার্ব্বতীর পানে চাহিলেন, সন্ধ্যার অন্ধকার বৃক্ষতলে ঘনতর হইতেছিল, মুখ দেখা গেল না! সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "তোমাকে আমার নিকট রাখিবার যে উপায় নাই, তাহা ত তোমার পিতার মুখেই শুনিয়াছ।"

"আমি সে কথা জানি না, আমি আপনার 'চেলা' হইব, তাহাতো আপনাকে বলিয়া গিয়াছিলাম।"

"তুমি স্ত্রীলোক!"

"হইলাম বা। কত সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসিনী শিষ্যা কত?"

"কাজ বড়ই অন্যায় করিয়াছ। তোমাকে আবার হয় পুরুষোত্তমে, নয় পূর্ব্ব বাসস্থান হরিদ্বারে ফিরিয়া যাইতে হইবে।"

"এই সুদীর্ঘ পথ ভাঙ্গিয়া আবার আমি তত দূরে ফিরিয়া যাইব?"

"হাঁ!"

"যাইতে পারিব কেন?"

"তা তুমি পারিবে।"

"যদি না যাই?—তাড়াইয়া দিবেন, কেমন?"

সন্ন্যাসী একটু হাসিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "হাঁ।"

"আজই? এখনই কি? দেন্ তবে—"

বলিতে বলিতে পার্ব্বতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

সন্ন্যাসীর বোধ হইল, যেন সেই কঠিন পর্ব্বত পৃষ্ঠ দ্বিগুণ কঠিন ও স্তব্ধ হইয়া পড়িতেছে, নির্ঝরিণীর কলধ্বনি একেবারে নিঃশব্দ—বায়ুস্পন্দহীন। পূর্ব্ব আকাশে অর্দ্ধোদিত চন্দ্র এবং গগনের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তারকাপুঞ্জও স্থির চক্ষে

যেন এই ব্যাপারের শেষ প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। সন্ন্যাসী কথা কহিলেন, যেন বহুদূর হইতে রোদনধ্বনি ভাসিয়া আসার মত সে শব্দ,—"তুমি বোধ হয় সমস্ত দিন কিছু খাও নাই ?"

"তাহাতে কি ! আমার এমন কতদিন যায়।"

"আজ তাহা উচিত নয়, কেন না এ আশ্রমে তুমি আজ অতিথি ! পার্ব্বতী ! তোমার ঝরণার জলে স্নান করিয়া এস।"

"আপনি ব্যস্ত হইবেন না। আমার তেমন ক্ষুধা-বোধ হয় নাই।"

"আমার কিন্তু হইয়াছে, পার্ব্বতী ! আমিও সমস্ত দিন কিছু খাই নাই। আজ ফলাহরণ করিতে পারি নাই কিন্তু আজ খাদ্য আছে। আমি আলোক জ্বালি, তুমি স্নান সারিয়া লও।"

সন্ন্যাসী গুহার মধ্যে গিয়া কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণে বহু চেষ্টায় অগ্নি জ্বালিলেন। এ দুই বৎসর আর এ শ্রম স্বীকার করিতে হয় নাই। আজ দুই বৎসর যাহার হস্ত-প্রজ্বলিত-অগ্নি এই গুহার বুকে তাহার স্মৃতির সঙ্গে দিবারাত্র ধূমাইয়াছে, আজ তাহারই এখানে স্থান নাই, বুঝি তাহাকে এখানে প্রবেশ করিতে দিলেও প্রত্যবায় আছে। হায় প্রভু শঙ্করাচার্য্য ! যে নারী জাতির দোষের কথা বলিতে তুমি "অচতুর্বদনো ব্রহ্মা" হইয়াছ, পার্ব্বতী সেই জাতি ? প্রাণিগণের শৃঙ্খলস্বরূপা, নরকের দ্বারকথিতা হেয় নারী সন্ন্যাসীর পক্ষে বুঝি দয়ারও অযোগ্যা সে !

সন্ন্যাসী বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, পার্ব্বতী সেই এক ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে—নড়ে নাই সরে নাই। বুঝিলেন বালিকার পক্ষে আঘাতটা অত্যন্ত গুরুতর হইয়াছে। তাহার এই দারুণ অধ্যবসায় ও পরিকষ্টের প্রথম সাফল্যলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে এতটা আঘাত দেওয়া উচিত হয় নাই। আজই তাহাকে ফিরিবার কথা বলায় অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা প্রকাশ হইয়াছে। এ কার্য্যটি তাঁহার সন্ন্যাসধর্ম্মের উপযোগী হইলেও যে মহান্ ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া একদিন তিনি তাহাদের আশ্রয় দিয়াছিলেন, বহুদিন স্নেহযত্ন দেখাইয়াছিলেন, সেই মানব-ধর্ম্মের উপযুক্ত হয় নাই। সে ধর্ম্ম অদ্য নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হইতেছে। আর আজ যদি সেই বালক পার্ব্বতী এমনি করিয়া ছুটিয়া আসিত, তাহা হইলে কি তিনি তাহাকে এমন কঠিন কথা বলিতে পারিতেন বা দূরে ঠেলিয়া দিতে পারিতেন। হায় কেন তাহা হইল না ? কেন তাঁহার সেই সুখস্পর্শ-কিশোর চন্দ্রটি এমন জ্বলিত হুতাশন রূপ ধারণ করিল ? যাক্ সে খেদ, সে স্নেহবন্ধনও যে এইরূপে

কাটিয়া গেল। সে ভালই হইল। কিন্তু তথাপি এ ত সেই পার্ব্বতী, যাহার জন্য আজ দুই বৎসর—না, তাহাকে নিকটে রাখা হইবে না, তবে মিষ্ট কথায় অন্ততঃ আগামী কল্য ইহা বুঝাইয়া দিলেও চলিত। আজ তাহার দুরন্ত পথশ্রমাপনোদনের জন্য আতিথ্য স্বীকার সস্নেহ—ব্যবহার প্রদর্শনই কর্ত্তব্য ছিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "পার্ব্বতী! স্নানে যাও।" পার্ব্বতী নড়িল না—উত্তর দিল না। তখন কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় আদর মাখা কোমল কণ্ঠে সন্ন্যাসী ডাকিলেন, "পারবতিয়া? কথা শুনিবে না?"

মুহূর্ত্তে পতনশীলা পার্ব্বত্য প্রবাহিনীর ন্যায় তীব্র বেগে পার্ব্বতী তাঁহার নিকটে ছুটিয়া আসিল। দুই বৎসর পূর্ব্বের ন্যায় অসঙ্কোচ ক্ষিপ্র হস্তে সন্ন্যাসীর দুই হস্ত ধরিয়া ফেলিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে এবং নিজেও পশ্চাতে হেলিয়া পড়িয়া পাছু হটিতে হটিতে বলিল, "বলুন—আমায় এই পাহাড়ে থাকিতে দিলেন? বলুন তাড়াইয়া দিবেন না? বলুন, নহিলে আমি কিছুই খাইব না। যাইব ত নাই, কিন্তু এইখানে ধর্‌না দিয়া পড়িয়া থাকিব, আপনার কিছু খাইব না। দেখিব আপনি কিরূপে অতিথি সৎকার করেন? বলুন, শীঘ্র বলুন!" হস্ত মুক্ত করিয়া লইয়া সন্ন্যাসী গুহাদ্বারে সরিয়া আসিলেন। বুঝিলেন, এ বালিকার বাক্যে ও কার্য্যে কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। বলিলেন, "এই সত্যে বদ্ধ না হইলে তুমি সত্যই আহার করিবে না?"

"না।"

আচ্ছা, তাহাই হউক! তুমি এই পর্ব্বতেই থাক।"

আবার মুখের হাস্য বিজলী খেলাইয়া পার্ব্বতী ঝরনার দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল; স্নানান্তে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—সন্ন্যাসী তখনও একভাবে গুহাদ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন। হাসিয়া বলিল, "এই বুঝি আপনার অতিথি সৎকার? সরুন, আমি সব যোগাড় করিয়া লইতেছি।" সন্ন্যাসী ত্রস্তে পথ ছাড়িয়া দিলেন। গুহাস্থ আলোকও নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিয়াছিল, এইবার ইন্ধন পাইয়া সে সতেজে জ্বলিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে পার্ব্বতীর আহ্বানে সংজ্ঞালাভ করিয়া সন্ন্যাসী গুহামধ্যে চাহিয়া দেখিলেন, আহার্য্য প্রস্তুত। অপ্রতিভ ভাবে তিনি গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "আমায় সাহায্যের জন্য ডাকিলে না কেন পার্ব্বতী? এই পথশ্রম ও অনাহারের উপর তোমায় বড় কষ্ট দিলাম।" পার্ব্বতী হাসিমুখে উত্তর দিল, "সারাদিন পথ হাঁটার পর এ রকম পরিশ্রম কি আমায় প্রায় প্রত্যহই

করিতে হইত না। এখন আহারে বসুন; সমস্ত দিন খান নাই কেন? পাহাড়ে ত ফলজল ছিল।"—সে কথার উত্তর না দিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "পার্ব্বতি! আমায় শকি আতিথ্যটুকুও অন্ততঃ করিতে দাও; তুমি অগ্রে খাও, বিশ্রাম কর, পরে আমি খাইব।" পার্ব্বতী এবার দুই বৎসর পূর্ব্বের মত উচ্চ হাস্যের কলধ্বনি তুলিয়া বলিল, "আপনার অতিথি সৎকার প্রথম হইতেই তো খুব চমৎকার রকমের হইয়াছে, এখন এটুকুতে আর দোষ স্পর্শিবে না। এতো আমার গুহায় আমার গৃহস্থালীতেই আপনি আজ আসিয়াছেন। এটতে তো আমার গৃহস্থালাই ছিল।"

"আজ একদণ্ডের মধ্যে তুমি যতখানি গৃহিণীপনা প্রকাশ করিতেছ, দুই বৎসর পূর্ব্বের পার্ব্বতী এতখানি জানিত না! কথাবার্ত্তায় ও অন্যান্য বিষয়ে তুমি এখনও সেই বালক পার্ব্বতীই আছ বটে কিন্তু কার্য্যতঃ"—বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী থামিলেন। পার্ব্বতীও একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া মুখ নীচু করিল। সেই নারীত্বের নবীন আভামণ্ডিত মুখের উপরে গুহার দীপ্ত আলোক পড়িয়া যে অপূর্ব্ব শ্রী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া সন্ন্যাসী পুনর্ব্বার স্তব্ধ হইয়া গেলেন। বুঝিলেন এই নারী যেখানে চরণপাত করিবে, সেইখানেই গৃহ আপনি গড়িয়া উঠিবে! হায় রমা! নিজ শ্রী-ভাণ্ডার শূন্য করিয়া এই অপূর্ব্ব সম্পদকে কোথায় পাঠাইলে? এই সন্ন্যাসীর গুহায়? এ কি বিদ্রূপ তোমার? সন্ন্যাসীকে নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া পার্ব্বতী বলিল,—"কই বসুন।" "তুমি?" আবার সেই রূপ সলজ্জ সহাস্যে মুখ নত করিয়া পার্ব্বতী বলিল,—"এর পরে।" সন্ন্যাসী আর বাক্যব্যয় করিলেন না। নিঃশব্দে, দেবতাকে আহার্য্য নিবেদন করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মানস চক্ষে তখন বাল্য যৌবনের স্মৃতিময় গৃহের চিত্র নিঃশব্দে ফুটিয়া উঠিতেছিল! সেই গৃহে স্বজনসেবারতা স্নেহশীলা মাতা ও ভগিনীর প্রীতি! তাঁহাদের সেই অক্লান্ত কর্ত্তব্য ও স্নেহসেবায় পূর্ণ কল্যাণ হস্তঘেরা গৃহস্থালী! বাল্যের সেই স্মৃতি, তাহার পরে যৌবনের সেই কাব্যসাহিত্য অধ্যয়ন হইতে ক্রমে বেদশাস্ত্রাদি পাঠ, গৃহবাসে অনিচ্ছা। দ্বাদশ বৎসরব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান, পরে এই সন্ন্যাস, সেও আজি চারি পাঁচ বৎসরের কথা। হায় এত দিনের এই গৃহত্যাগের পর সেই "গৃহ", অদ্য কোথা হইতে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল!—

পার্ব্বতী গুহার চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল,—নিজ মনে বলিল, "আপনার আসন কমণ্ডলু আবার এই গুহাতে আনিয়াছেন, দেখিতেছি!

উপরের গুহায় লইয়া যান্—নহিলে আমি কোথায় থাকিব ?” সন্ন্যাসী কোন উত্তর দিলেন না। আহারান্তে তিনি গুহার বাহিরে আসিয়া শিলাতলে বসিলেন। বৃক্ষ শাখার ব্যবচ্ছেদ পথে শুভ্র জ্যোৎস্না আসিয়া শিলার কৃষ্ণ কর্কশ গাত্রে মায়ার অপূর্ব্ব মোহ জাল বিস্তার করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে পার্ব্বতী ভোজনান্তে বাহিরে আসিয়া বলিল, “তবে আমি এই গুহার মধ্যেই থাকি ? আপনি উপরের গুহায় যান্!”

“যাইতেছি। তুমি শ্রান্ত আছ, শোও গিয়া। কোন ভয় নাই।” “ভয় ?”—অবজ্ঞার হাসির সহিত মস্তক নাড়িয়া পার্ব্বতী গুহার মধ্যে চলিয়া গেল। সন্ন্যাসী বুঝিলেন, তাহাকে ভয়ের কথা বলাই নির্বুদ্ধিতা। যে বালিকা সেই সুদূর উড়িষ্যার শেষ প্রান্ত হইতে একা অসহায় অবস্থায় এতদূরে আসিতে পারিয়াছে, সেই বালিকার অসাধারণ শক্তির কথা মনে করিতে গিয়াই সন্ন্যাসী যেন শিহরিয়া উঠিলেন। এই অসামান্যা নারীর অদম্য প্রভাব রোধ করা বুঝি সাধারণ শক্তির কার্য্য নয়। তাঁহার সেই বিংশবর্ষ হইতে অনুষ্ঠেয় ব্রহ্মচর্য্য এত যোড়শবর্ষে কি এত খানি শক্তি লাভ করিয়াছে, যাহাতে এই সৌন্দর্য্যাগ্নতেজ-মধ্যস্থা শক্তিময়ী ষোড়শীর প্রভাব খর্ব্ব করিতে পারে ? সেই ছদ্মবেশী কিশোরের প্রতি তাঁহার অনন্যসাধারণ আকর্ষণেই তাহার তো পরাক্ষা হইয়া গিয়াছে। আজ যেন সেই অকারণ উদ্ভূত অদ্ভূত স্নেহের তিনি প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তাহার এই দুর্দ্দম প্রতাপের কারণও বুঝিতে পারিলেন।

পলাইতেই হইবে। না পলাইয়া উপায় নাই। কিন্তু বালিকার কি গতি হইবে ? সে হয়ত তাহার সম্ভাবিত সুখাশ্রয় ত্যাগ করিয়াই আসিয়াছে! চিন্তা আর অধিক দূর অগ্রসর হইল না। গুহামধ্যে হইতে সেই পদশব্দ। তেমনি করিয়া পা ফেলিতে ফেলিতে পার্ব্বতী বাহিরে আসিল। “গুহা মধ্যে বড় গরম। খোলা আকাশের তলায় থাকিয়া স্বভাব মন্দ হইয়া গিয়াছে।”—বলিয়া পার্ব্বতী সেই গুহাদ্বারে শুইয়া পড়িল, তাহার রুক্ষ কেশ রাশি শৈবালের মত চারিদিক আঁধার করিয়া ছড়াইয়া পড়িয়া মধ্যস্থলে সুপ্ত পদ্মের মত মুখখানিকে ধরিয়া রহিল। সন্ন্যাসী চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন, “পার্ব্বতী! তোমার পিতা কি তোমার বিবাহের স্থির করেন নাই ?”

পার্ব্বতী একটু নড়িয়া চড়িয়া চোখ বুজিয়াই উত্তর দিল, “আঃ আপনি এখনো তাহাই ভাবিতেছেন ?—করিয়াছিলেন।”

“কাহার সহিত।”

"যাহাকে আমার ভার দিয়াছিলেন, তাহার সহিত।"

"তুমি এইরূপে পলাইয়া আসায় ব্যথিত হইয়া. সে হয়ত তোমায় কত খুঁজিতেছে!" "তাহাতে আমার কি।" পার্ব্বতী পাশ ফিরিয়া শুইল, এবং দেখিতে দেখিতে গভীর ভাবে ঘুমাইয়া পড়িল।

এত নিকটে, এত নিকটে সে। সে অর্দ্ধস্ফুট চন্দ্রালোকে কঠিন শিলার বক্ষে হয়ত জগতের কত প্রার্থী হৃদয়ে অমূল্যরত্ন। সন্ন্যাসীর নিঃশ্বাস যেন বুকের মধ্যে বাধিয়া যাইতেছিল। আপনার সেই প্রথম যৌবনে পাঠদ্দশায় সদা জাগ্রত কামনার স্মৃতি মনে পড়িতেছিল। যাহাদের বর্ণনায় কবি তাহার সমস্ত কল্পনা-ভাণ্ডার উজাড় করিয়া বিশ্বের সম্মুখে ঢালিয়া দিয়াছেন, কবি-কল্পনার সেই জীবন্ত প্রতিমা মেঘদূতের যক্ষপত্নী, রঘুবংশের ইন্দুমতী, শকুন্তলা, কুমারসম্ভবের পার্ব্বতী, অদ্য যেন এই প্রস্তর বক্ষে অনাদরে অপমানে লুণ্ঠিতা হইতেছে।

ঘুমের ঘোরে পার্ব্বতী আবার পাশ ফিরিল, চুলগুলি মুখখানিকে একেবার ঢাকিয়া ফেলায় হয়ত কষ্ট হইতেছে! বৃদ্ধের অতি আদরের গর্ব্বের সেই ভ্রমর-নিন্দিত কেশগুলি অযত্নে এমন জটা বাঁধিয়া গিয়াছে! সন্ন্যাসী চমকিয়া উঠিলেন। চুলগুলি সযত্নে সরাইয়া দিতে, একটু গুছাইয়া রাখিতে মন যেন বিদ্রোহ করিয়াও অগ্রসর হইতে চায়!

সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বালিকার ভাগ্যে যাহা হয় হউক, তাঁহাকে যাইতেই হইবে। "জিতং জগৎ কেন? মনোতি যেন।" এ জগৎজয়ী "শূর" তাঁহাকে হইতেই হইবে।

॥ ৪ ॥

পাঁচ ক্রোশ পথ অতিবাহনান্তে বর্ষা-বারিপূর্ণা খরস্রোতা "যমুনা জোড়্"কে একটা কাষ্ঠের ভেলায় অতিক্রম করিয়া সন্ন্যাসী দেওঘরের পশ্চিম বনভূমে পৌঁছিলেন, এবং নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পশ্চাতে চাহিলেন। পূর্ব্বে ত্রিকূটের তিনটি চূড়া মাত্র জাগিয়া আছে. বাকী সমস্ত দেহটা দূরত্ব হেতু লুপ্তদর্শন। নদীতীরস্থ বনের গভীরতা এবং নদীস্রোতের দুরন্ততায় সন্ন্যাসী কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া রৌদ্রতপ্ত শ্রান্ত দেহকে সেই বনমধ্যে লুক্কায়িত করিলেন, একটু অনুসন্ধানের পর কয়েকটা প্রস্তরখণ্ড মিমিত এমন একটু স্থান পাইলেন, যেখানে রৌদ্রবৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবেন এবং বনের ব্যবচ্ছেদ পথে নদীতীর ও ত্রিকূট-শিখর বেশ দেখা যাইবে। সন্ন্যাসী দিন কতক ঐ স্থানেই আশ্রয় লইতে ইচ্ছুক হইয়া

বনের ফল ও নদীর জল পানান্তে নিরাপদে রাত্রি যাপনের জন্যে শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিলেন। এরূপ স্থানে যে হিংস্র জন্তুর আশঙ্কা আছে তাহা তিনি বেশ জানিতেন।

রাত্র আসিল, কিন্তু অগ্নি জ্বালিতে যে ভয় হইতেছে। যদি ঐ আলোক-ছটা দেখিয়া কোথা হইতে সে এখানেও আসিয়া পড়ে। তাহা হইলে বুঝি আর তাঁহাব রক্ষা নাই। কিন্তু এই কি তাঁহার মনোজয়? তাহাকে ত্যাগ করিয়া আসিযাছেন বটে কিন্তু ঐ ত্রিকূট-শিখর কয়টি দেখিবার বাসনা ত কই তিনি ত্যাগ করিতে পারিলেন না। হায়! সেকি দুরন্ত অনির্ব্বাণ ধূনীই জ্বালিয়া দিয়াছে।

হিংস্র শ্বাপদের আশঙ্কায় অগত্যা কতক রাত্রে অগ্নি জ্বালিয়া সন্ন্যাসী বসিযা রহিলেন। প্রত্যেক শব্দে, প্রত্যেক পত্র কম্পনে "ঐ সে আসিতেছে" ভাবিতে ভাবিতেই রাত্রি কাটিয়া গেল, সে আসিল না, সন্ন্যাসীর ভয় একটু কমিল। এত নিকটে তিনি আছেন, তাহা সে আন্দাজ না করিতেও পারে, সন্ন্যাসী এইরূপে নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন দেখিয়া অভিমানিনী সে-ত্রিকূট ছাড়িয়া পুরী অথবা নিজদেশ অভিমুখে চলিযা যাইতেও পারে। কিন্তু তাহা যদি সে না যায় তাহার দুরন্তপণ ও দুর্দ্দম প্রকৃতিবশে যদি সে ঐ পর্ব্বতেই পড়িয়া থাকে? তাহা হইলে কি হইবে? ত্রিকূট-শিখর দিকে চাহিয়া এরূপ চিন্তা করিতে করিতেই সন্ন্যাসীর প্রভাত অতিবাহিত হইয়া গেল। সহসা পশ্চিমে চাহিয়া দেখিলেন, দিগন্ত অন্ধকার করিয়া দিগ্‌ডৌয়া পাহাড়ের উপর যেন একদল কৃষ্ণহস্তী যুথবদ্ধ হইতেছে। তাহাদের বপ্রক্রীড়ায় পর্ব্বতের শ্যাম অঙ্গে মুহুর্মুহুঃ উদ্ভাসিত। ক্রমে সেই গগনহস্তিদল বায়ুবেগে দিকে দিকে চালিত হইযা ত্রিকূট, দিগ্‌ডৌয়া প্রভৃতি পর্ব্বতগুলির মধ্যস্থিত প্রকাণ্ড আকাশের তলায় যেন একখানি কৃষ্ণবস্ত্র মেলিয়া ধরিল। তাহাদের গম্ভীর বৃংহিতের সঙ্গে "হু হু" "বোঁ বোঁ" রবে বায়ুও যোগ দিয়া শিলাকোটর মধ্যগত সন্ন্যাসীর কর্ণে যেন একটা ঘোর উন্মত্ত হাহা-কারের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। মেঘ দেখিয়া এতক্ষণ তিনি একদৃষ্টে ত্রিকূট পানে চাহিয়া ভাবিতেছিলেন, যদি সে ওখানে থাকে, তাহার কি ভয় হইতেছে! কিসের ভয়! এই ত একটা বস্ত্রখণ্ডের নিম্নেই উভয়ে রহিয়াছেন! মেঘের এই অপরূপ চন্দ্রাতপ রচনায় তাঁহার মনেও যেন একটা সুখের বিদ্যুৎ খেলিতেছিল। মেঘের মধ্যে বজ্র দুরু দুরু কাঁপিয়া বলিতেছিল, 'ভয় নাই, আমি এই নিকটেই রহিয়াছি।" কিন্তু এখন বায়ুর সেই শব্দে তাঁহার মন অশান্ত হইয়া উঠিল,

যেন মনে হইতেছিল নদীতীরে কে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। ইহা যে, তাঁহার মনের ভ্রম মাত্র, তাহা বুঝিয়াও মন শান্ত হইতে চাহিল না।

বায়ু ব্যর্থরোষে বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়াও মেঘকে স্থানভ্রষ্ট করিতে পারিল না! বিরাট্ সমারোহে বৃষ্টি নামিয়া আসিল। অন্ধকারকে মুহুর্মুহুঃ শব্দময় করিয়া তড়িন্ময় ধারা বর্ষণে বনভূমিকে শোণিতরক্ত গৈরিকবারিতে প্লাবিত করিয়া তুলিল! ভূমির সেই শোণিতময় স্রোত, উচ্চভূমি হইতে শিলাবক্ষে প্রতিহত কলকল্লোল শব্দের সঙ্গে ফেনপুঞ্জ অঙ্গে মাখিয়া নিম্ন 'খাদে' পতিত হইতে লাগিল এবং খাদ্ উপ্চাইয়া আবার নদীবক্ষে গিয়া পড়িতে লাগিল। জল-জল-জল! আকাশ হইতে ধারার পর ধার। অশ্রান্ত ভাবে নামিয়া, ধরণীকে ডুবাইয়া ভাসাইয়া, শুধু অনিবার জলস্রোত নিম্নভূমিতে গিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে।

সন্ধ্যা; বৃষ্টি তখন থামিয়া গিয়া মাঝে মাঝে এক আধ ফোঁটা পড়িতেছে মাত্র। জলস্থলশূন্য সর্ব্বত্র সমান অন্ধকার কেবল এক একবার বিদ্যুৎ বিকাশ ও মেঘের স্বননে পৃথিবীর অস্তিত্ব জানা যাইতেছে। বায়ু স্তব্ধ—নদী শোণিত জলপূর্ণা বৈতরণী, ক্ষিপ্রবেগশালিনী। সন্ন্যাসী শিলাকোটর-সঞ্চিত শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি-সংযোগ করিলেন। আলোক জ্বালিয়া কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকার পরে সহসা একটা বিদ্যুৎ-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দৃষ্টি নদীর অপর তীরে পতিত হইল! চকিতে তিনি দেখিলেন, নদীতীরে কে যেন ছুটিয়া আসিতেছে! ভ্রম কি? কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই অন্য একটা বিদ্যুতের আলোকে বুঝিলেন—এবারে এ ভ্রম নয়। সত্যই কেহ নদীতীরে আসিয়াছে। এমন সময়ে এমন স্থানে সে ভিন্ন আর কে হইতে পারে? সেই নিশ্চয়! এই আলোকাকৃষ্টা হইয়া হয়ত এখনি এখানে আসিবে। সন্ন্যাসী সভয়ে ত্রস্তে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে নিবাইয়া ফেলিলেন। পরক্ষণেই মনে হইল, এ ভয় তাঁহার নিরর্থক। সম্মুখে এই তরণীহীনা ক্ষুরধারা নদী—কাহার সাধ্য এ সময়ে ইহার জল স্পর্শ করে। অতি সুরক্ষিত দুর্গেই তিনি বসিয়া আছেন। এই দুরন্ত নদীই তাঁহার অমিহন্ত্রী প্রহরিণী।

নদীর অপরতীরে সহসা ও কি শব্দ? হাঁ সেই ত'! তাহারই এ কণ্ঠস্বর! এ ত সেইই—উচ্চ আর্ত্তকণ্ঠে কি বলিতেছে! ভাষা ভাল বোঝা গেল না, কিন্তু 'আলোক' এইরূপ একটা শব্দ পুনঃপুনঃ সন্ন্যাসীর কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসীর মনে হইল, সে যেন বলিতেছে—"আলোক জাল, ওগো, জাল আলোক আবার! কেন নিবাইলে? কোথায় কোন্ দিকে তুমি—আমায় আর একবার

বুঝিতে দাও। আবার একবার আলোক জ্বাল।"

আবার বিদ্যুৎ বিকাশ! ঐ ত' নদীতীরে সেইই দাঁড়াইয়া! আবার সেই আর্ত্তকণ্ঠস্বর, কিন্তু সেই আলোক শব্দটি ব্যতীত অন্যভাষা কিছুই স্পষ্ট হইতেছে না। আবার সন্ন্যাসীর মনে হইল, যেন সে চীৎকার করিয়া সেই কথাই বলিতেছে;—

"আলোক দেখাও, বুঝিতে দাও তুমি ঐখানেই আছ। আবার যদি পলাও, আমি এখনি গিয়া তোমায় ধরিব। আলোক দেখাও একবার—।"

সন্ন্যাসী নিশ্চেষ্ট, ক্রমে যেন অঙ্গস্পন্দনশক্তি রহিত হইয়া পড়িতেছিলেন, চক্ষুও যেন বুজিয়া আসিতেছে। মন, কেবল এক একবার গর্ব্বাগ্নির শেষ স্ফুলিঙ্গ উদ্রিক্ত করিয়া মাথা নাড়িতেছিল,—"না—আলো জ্বালা হইবে না। জয়ী হইতেই হইবে।" কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে আর একজন কে বলিতেছিল, "এখনও তোমার জয়ী হইবার সাধ? তোমার এই সুপ্ত বাসনাযুক্ত স্নেহপ্রেমের প্রতিঘাত-স্পন্দনময় হৃদয় লইয়া যৌবনের উত্তেজক খেয়ালে নানা-শাস্ত্র আলোচনার ফলে ঝোঁকের বশে তুমি যে এই কৃত্রিম সন্ন্যাসপন্থা লইয়াছিলে —ইহাতে সেই মহাসন্ন্যাসী মহাযোগীও প্রতারিত হন নাই। তিনি তোমার হৃদয় বুঝিয়াই সেই আড়াই বৎসর পূর্ব্বে একদিন এই লোকদুর্লভ নির্ম্মাল্যটি যেন স্বেচ্ছায় আশীর্ব্বাদ স্বরূপেই তোমায় দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, ভোগ নহিলে তোমার দুর্ব্বল মনে এই সাধনার উপযোগী বল সঞ্চিত হইবে না। যাহা দিলাম, মস্তকে ধারণ করিয়া তোমার অত্যন্ত ক্ষুধিত তৃষিত আত্মাকে অগ্রে স্নেহ-প্রেম-ভোগে তৃপ্ত করিয়া লও। দম্ভ ত্যাগ কর, দম্ভ লইয়া আমার নিকটে কেহ আসিতে পারে না। আত্মসমর্পণশীল বিনতশির না হইলে আমার নিকটে আসিবার উপায় নাই।"

দর্পোন্নত মস্তক তাঁহার সে করুণা মস্তক পাতিয়া লয় নাই; বাসনার দ্বারা প্রতিনিয়ত নির্জ্জিত হইয়াও পরাজয়ের অপমান স্বীকার করে নাই। সন্ন্যাসী বুঝিতে পারিতেছিলেন, সেই বাসনাই এখন প্রবল অগ্নি-স্রোতের ন্যায় তাঁহার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আর পলাইবার উপায় নাই; এ অগ্নিতে তাঁহাকে ভস্ম হইতেই হইবে। ঐ যে জলস্থল, বনপর্ব্বত একযোগে চীৎকার করিয়া বলিতেছে,—"অনল জ্বাল, তোমায় এ আগুনে পুড়িতেই হইবে।" তীর হইতে পুনর্ব্বার যেন শব্দ আসিল, "আলোক জ্বালিলে না?—পলাইতেছ? কোথায় পলাইবে? আমি এখনি গিয়া তোমায় ধরিব।"

বিমূঢ়ের ন্যায় সন্ন্যাসী নির্ব্বাপিত অগ্নিকে পুনঃ প্রজ্বলিত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কম্পিত হস্তের কার্য্য শীঘ্র সমাধা হয় না। সহসা একটা অস্ফুট-প্রকারের শব্দ তাঁহার কর্ণে গেল ;—যেন জলের প্রবল আস্ফালন শব্দ। সে কি এই নদীগর্ভে—এই অলঙ্ঘ্য নদীস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িল? সন্ন্যাসীর হস্ত এবারে একেবারে যেন অবশ হইয়া আসিল। নদীগর্ভ হইতে আবার সেইরূপ অস্পষ্ট চীৎকার—"এখনো একবার আলোক দেখাইয়া বুঝিতে দাও, কোন্ খানে তুমি আছ,—জ্বাল একবার আলোক।" বনতল সমস্বরে চীৎকার করিল—"আলোক, আলোক, আলোক!"

পশ্চিমে ওকি ভৈরব গর্জ্জন? জলে ওকি উন্মত্ত কল্লোল শব্দ? পর্ব্বত হইতে 'বুহা' নামিয়া, 'যমুনা-জোড়'-বক্ষে 'বানের' ন্যায় প্রমত্ত স্রোতে ছুটিয়া আসিতেছে। সন্ন্যাসী ক্ষিপ্রহস্তে দাহ্য কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিয়া প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠহস্তে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া বাহির হইলেন।

প্রমত্ত নদী-বুহা-জল বেগে স্ফীত হইয়া, উভয় তীরের উন্নত ভূমি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া ঘোর রোলে ছুটিয়া চলিয়াছে। সেই কাষ্ঠদণ্ডস্থ আলোক রেখা সম্পাতে সেই ফুটন্ত রক্ত ধারার মত জল যেন ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া ঘোর অন্ধকারের দিকে নিঃশব্দে ছুটিতেছে। কে কোথায়! কে আলোক দেখিবে? কে আলোক চাহিতেছিল,—কোথায় সে? সন্ন্যাসী আলোক দণ্ড হস্তে সেই রক্ত-স্রোতের মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন।

এই ত উত্তাল নদী-তরঙ্গ! এই ত তাহার অনুত্তরণীয় বেগ। ইহার মধ্যেও আলোক হস্তে তোমায় খুঁজিতেছি, এই আলোকে একবার তোমায় দেখিতে চাই! যে আলোক তুমি জ্বালাইয়াছ, তাহারই কিরণে একবার উভয়ে উভয়কে খুঁজিয়া লইতে দাও, খুঁজিয়া পাইতে দাও। কোথায় তুমি লুকাইবে, কোথায় পলাইবে? এই চির-প্রজ্জ্বলিত অনির্ব্বাণ—আলোকের সম্মুখে একদিন আবার তোমায় পড়িতেই হইবে। এ আলোকে উভয়ের উভয়কে এক দিন খুঁজিয়া পাইতেই হইবে যে!

ধুধু ধুধু! লুপ্ত জল-ধারা, শুষ্ক নদীবক্ষ অফুরন্ত বালুকার রাশি! শুষ্ক রুক্ষ ভূমির প্রকোষ্ঠপঞ্জরাস্থি কেবল চাহিয়া আছে। শূন্যে অলক্ষ্যে কাল-স্রোত-মাত্র নিঃশব্দে বহিয়া চলিয়াছে।

পূর্ব্বে ত্রিকূট ও পশ্চিমে দিগড়ীয়ার অস্পষ্ট ছবি, মাঝখানের অবাধ আকাশে অন্ধকারে অসংখ্য তারকা ফুটিয়া উঠিয়াছে। জ্বলিতেছে! সেই শুষ্ক নদীতীরেও

ও সেই অনির্ব্বাণ ধূনী জ্বলিতেছে এবং সেই জ্বলন্ত আলোক চলন্ত ভাবে ইতস্ততঃ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে—"কোথায়, ওগো কোথায় তুমি।"

গল্প থামিয়া গেলেও কিছুক্ষণ আমরা স্তব্ধভাবে সেইখানেই বসিয়া রহিলাম। একজন কেবল একবার নদীতীর পানে চাহিয়া দেখিয়া, অস্ফুট স্বরে বলিল, "হাঁ, এখনও সমান ভাবেই জ্বলছে!"



চোর

মাধুরীলতা

সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়—কলুর ছেলে, বাপ-দাদার মত ঘানি ঠেলে খাব তা না, ইস্কুলের মাষ্টার মশাই পাঁচুদা বাবার মাথায় কি খেয়াল ঢুকিয়ে দিলেন, সে একেবারে পণ করে বস্‌ল ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে ভদ্দর লোক করবে। তা বেশ! ভদ্দর লোকের ছেলেরা লাঙ্গল ধরতে শিখুক আর চাষাভুষোর ছেলেগুলো কানে কলম গুঁজুক—সব উল্টো না হলে আর কলিকাল বলবে কেন! একেবারে একটানা গোরুর ল্যাজ মলতে মলতে বাবার মেজাজ হয়েচে একরোখা। ভদ্দর লোক হতে হবে যখন একবার তার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে তখন মেরে-পিটে ভদ্দর না করে আমাকে ছাড়বে না।

মাষ্টার মশাই বিপদটি ঘটালেন; কিন্তু লোকটি খাসা, একেবারে সদাশিব। তাঁর হাতে আমাকে সঁপে দিয়ে বাবা ভাবলে ছেলের জন্যে আর ভাবতে হবে না, বিদ্যের সাগর লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে ছেলেটা সংসারে একটা বিপরীত লঙ্কাকাণ্ড করে বসবে। যতক্ষণ বাড়ী থাকতুম বাবা একদিকে গোরুকে ঠেলা দিত, একদিকে আমাকে! বই হাতে করে চেঁচিয়ে পড়তে হত। ঘানির ক্যাঁচক্যাঁচিনির সঙ্গে সুর মিলিয়ে দুই গালে হাত দিয়ে কনুই দুটো দুই হাঁটুর উপর রেখে পিঁড়িতে বসে কপালে চোখ তুলে দুলতে দুলতে সুর করে চেঁচাতুম "কয় আকার ক—কাক", "দুই একে দুই, দু দুগুণে চার।" গোরুগুলো ভাবত ছোঁড়াটা আমাদের চেয়েও অধম, ঘানিও ঠেলে না, তেলও বের করে না, শুধু শুধু চেঁচিয়ে মরে। তার উপরে চোখে ঠুলির আরামটুকুও আমার ছিল না—বইয়ের পাতার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে হত।

বহুতর কানমলার ভিতর দিয়ে যখন কথামালায় পৌঁছলুম, বাবা আর থাকতে পারল না, সহর থেকে একসঙ্গে একজোড়া জুতো আর একটা ছাতা কিনে আমাকে ভদ্দর-আনার পয়লা ধাপে চড়িয়ে দিল। সেই থেকে আমার বইয়ের বোঝা যত বাড়তে লাগল সঙ্গে সঙ্গে বাবুয়ানার আসবাবও বাবা যোগাতে লাগল।

দশ বছর বয়সে একটি চার বছরের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হল। মা ছিল না, দেখবার কেউ নেই বলে বাবা অনেক দিন বউ ঘরে আনেনি। আমাকে মাঝে মাঝে শ্বশুর-বাড়ী পাঠাত বটে কিন্তু সেখানে স্ত্রীর ঠাকুমার সঙ্গেই আমার আসর জমত, সুতরাং স্ত্রী যে কি বস্তু তখন পর্য্যন্ত মালুম করিনি।

যে বছর ছাত্রবৃত্তি দেব একদিন হাট-বারে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে হাট থেকে ফিরে এসেই বাবার খুব চেপে জ্বর এল। রাত্রে আমাকে বল্লে, "ওরে ন্যাপলা! বৌমাকে আনতে পাঠা, তাকে অনেকদিন আনা হয়নি।" বৌ এল, কিন্তু তার সেবা বাবা বেশিদিন ভোগ করল না, ভাদ্র মাসের দিনসাতেক থাকতেই সংসার থেকে বিদায় নিল। দিনকতক এমন হল, বাড়ীতে ঢুকতেই প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত। দাওয়ার উপর সেই তার পীঁড়েখানি, দেওয়ালের গায়ে পেরেকে ঝোলানো ছেঁড়া ছাতা, দরজার পাশে হুঁকোটি, সব ঠিক আছে, কেবল নেই আমার বাবা। ছেলেবেলা থেকে মাকে পাইনি, বাবার কোলেই মায়ের কোল পাতা ছিল। একটি দিনের তরেও মনে পড়ে না যে বাবা কখনো গায়ে হাত তুলেছে।

বানি ত ছেড়েইচি তার পরে আবার বই ছেড়ে এবার বৌ নিয়ে পড়লুম পরিবারটি আমার নেহাৎ নিন্দের ছিল না, কিন্তু কি বলব, দেহে তার রাগটা বড় বেশি। তের বছর তার সঙ্গে ঘর করেছি তবু বেঁচে আছি,—মানুষের প্রাণ এতই কঠিন! সে যখন রাগত পোষা কুকুরটার ল্যাজটা তার পেটের সঙ্গে সমান হয়ে যেত, আমার ল্যাজ নেই কিন্তু সমস্ত দেহটাকেই ঐ ল্যাজের মত গুটিয়ে ফেলবার ইচ্ছে হত।

মেয়েটাকে যখন জন্ম দিলে ভাবলুম এইবারে রাগের ঝাঁজ কিছু মরবে। উল্টো হল, আগে একজনের উপর রাগ ফলাত এখন আরেকটাকে পেলে। ফুলি চার বছরেরটি হলে তাকে এমনি বেদম মার আরম্ভ করল যে, সে আমি দেখতে না পেরে বাইরে বেরিয়ে পড়তুম। বল্লে বিশ্বাস করবে না, অসহ্য হয়ে দুই একবার তাকে মেরেওচি—কিন্তু সে মার শেষকালে গিয়ে পড়ত আমার ফুলুর পিঠেই,

তাতে তার দুঃখের হিসেব বেড়েই চলত।

কিন্তু আমার ফুলরাণীর কি সহ্যগুণই ছিল! তার একটি-মাথা ভোমরার মত কালো কুচকুচে কোঁকড়া কোঁকড়া চুল ছিল, সে চুল মুঠো করে ধরে তার মা যখন দেওয়ালে মাথা ঠুকে দিত, ওগো, তখন যে আমি উন্মাদ হয়ে যাইনি, সেইটেই আমার জীবনের সব চেয়ে আশ্চর্য্য! বলিনি, তার কি সহ্যগুণই ছিল? চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে, আর আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলচে, "বাবা তুই ভয় পাস্‌নে বাবা। আমার কিছু লাগেনি। আমি তো লাগে বলে কাঁদিনে, মা আর মারবে না, ছেড়ে দেবে বলে কাঁদি।" সেই একরত্তি দুধের মেয়ে, তার সে সব কথা মনে হলে বুক ফেটে যায়।

আবার এদিকে ফুলুর মা তাকে যত্ন করতে কসুর করত না। সাজিমাটি দিয়ে তার কাপড় কেচে একেবারে ধবধবে করে রাখত; সে যা যা খেতে ভালোবাসত নিজের হাতে তৈরি করে রেখে দিত। ফুলি কোনো জিনিষের জন্যে আবদার ধরলে সে যেমন-করে-হোক সাত কোশ তফাতে হেঁটে গিয়েও তাকে জুগিয়ে এনে দিত। কে জানে বাপু মেয়ে মানুষের মন, যার জন্যে কোনো কষ্টকে কষ্ট বলে গায়ে মাখত না, বুঝি না তাকে আবার কোন্ প্রাণে ধরে ধরে ঠেঙাত!

এই সময় ফুলির রোজ ঘুস্‌ঘুসে জ্বর আসতে লাগল—বোধকরি কোন রকম ঠাণ্ডা লেগেছিল। সেই জ্বরে একেবারে মাকে ত্যাগ করল। মার কাছে শোবে না, মার হাতে ওষুধ খাবে না, আমি ঘরে না থাকলে এক ফোঁটা জলও মার হাত থেকে নেবে না।

সেদিন ফুলির জ্বরটা বেড়েছিল। পিদীম জ্বেলে দিয়ে বৌ পথ্যি তৈরী করতে গেল। আমি ফুলুকে গল্প বলে ভোলাবার চেষ্টা করছিলুম। খানিকক্ষণ চুপটি করে থেকে আমাকে ডাকল, "বাবা!"

"কেন রে?"

"আমার নাম ফুলরাণী হল কেন সেই গল্প বল্।"

"বলছি। আমাদের উঠানে তোর ঠাকুর্দ্দা অনেক ফুলগাছ লাগিয়েছিল। তুই যখন হলি, সবগাছে তখন ফুল ধরেছিল। একদিন তোর মা একখানা কাঁথা পেড়ে সেখানে তোকে শুইয়ে রেখে কি করতে ঘরে গেল। আমি চেয়ে চেয়ে দেখি যত ফুল ফুটেছে সব চেয়ে আমার ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটি সেরা, তাই তোর নাম দিলুম ফুলরাণী।"

"দেখ্ বাবা, আজো ঠিক তেমনি ফুল ফুটেছে।" চিরদিনের মত ফুলুর কথা বন্ধ হল, আমার কাঁধে তার মাথাটি লুটিয়ে পড়ল। কতক্ষণ এমনি করে তাকে নিয়ে বসে রইলুম জানি না। কোন্ সময় তাকে বিছানায় শুইয়ে রান্নাঘরে ছুটে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম—

"ওরে সয়তানী, আর আমার ফুলরাণীর চুলের মুঠি তুই ধরতে পারবিনে রে! সে তোর কাছ থেকে পালিয়ে গেছে।"

কথাটা কিছু কড়া হল। তখন কি আমার জ্ঞান ছিল? কিন্তু সে দিন থেকে তার মুখে আর রা ছিল না। যখন তার মাথায় রাগ চাপত সে দুই হাতে নিজেকে ধরে ঝাঁকানি দিত, তাতেও ঠাণ্ডা না হলে কবাটে মাথা কুটে রক্তপাত করে ছাড়ত।

এই রকম কোনোমতে দিন কাটতে লাগল। একদিন আমরা দুজনে পথের ধারের ভাঙা বেড়াটা সারছি দেখি একটি ছোট মেয়ের চুল ধরে টানতে টানতে এক মাগী রাস্তা দিয়ে হন হন করে গালাগাল দিতে দিতে চলেছে, আর মেয়েটা, "ওমা, আর মারিস্ না রে মা, আর মারিস্ না রে!" বলে ফুকরে ফুকরে কাঁদছে, আর থেকে থেকে তার মার হাঁটু জড়িয়ে জড়িয়ে ধরছে। আমার স্ত্রী সেই শুনে পাগলের মত ছুটে চলে গেল, পরের দিন রায়েদের পুকুরে তার দেহ ভেসে উঠল।

আমি শুধু বাকী রইলুম। আমি ঘরের জীব, ঘরটি আমার ভেঙে গিয়ে আমাকে ভাসিয়ে দিল। সারাদিন বাইরে বাইরে কাজ করি কিন্তু কার জন্যে এত খাটছি যখন চেতন হয় সমস্ত শরীর মন ভেঙে পড়ে।

একদিন পাঁচুদাদা বল্লেন, "ভ্যাথ ক্ষ্যাপলা! তোকে এত বলি তবুও তুই দ্বিতীয় সংসার করবি নে। এক কাজ কর। তোর ফুলির মত একটি ছোট মেয়ে নিয়ে মানুষ কর, মনে করিস্ তোর ফুলিই ফিরে এসেছে।"

এ ত মন্দ কথা নয়।

মেয়ের খোঁজে ফিরতে লাগলুম। নিজের জাতের মধ্যে কাউকে পেলুম না যে মেয়ে বিলিয়ে দিতে চায়। শেষে অনেক খোঁজ করে একটি মেয়ে পেলুম।

সে বোবা আর কালা। নইলে মেয়ে দেবে কেন?

তার মাথাভরা কালো কোঁকড়া চুল দেখেই আমি তাকে কোলে তুলে একেবারে বাড়ী নিয়ে এলুম। এরও নাম দিলুম ফুলরাণী। সে ত কেবল মানুষের মত নয়, অবোলা জন্তুর মত আমার পোষ মান্‌লে—যেখানে যাই সঙ্গে সঙ্গে

ফিরত, এক মুহূর্ত্ত আমাকে ছেড়ে থাকতে চাইত না। সে কখন আপনা-আপনি আমার ঘরের কাজ বাগানের কাজ শিখে নিল, দিনের মধ্যে কখনো তার হাত কামাই যেত না।

এ মেয়েকে ত কেউ বিয়ে করবে না, মনে করলুম ভালোই হল, কোনদিন কেঁদে আমার ঘর থেকে ওকে বিদায় করতে হবে না। কিন্তু পাঁচুদাদা আমার মনের মধ্যে বড় একটা ধোঁকা লাগিয়ে দিলে। সে বললে, মানুষের প্রাণ পাখী, কখন আছে কখন নেই। তুই যদি খামখা মারা যাস্ তা হলে ও মেয়ের গতি হবে কি ?

সে ত ঠিক কথা, এই যে গদাই এত বড় জোয়ান, আমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট, তিন দিনের জ্বরে মারা পড়ল। কখন কি হয় বলা যায় কি ! আমার অভাবে ঐ বোবা কালা মেয়ের দিকে ত কেউ ফিরে তাকাবে না। তাকে বল্লেম, পাঁচু দাদা, একটা পরামর্শ দাও !

পাঁচু দাদা বল্লে, কলকাতায় বোবা-কালাদের শেখাবার জন্যে ভালো ইস্কুল আছে। তুই ফুলিকে সেই ইস্কুলে ভর্তি করে দে ; সেখানে ওকে লিখতে পড়তে শেখাবে, আর এমন হাতের কাজ শিখিয়ে দেবে যে, ও নিজের গুজরান নিজেই চালাতে পারবে !

মন ঠিক করতে অনেকদিন লাগল। কাছের ধনকে কিছুতেই কাছে রাখতে পারিনে এমনি আমার কপালের লিখন ! দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বল্লেম, আচ্ছা, কলকাতাতেই পাঠিয়ে দেব। ও যদি আমার সেই ফুলিই হত তাহলে এতদিনে ত ওকে শ্বশুরবাড়ী ঘর করতে যেতে হত !

আমাকে ছেড়ে যেতে হবে বলে মেয়েটা ত ক'দিন ধরে আমার সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে কেঁদে ফিরতে লাগল। বোবার কান্না বড় দুঃখের কান্না, সে কিছুতেই সহ্য করতে পারা যায় না—কিন্তু সেও আমি সইলুম। একদিন পাঁচুদাদাকে সঙ্গে করে নিয়ে আমার ফুলুকে কলকাতার ইস্কুলে দিয়ে এলুম। চলে আসবার সময় সে আমার চাদর চেপে ধরে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তখন আমার চোখের জল আর কিছুতেই থামতে চায় না। পাঁচুদাদা যদি না থাকত তাহলে তখনি মেয়েটিকে ফিরিয়ে আনতুম।

আবার আমার ঘর খালি ! কিন্তু এবারকার এ ফাঁকাটা সে ফাঁকের মত নয়। এ ফাঁক আবার এক দিন ভরে উঠবে। কিন্তু দিন ত কাটাতে হবে। ফুলুকে মনে করে তার জন্যে একটি শান-বাঁধানো ঘর বানালুম। সেই ঘর

সাজিয়ে তোলা আমার এক কাজ হল। আমার স্ত্রী থাকতে আমার যে সব হাঁড়িকুঁড়ি বাসনকোসন ছিল, এতদিন তার কোন আদর ছিল না। সেগুলি আমি মেজে-ঘষে মেরামত করে তক্‌তকে করে গুছিয়ে রেখে দিতে লাগলুম। আমার স্ত্রীর গয়না একটা হাঁড়ির মধ্যে ঘরে মেজের নীচে পোঁতা ছিল। সে আর-একবার আমি খুঁড়ে তুলে নেড়েচেড়ে গুণেগেঁথে ঝেড়েপুঁছে মনে মনে ফুলিকে দান করলুম। ভালো দেখে রবি বর্ম্মার ছবি কিনে দেওয়ালে টাঙিয়ে দিলুম,—একটা মেদিনীপুরের মাদুর এনে তার তক্তপোষের উপর পাতলুম। মনে মনে ভয় ছিল, কি জানি কলকাতা থেকে ফিরে এলে মেয়ের যদি আমাদের ঘরদুয়োর পছন্দ না হয়।

আমাদের পাড়ার জটাধর রায় এসে উঁকি মেরে বলে, কি নেপালখুড়ো', ঘরে তোমার লাট্‌সাহেবের নেমন্তন্ন আছে নাকি? আমি হেসে বলি, আটক কি ভাই, কলিকালে সবই উল্টোপাল্টা।—আমাদের বামুনপাড়ার চাটুয্যেদের ছেলেরা এসে আমার ঘর দেখে ও রেগে জ্বলতে থাকে। তাদের ভাবখানা এই, দেখেছ একবার, কলুর বেটা অক্ষর লিখতে পড়তে শিখে একেবারে নবাব হয়ে উঠেছে। কোন্‌দিন আমাদের সপের উপর এসেই বা বসে!—আমি কথাটি কইনে। এ ঘর যে আমি কার জন্যে সাজাচ্চি সে ত গাঁয়ের কোন লোক জানে না—তারা বলে, পিঁপিড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে!

দুটো বছর গেল, আমার ফুলরাণীর শিক্ষার মেয়াদ শেষ হল। আমার আকাশ জুড়ে আজ আগমনীর গান বাজচে। তখন পুজোর ছুটির সময়। আমাকে ত প্রতিমা গড়তে হয়নি, আমার ঘরে আমার বোবা-কালা মেয়েটির মধ্যে পার্ব্বতী এসেছেন। বামুনপাড়ার চাটুয্যেদের ঘরে যে প্রতিমা দাঁড়িয়েচে সে কি আমার এই উমার চেয়ে বেশী কথা কইতে পারে?

আমার সব সাধ মিটল। আমার মত হতভাগা যা আশা করতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশী সুখে আমাদের দিন যেতে লাগল।

কিন্তু কাছের ধনকে দূরে নিয়ে যাবার জন্যেই জগৎ জুড়ে দিনরাত ষড়যন্ত্র চলচে। বিধাতার একটা কোন পেয়াদা আছে, সে হার গাঁথতে দেবে না, সে সুতো ছিঁড়বে। এবার আমার বুকের মাণিককে বাইরে ছিনিয়ে নেবার জন্যে কোথা থেকে একটা দূত এসে উপস্থিত হল! একে কোনোদিন চিনিনে কিন্তু তবু ঘরের মধ্যে এর পথ আটক করতে পারিনে।

বয়স তার অল্প—পঁচিশ কি ছাব্বিশ হবে। চোখ দুটো কেমন তার ভাবে-

ভোলা রকমের। নধর দেহ, গৌর বর্ণ। তখন পড়ন্ত বেলা, আমাদের বাড়ীর সামনের রাস্তায় তাকে দেখলুম। কিন্তু কোথায় যে সে যাবে, কিছু যে তার দরকার আছে এমন বোধ হল না, অথচ আমার ঘরের মধ্যেও আসে না কেন? একবার মনে হল, পথ হারিয়েচে, পথ জিজ্ঞাসা করবার জন্যে কোন মানুষ খুঁজচে বুঝি? কিন্তু পাশ দিয়ে গোরুর গাড়ি নিয়ে গাড়োয়ান গেল তাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করলে না।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে সে চলতে আরম্ভ করলে, যেন সে পথিকমাত্র, এতক্ষণ যেন সে চলছিল। তাই দেখেই আমার সন্দেহ হল লোকটার একটা-কিছু মৎলব আছে। তাকে ডাক দিলুম, "ও মশায়!" কথাটা সে কানেই নিল না। আরো গলা চড়িয়ে বললুম, "শুনচেন মশায়?" শোনারও কোনো লক্ষণ নেই।

যাক্ গে, যে যেতে চায় তাকে যেতে দেওয়াই ভালো—ডাকাডাকি করে লাভ কি? কিন্তু তার পরে দেখা গেল যেতে মোটেই চায় না, আর ডাকাডাকি যে আমি করচি তা নয়—যে জায়গা থেকে ডাক আস্‌চে ঠিক সে জায়গায় সাড়াও মিল্‌ছে। সব কথা ক্রমে বলচি।

আমার ফুলুর মুখে কথা নেই কিন্তু কোনোদিন হাসির অভাব ছিল না। তার চোখের কালো তারার মধ্যে পর্য্যন্ত হাসি। কদিন দেখচি সে হাসিও আজ বোবা হয়ে এসেচে। বিধাতা ত তাকে চুপ করিয়েই রেখেচেন কিন্তু সকল দেহ যে তার কথা কইত সেও যেন আজ-কাল বন্ধ, তার শরীরে আর ঢেউ খেলচে না। যদি জিজ্ঞাসা করি, "ফলি, তোর কি হয়েছে মা?" অমনি একমুখ হাসি দিয়ে সে তার জবাব দেয়। কিন্তু সে হাসি যেন কেমন ফ্যাকাশে। আজ পর্য্যন্ত কখনো তাকে এক মুহূর্ত্ত কাজ কামাই করতে দেখিনি—কিন্তু সেদিন সকালবেলা দেখি বাঁশ-তলায় চুপটি করে বসে খিড়কীর পুকুরটার দিকে কেমন হয়ে চেয়ে ছিল। আমার মন খারাপ হয়ে গেল। ভাবলুম, বোবা মন অন্ধকার, সেখানে সব জায়গায় আমাদের দৃষ্টি চলে না, বোধ হয় পূর্ব্বজন্মকার একটা কোন দুঃখু সেখানে জমা হয়ে আছে।

সেদিন মহাজনদের হিসেব চুকাতে গিয়েছিলুম, ফিরে আসতে সন্ধে এল। বাড়ীর সামনে আসতেই দেখি সেদিনকার সেই মানুষটা আমারই বাড়ী থেকে বেরিয়ে ঠিক আমার সামনে এসে পড়ল। তাই বটে! চোর না হয়ে ত যায় না। হাত চেপে ধরলুম, দেখি আঙুলে তার আংটি—এই

আংটিই ত আমি ফুলুকে দিয়েছিলুম। আংটি তুমি কোথায় পেলে? কোনো জবাবই করে না। ভারি রাগ হল। তাকে হিড়হিড় করে ঘরের মধ্যে টেনে এনে আমার চাদর দিয়ে কষে তাকে খোঁটার সঙ্গে বাঁধলুম। লোকটা তবু একটা কথা বল্লে না। তার ভাবখানা এই, আমাকে বাঁধাটা অনাবশ্যক, না বাঁধলেও নড়ব না। ভাবলুম থানা থেকে চৌকিদার নিয়ে আসি, কথা বলাবার ফন্দী তারা জানে।

এমন সময় ঘরে ফুলু এসে পড়ল। লোকটাকে দেখে তার মুখ শাদা হয়ে গেল। হবেই ত, ওরই হাত থেকে ত আংটি ছিনিয়ে নিয়েচে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ফুলু, এ ত তোমারি আংটি?—সে ঘাড় নেড়ে জানালে হাঁ।—আমি বল্লুম, ভয় কোরো না, এ'কে আমি এখনি পুলিসে দিচ্চি, আর উৎপাত করবে না।

দেখি ফুলুর চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়তে লাগল। যত বলি, কাঁদিস কন মা, ততই তার কান্না বেড়ে যায়।

আমার এ কাহিনী আর কি বলব? এইটুকু বল্লেই সবাই বুঝতে পারবে যেখানে এ গল্প শেষ হল সেখানে ফুলির কান্না ফুরিয়ে হাসি দেখা দিল—কিন্তু সে হাসির রং বেল ফুলের মত ফুট্‌ফুটে নয় রক্ত-করবীর মত লজ্জায় টুক্‌টুকে।

আংটি চুরিটা প্রমাণ হল না বটে কিন্তু চুরি করে নিয়ে গেল যার আংটি তাকে,—আমার ফুলরাণীকে।

কেমন করে জানব, বোবা-কালাদের ইস্কুলে পুরুষদের বিভাগে এই ছেলেটা পড়ত;—সেইখানে দূরের থেকে বোবায় বোবায় চোখে চোখে দেখা এবং শোনা দুইই। নিঃশব্দে সব কথাবার্তা হয়ে গেছে, অন্তর্যামী ছাড়া কেউ শোনেনি।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, জাত কি?—জাতে মেলে না। পণ্ডিতের কাছে গেলাম সে বলে বিয়ে ত চলবে না।

ফুলুকে এসে বল্লুম, ও ফুলু জাতে বাধে যে!—তার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। সে দিনটা আর কিছু বল্লুম না। রাতও গেল কেটে। পরের দিন তার চোখ দুটো দেখি ফুলে লাল হয়ে উঠেচে।

তখন তার চোখ দুটি থেকে বিধান পেলেম। যারা বোবা-কালা

তারা সবাই এক জাতের, যারা কথা কয় তাদের জাতের আর সীমা সংখ্যা নেই।

ছোঁড়াটা সাহেবের বাগানের মালী। আমার ফুলরাণী সেই ফুলের দেশে রাজত্ব করতে চলল।

তার পরে দিনকতক আমি কাঁদলেম। তার পরে ভাবচি আর যাই হোক্ মরতে পারব নিশ্চিন্ত হয়ে।

ডিকেন্সের Dr. Marigold গল্পের আভাসে রচিত]



কর্পূরের মালা

শৈলবালা ঘোষজায়া

। এক ।

গোলমালে ভিড়ের ভিতর মাসীমার হাত ছাড়াইয়া ছবি যে কখন পিছাইয়া পড়িয়াছিল তাহা সে কিছুই টের পায় নাই, হঠাৎ অপরিচিত লোকের ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ির মাঝে আপনাকে নিঃসহায় বেপথুমানা দেখিয়া ভয়ে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

দোলযাত্রা উপলক্ষে সেদিন জগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরে লোকে লোকারণ্য। সকলেই কনুইয়ের ধাক্কায় লোক হটাইয়া অগ্রসর হইতে উদ্‌গ্রীব। যাত্রী পরিচালক পাণ্ডা ও ছড়িদারদের হাঁকডাকে কানে তালা ধরিয়া যাইতেছে। ত্রয়োদশবর্ষীয়া পাতলা ডিগডিগে মেয়ে ছবি—লোকের হুড়াহুড়ির ঠেলায় কিছু হটিতে হটিতে একেবারে মন্দিরের দরজার গোড়ায় আসিয়া পৌঁছিল।

ছবি আকুল ক্রন্দনে অধীর হইয়া উঠিল। কে কাহাকে দেখে, কে কাহার কথা শোনে? তাহার পানে কেহ ফিরিয়া তাকাইলও না। আজ দেবতা দর্শনে তাহারা আসিয়াছে—দেবতা দেখিবে, দুঃস্থকে দেখিবার অবকাশ নাই; দেবতার দর্শনে স্বর্গলাভ হয়—সে স্বর্গ যদি বাহুবলের প্রভাবে গুতাগুঁতির দ্বারা দুর্বল দলনে পাওয়া যায়, তবে কোন বুদ্ধিমান তাহাতে ইতস্তত করে? কে এমন স্বার্থত্যাগী নির্বোধ আছে, নির্লজ্জ আছে, যে পরের খোঁজ লইতে গিয়া নিজের অনায়াসলভ্য স্বর্গ হারাইতে আপত্তি করে না? কেহই না! আতঙ্ক-পীড়িতা বালিকার ক্ষীণরোদন প্রচণ্ড কোলাহলের মাঝে ডুবিয়া তলাইয়া গেল।

"কি হয়েছে খুকি, কি হয়েছে তোমার—কেন কাঁদছ গা?" শ্যামবর্ণ, একহারা, কপালে চন্দনের ফোঁটা, গলায় মালা, কোমরে গামছা জড়ান, ঈষদ্দীর্ঘাকৃতি একটি তরুণ কোমল মূর্তি, ছবির মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া স্নেহময় স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন কাঁদছ খুকি?" চারিদিকে অদ্ভুত বৈচিত্র্যময়ী কটকী ভাষার কিড়িমিড়ির মাঝে, হঠাৎ পরিষ্কার বাংলা প্রশ্ন শুনিয়া ছবির কান্না বন্ধ হইল; ছবি জলভরা বড় বড় চোখ দুটি তুলিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্নকর্তার মুখপানে চাহিল, আহা, কি সুন্দর মমতাময় সরল মুখখানি! সন্ত্রস্ত-শঙ্কিতা ছবি অনেকটা আশ্বস্ত হইল।

আবার স্নেহময় স্বরে সেই ব্যগ্র প্রশ্ন।

সহসা পিছনের সজোর ধাক্কায়, সোনার পুতুলের মত ক্ষীণকায়া ছবি, ছিটকাইয়া সেই লোকটির উপর গিয়া পড়িল। ক্ষিপ্রহস্তে পতনোন্মুখ ছবিকে ধরিয়া ফেলিয়া সেই লোকটি অতি যত্নে তাহাকে বাম হাতের বেষ্টনে আগলাইয়া লইয়া, বিপুল বিক্রমে অমিত প্রতাপে লোক ঠেলিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে একটু তফাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

ছবি এতক্ষণ প্রাণপণে অন্তিম অবলম্বনের মত সেই অপরিচিত লোকটির হাত চাপিয়া ধরিয়া ছিল। এখন ফাঁকা জায়গায় আসিয়া সঘন উচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া, লোকটির হস্তবদ্ধ নিজের ঘর্মাক্ত হাতখানি খুলিয়া লইয়া সলজ্জ সঙ্কোচে একটু সরিয়া দাঁড়াইল। লাবণ্যময়ী কিশোরীর মুখপানে প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া, তরুণ যুবাটি করুণা-কোমল কণ্ঠে শুধাইল, "কার সঙ্গে মন্দিরে এসেছিলে খুকি?"

থামিয়া থামিয়া শুষ্ক কণ্ঠে ছবি বলিল, "আমার মা, মাসীমা, মেসোমশাই, ঝি —সবাই এসেছে। আমি মাসীমার হাত ধরে ছিলুম, তারপর মন্দিরে ঢুকে—" ছবি আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

"চুপ কর, চুপ কর, এখনি তাদের পাবে, কান্না কি? তোমাদের ছড়িদার কেউ নেই?"

"হ্যাঁ আছে, কপালে ফোঁটা পরে একজন—"

"তার নাম কি বল দেখি?"

"তা জানিনে, তার মাথায়—ঐ তোমার মত চুল ছাঁটা নেই ত—বড় বড় চুলে চূড়ো বাঁধা আছে।"

সরলা বালিকার এই অভ্রান্ত যুক্তিপূর্ণ অভিজ্ঞান নির্দেশে লোকটির মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিল, চারিদিকেই তো শত শত চূড়া বাঁধা মাথা, তাহার মধ্য

হইতে একটি চূড়াচিহ্নিত পরিচিত মাথা খুঁজিয়া বাহির করা নিতান্তই সহজ !

"আচ্ছা, পাণ্ডার নাম কি জান ?"

"না, মায়েরা কেবল সেই লোকটার সঙ্গেই ঠাকুর দেখতে ঢুকেছেন।"

"মন্দিরে ঢুকেছেন তো ? আচ্ছা তবে কোন ভয় নেই, এখনি বেরুলেই পাওয়া যাবে। তোমার নামটি কি খুকি ?"

"আমার নাম ছবি।"

সেই রবিকরোজ্জ্বল মধুর প্রভাতে, সেই স্নিগ্ধ লালিত্যময় সুন্দর মুখখানির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া মুগ্ধ-হৃদয় যুবা ভাবিল, "ছবি বটে !"

কোলাহল করিতে করিতে যাত্রীদল জলপ্রবাহবৎ যাওয়া-আসা করিতেছে। চলিতে চলিতে কেহ বা তাহাদের দিকে কৌতুকোজ্জ্বল কটাক্ষ হানিয়া যাইতেছিল—ছবি নত দৃষ্টিতে সসঙ্কোচে জড়সড় হইতেছিল। অদূরে আবির-লাঞ্ছিত, অদ্ভুতদৃশ্য কয়েকজন ছোকরা তাহাদের লক্ষ্য করিয়া, গোপন বিদ্রূপে চোখ টেপাটিপি করিয়া বেজায় হাসিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন দণ্ড দুয়েকের জন্য সরিয়া গিয়া মন্দির দ্বারে ভিড়ে মিশিল, তাহার পর সহসা অত্যন্ত ব্যস্তভাবে আসিয়া আচম্বিতে ছবির হাত ধরিয়া এক হ্যাঁচকা মারিল। "আরে আমার যাত্রীর মেয়ে, ভিড়ে হারিয়েছে, আয়।"

সেই সর্বদর্শী তরুণ যুবা এই লোকটার আচরণ আগাগোড়া সব লক্ষ্য করিতেছিল ; বহুকষ্টে এতক্ষণে সংযত ছিল, আর পারিল না ; সদ্যকৃত ধৃষ্টতার প্রত্যুত্তরে অকস্মাৎ রুদ্রমূর্তি ধরিয়া সেই অসভ্যটার গালে সশব্দে এক চড় বসাইয়া দিল। বিশ্বম্ভর পাণ্ডার হাতে গড়া চেলা, ছড়িদারদের সর্দার সে, রঞ্জন মিশ্র তার নাম, তার কাছে বেয়াদবি !

অপ্রত্যাশিত চপেটাঘাতে বিপর্যস্ত হইয়া আলোড়িত মস্তিষ্কে বুদ্ধিমান লোকটা যন্ত্রণাকাতর মুখে গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে তাড়াতাড়ি ভিড়ে ভিড়িয়া পড়িল, আর পিছু ফিরিয়া চাহিল না। ভয়াকুলা ছবিকে শান্তস্বরে আশ্বস্ত করিয়া রঞ্জন তাহাকে আবার আগলাইয়া দাঁড়াইল।

"মেয়ে কই, মেয়ে কই"—কোলাহল করিতে করিতে একদল লোক মন্দির হইতে বাহির হইয়া ব্যগ্র ব্যস্ততায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। "ওগো, এইদিকে একটি মেয়ে দেখেছ গা—এই এতটুকু মেয়ে—পাৎলা চেহারা—সুন্দর মতন, কেউ দেখেছ গা—"

চারিদিকে প্রশ্নোত্তরের উচ্ছৃঙ্খল কলরব পড়িয়া গেল।

"আরে এই হরুয়া—এই ধারে ফের, আরে—এই বোকা, এদিকে দেখ, এই, কি খুঁজছিস—"

"আরে মেয়ে হারিয়েছে; মেয়ে হারিয়েছে, আমার যাত্রীর।

"দেখ দেখি, এই কি সেই?"

"হাঁ হাঁ, এই এই! ভয় নেই বাবু, পাওয়া গেছে, এই দিকে, এই দিকে আসুন, আসুন—এই যে গো এই!"

ভয়ঙ্কর ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ির ভারি ধূম পড়িয়া গেল, কে কাহার ঘাড়ে পড়ে ঠিক নাই। অনেক লোক ছুটিয়া আসিয়া রঞ্জন ও ছবিকে ঘিরিয়া ফেলিল, রোরুদ্যমানা আকুলা বিধবা জননী ছবিকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া ঘন ঘন, নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। সদ্য-আশঙ্কা-মুক্ত আশ্বস্ত অন্তরে জগদ্বন্ধুর উদ্দেশে তাঁহার চক্ষু হইতে পূর্ণ আবেগে অশ্রু উছলিয়া পড়িতে লাগিল।

॥ দুই ॥

তাহার পর দিন কয়েকের মধ্যেই সেই পরিবারের সহিত অপরিচিত যুবার ঘনিষ্ঠতা খুব পাকাপাকি হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সেটা সকলের প্রীতিকর হইল না। সংসারে এক শ্রেণীর কতকগুলি জীব আছে, যাহারা নিজেরাও হাসিতে পারে না আর পরের হাসিও সহ্য করিতে পারে না; গোপন অন্ধকারে, ব্যর্থ ঈর্ষাকে ক্রমাগত কঠিন বিদ্বেষে শানাইয়া বড়ই তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল করা যায়; কিন্তু সেটা যে কেবল পরের চর্মই ভেদ করিবে—এমন কথা নিঃসংশয়ে কেহ বলিতে পারে না। বরং সেটা বিপরীত মুখে প্রক্ষিপ্ত হইয়া অনেক সময় একে আর হইয়া দাঁড়ায়, এবং যন্ত্রণার ঝালটা বাড়িতে থাকে সেই লক্ষ্যচ্যুত পরের উপর।

দুষ্ট গ্রহের অনুকম্পায় রঞ্জনের সেইরূপ কতকগুলি সুহৃদ জুটিল। পাণ্ডার ছড়িদারেরা তাহার উপর মর্মান্তিক চটিয়া গেল। বাস্তবিক এত উচ্ছৃঙ্খলতা কি সহ্য করিতে পারা যায়? কোথাকার কে? সম্পূর্ণ অপরিচিত, অনাহূত, অন্য পাণ্ডার এক লক্ষ্মীছাড়া ছড়িদার—সে লোকটা সহসা অতর্কিতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়া তাহাদের একান্ত ইজারা-করা যাত্রী পরিবারকে ছোঁ মারিয়া যে অসঙ্কোচে নিজের খাস দখলের অন্তর্ভূত করিয়া লইবে,—ইহা কখনই কোন সহিষ্ণু ব্যক্তি ক্ষমা করিতে পারে না। আর রঞ্জনের উপরই বা ইহাদের এমন

টান কেন রে বাপু! ছোঁড়া যাদু জানে না কি?

বাস্তবিকই, সরল হাস্যমণ্ডিত মুখে এই প্রিয়দর্শন যুবাটি যাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইত তাহারই প্রাণে একটা স্নিগ্ধ মাধুরী ফুটাইয়া তুলিত; রমণীরা ছলছল নয়নে তাহার মুখপানে চাহিয়া ভাবিতেন, আহা, ছেলেটি কি মায়াবী। পুরুষেরা ভাবিত আরামের সঙ্গী বটে। দরিদ্রের প্রতি চির-তাচ্ছিল্যশালী ক্রূর দাম্ভিক অন্তঃকরণও এই আত্মসম্রমে উদাসী সুকোমলকান্তি যুবাটির নম্র সরলতায় অকপট স্নিগ্ধতায় চমৎকৃত হইত। রঞ্জন কাহারো খাতির রাখিত না; নিজেও খাতিরের জন্য লালায়িত ছিল না; কিন্তু সকলের উপরই তাহার অগাধ অপরিসীম ভালবাসা! রঞ্জনের একটা মহৎ গুণ ছিল, সে সকলের সঙ্গেই অবাধে মানাইয়া চলিত, কখনো কোথাও দ্বিধাপীড়িত হইয়া কেহ তাহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখে নাই। সকল হৃদয়ের সঙ্গেই সে সমান ভাবেই হৃদয়ে মিশাইতে অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু কোথাও এতটুকু অসংযম বর্বরতার চিহ্ন ছিল না। নিজেদের ত্রুটী যাহারা সংশোধন করিতে জানে না এবং পরের নৈপুণ্য সহ্য করাও যাহাদের ক্ষমতার অতীত, তাহাদের মত লোকের চক্ষুঃশূল ছিল রঞ্জন। কিন্তু উন্মুক্ত উদার প্রাণ রঞ্জনের তাহাতে কিছু আসিয়া যাইত না। সে প্রতিদ্বন্দ্বীর আক্রোশের আক্রমণ কৌতুকের হাসিতে নিষ্ফল করিয়া শত্রুকে অমায়িক ব্যবহারে অভিভূত করিয়া ফেলিত। তাহাকে যে অপদস্থ করিতে আসিত—সেই অপ্রস্তুত হইয়া ফিরিত।

অবসরে অনবসরে রঞ্জন মেসোমহাশয়ের অন্তরঙ্গ সহচর হইয়া উঠিল। শ্রীমন্দিরে বিগ্রহ দর্শনের সময় তাঁহাদের নিজ পাণ্ডার ছড়িদার থাকা সত্ত্বেও তিনি রঞ্জনকে টানিয়া আনিতেন। সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে হইবে, তাও রঞ্জন সঙ্গী, রাত্রে বাসায় বসিয়া গল্প-গুজব করিতেন, তাহাতেও প্রায় রঞ্জনই রসদার থাকিবে। দূরে দেবদর্শনে যাইতে হইবে, সেও রঞ্জনের সঙ্গে থাকিলেই ভালো হয়। না হইলে মেসোমশায়ের একান্ত অস্বস্তি বোধ হয়। সকল বিষয়েই রঞ্জন হইয়াছিল তাঁহার প্রধান নির্ভর।

নিজের প্রভুর কাজ বাজাইয়া এতটুকু অবসর পাইলেই রঞ্জন আসিয়া তাঁহার কাছে জুটিত, তাঁহাদের সহিত ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহাদের সব দেখাইয়া শুনাইয়া কে জানে কেন,—রঞ্জন এক অনির্বচনীয় পরিতৃপ্তি পাইত। বিশেষ ছবি,—আহা ছবিটি বেশ মেয়ে, ছবির কমনীয় ছবিখানি দেখিবার জন্য তাহার প্রাণে সযত্নে লুক্কায়িত একটা অপরিসীম আগ্রহ সঞ্চিত ছিল। তাহার

প্রাবল্যে রঞ্জন একটু বেশ রীতিমতই বিব্রত হইয়াছিল। ছবির নিকট হইতে সে ইদানিং সতর্কতার সহিত তফাতে থাকিতে চাহিত, প্রাণপণে আত্মদমন করিয়া সকলের নিকট চিরপরিচিত আত্মীয়ের মত স্বভাবসিদ্ধ সহজ সুরে দিব্য কথাবার্তা কহিত, কিন্তু এতটুকু ছোট মেয়ে—সে সকলের নিতান্ত অগ্রাহ্যের বস্তু—তাহার কাছে রঞ্জনের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া হঠাৎ সব গোলমাল হইয়া যাইত। হাসিভরা মুখের সুধাভরা বাক্যগুলা অকস্মাৎ নির্মম সঙ্কোচে পরস্পর আত্মঘাতী হইয়া মরিত। সকলের মুখপানে সে অসঙ্কোচে চাহিত, কিন্তু যদি দৈবাৎ অতর্কিতে ছবির সহিত চোখাচোখি হইত তবে সে আকুল উৎকণ্ঠায়, ত্রাস্তে চোখ নামাইয়া, কোনমতে সেখান হইতে সরিয়া যাইতে পারিলে তবে হাঁফ ছাড়িয়া সুস্থ হইত, কিন্তু কে জানে কি একটা তীব্র আকর্ষণ তাহাকে ক্রমাগতই সেই দিকেই টানিত।

পনের বছর বয়স হইতে সে যাত্রী চরাইতেছে কিন্তু কই তাহার তো কাহারও কাছে এক মুহূর্তের জন্য সঙ্কোচ হয় নাই। এখন তবে একি হইতেছে? এতটুকু একজনের কাছে এত কিসের…। নিজের গতিক বুঝিয়া সে নিজেই ধাঁধায় পড়িয়া গেল। একি হইল!

॥ তিন ॥

বিকালে, বাসার বারান্দায় পৈঠার উপর বসিয়া ছুরি দিয়া মেসোমশাই কাঁচা আম ছাড়াইতেছেন ও অদূরবর্তী রোয়াকে উপবিষ্টা, হরিনামের ঝুলি হস্তে ছবির জননীর সহিত ছবির বিবাহ সম্বন্ধে কথাবার্তা কহিতেছেন। খিড়কির পশ্চাদ্ভাগে পোড়ো জমিটায় ছেলেরা সকলে খেলা করিতেছিল সেখান হইতে তাহাদের উচ্চ কলরব বেশ স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল। অন্য স্ত্রীলোকেরা তখন রান্নাঘরে ছিলেন।

সদর দুয়ার পার হইয়া প্রাঙ্গণে রঞ্জন মিশ্র দেখা দিল। মুহূর্তে মেসোমশায়ের মুখের কথা ঠোঁটের মধ্যে থামিয়া গেল, হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলিলেন, "এস এস রঞ্জন, এস, কাল তোমায় দেখতে পাইনি কেন ঠাকুর?"

"বড় কাজের ভিড় পড়েছে বাবু। ওকি করছেন? আম? দিন আমায়, আমি ছাড়াচ্ছি"—মেসোমশাইয়ের হাত হইতে ছুরি লইয়া রঞ্জন তৎক্ষণাৎ আম ছাড়াইতে বসিয়া পড়িল। সস্নেহ দৃষ্টিতে তাহার পানে তাকাইয়া মেসোমশাই আবার ছবির বিবাহের প্রসঙ্গ লইয়া পড়িলেন।

রঞ্জনের শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপর শরীরের সমস্ত তড়িৎ আসিয়া কাজ করিতে লাগিল, প্রাণপণে উত্তেজনা চাপিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সে ছুরি চালাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রঞ্জন সব আমগুলি পরিষ্কাররূপে ছাড়াইয়া ফেলিল; "দেখুন তো বাবু, হয়েছে?"

"বেশ হয়েছে! আচ্ছা রঞ্জন, তুমি এত বাংলা শিখলে কোথা? কখনো বাংলা দেশে গিছলে?"

"না বাবু, এইখানেই যাত্রীদের সঙ্গে মিশে শিখেছি।"

"বাঃ! বাহাদুর ছেলে তুমি, খাসা বুদ্ধিমান!" রঞ্জন উপস্থিত কৌতুকে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বালকের মত অসঙ্কোচ আনন্দ-সুন্দর দৃষ্টিতে মেসোমশায়ের পানে তাকাইয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "আপনারা আমায় বড় ভালোবাসেন, না?"

তাহার সুকুমার সরল প্রশ্নে ছবির জননীর মনে গভীর মমতার উৎস উথলিয়া উঠিল, জীবনের সহস্র শোক বেদনায় সন্তপ্ত রমণীর চক্ষু হইতে বাৎসল্য স্নেহের তপ্ত অশ্রু খসিয়া পড়িতেই তাড়াতাড়ি আঁচলে চক্ষু মুছিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, "নারায়ণ, নারায়ণ, হরিবোল! মেসোমশাই সস্নেহে রঞ্জনের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে রহস্যস্মিতহাস্যে বলিলেন, "ঠিক হয়েছে দিদি, আপনি ছবির বের জন্যে ভাবছেন কেন? এক কাজ করুন জগবন্ধুর সামনে। তুচো ফুল ফেলে ছবিকে এই ছেলেটির হাতে উচ্ছুগ্য করে দিন। ভাবনা চিন্তে সব চুকুক, আর রঞ্জনটিও আমাদের আপনার লোক হয়ে থাক।"

রঞ্জনের কপালের শিরা লাফাইয়া ফুলিয়া উঠিল। আঘাতের ধাক্কাটা অবিচলিত ভাবে গোপন করিতে তাড়াতাড়ি অঞ্জলি পুরিয়া আম লইয়া রঞ্জন রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। সজল নয়নে চাহিয়া চাহিয়া ছবির জননী ভাবিলেন, "আহা অমন আত্মি-গো জামাই হওয়া ভাগ্যের কথা!"

রঞ্জন ফিরিয়া আসিয়া বসিল, অন্য প্রসঙ্গের কথাবার্তা চলিতে লাগিল। কিন্তু রঞ্জন সে সকল কথা আর শুনিতে পাইল না। তাহার উন্মত্ত আনন্দফুল্ল শ্রবণশক্তি—সহসা কালান্তকের শরবিদ্ধ মুমূর্ষুর মত প্রাণের মাঝে লুকাইয়া পড়িল। হায়, অশুভক্ষণে সেই তুচ্ছ ব্যঙ্গ উচ্চারিত হইয়াছিল—রঞ্জনের অন্তরে সেটা সাংঘাতিক বাজিয়াছে, থাকিয়া থাকিয়া রঞ্জন কেবলই অধীর হইয়া উঠিতেছিল। কঠিন পৌরুষের তীব্র ভ্রূকুটী ভঙ্গিমায় যতই সেই মোহময় উদ্বেগটাকে সজোরে ধাক্কা মারিয়া তাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ব্যাপারটা

ততই দৃঢ় হইয়া তাহার অন্তরে প্রতিঘাত করিতে লাগিল। কি বিপদ—রঞ্জন আকুল হইয়া উঠিল। কথাটা ক্রমশঃ তাহার সমস্ত মনটা জুড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল। কোন রকমে শিষ্টাচার বজায় রাখিয়া বিদায় লইয়া রঞ্জন খিড়কির দুয়ার দিয়া বাহির হইল। সুবিধা হইত বলিয়া সে এই পথ দিয়াই প্রায় বাটী যাইত।

খিড়কির বাহিরে, খোলা জমিতে বালির গণ্ডী কাটিয়া মহা উৎসাহ আস্ফালনে ছোকরা সব খেলায় মাতিয়াছে। কেবল ছবি একাকী, ওদিকের রাস্তার ধারে বেড়ার কাছে দাঁড়াইয়া একজন উড়িয়া স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিতেছিল। ছবি বড় হইয়াছে, সে কি আর খেলিতে পারে?—ছিঃ তাহার কাজ এখন সকলকে আটকাইয়া খেলা করান।

রঞ্জনের পা আর সরিল না, চিত্রার্পিতের দুয়ার অবলম্বনে দাঁড়াইয়া আত্মবিস্মৃত রঞ্জন গভীর বিহ্বলতায় ছবির পানে চাহিয়া রহিল—আহা কি চমৎকার ছবিটি! রঞ্জনের মস্তিষ্কে ঘনীভূত উত্তেজনা জমাট বাঁধিয়া উঠিল।

ছবি স্ত্রীলোকটিকে আত্ম-পরিচয় দিতেছে, "আমার সবাই আছে, কেবল বাবা নাই।"

কথাটা রঞ্জনের মর্মভেদ করিয়া ধ্যানস্থ হৃদয়ের সমবেদনার তারে সূক্ষ্ম আঘাতে গভীর করুণার আকুল ঝঙ্কনা বাজাইয়া তুলিল। আহা, তাহারও যে পিতা নাই।

সহসা তাহার স্বপ্নপূর্ণ চিত্ত আলোড়িত করিয়া তীব্র গ্লানির ধিক্কারে ক্ষণমধ্যে তাহার সহানুভূতিপূর্ণ সুখের আবেশে রচিত চিন্তাগ্রন্থি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ক্ষুব্ধতাক্ষিপ্ত প্রাণ নিষ্করুণ যন্ত্রণায় হাহাকার করিয়া উঠিল, হায় হায় .ন করিতেছে কি?—করিতেছে কি? ভগবান জগন্নাথদেব, তোমার আশ্রিত অনুগত সেবকের অন্তরে একি প্রলয়ঙ্কর প্রলোভনময় আকাঙ্খার দাবানল প্রজ্বলিত করিলে ঠাকুর! —রক্ষা কর, রক্ষা কর প্রভু!

মাতালের মত চলিতে চলিতে রঞ্জন পথে নামিয়া পড়িল।

॥ চার ॥

পরদিন শ্রীমন্দিরে মেসোমশায়ের সহিত রঞ্জনের দেখা হইল। সকলকে লইয়া তিনি দেবতা দর্শনে আসিয়াছেন। রঞ্জনকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, আজ একবার ভাল করে দর্শন করিয়ে দাও, আজই তো শেষ, আর ত হবে না।"

"হবে না? কেন বাবু?"

"কাল যে আমরা দেশে ফিরব ঠাকুর।"

নিমেষ মধ্যে কে যেন রঞ্জনের হৃদ্‌পিণ্ডের শিরাগুলি তপ্ত সাঁড়াশীতে সজোরে চিমটাইয়া ধরিল, কাল! কালই! এত শীঘ্র! পীড়িত মর্ম ভেদ করিয়া, বুকের মাঝখানে, বার বার আর্তপ্রশ্ন ধ্বনিত হইতে লাগিল—কাল, কালই, এত শীঘ্র! হায় দুর্ভাগ্য!

কোমরে কসিয়া চাদর বাঁধিয়া, সজোরে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া রঞ্জন মনে মনে ভাবিল, "আমারই অন্যায়।"

"আবার কবে আসিবেন বাবু।"

"আবার!" রহস্যচ্ছলে হাসিয়া মেসোমশাই বলিলেন, "জগন্নাথ আবার যখন ডুরি ধরে টানবেন তখন আসব, কি বলেন দিদি?"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া ছবির জননী মন্দির পানে চাহিয়া বলিলেন, "আহা, তা আর নয়! জগবন্ধু আবার যখন মনে করবেন, তখন আসব।" ম্লানমুখে ক্লিষ্টহাসি হাসিয়া রঞ্জন বলিল, "তিনি সবাইকে মনে করেন মা, কিন্তু তাঁকে তো সবাইকার মনে পড়ে না।"

মেসোমশাই গম্ভীর মুখে বলিলেন, "ঠিক।"

"তা হলে সবাইকে নিয়ে রথের সময় আসবেন বাবু।" কথাটা বলিয়াই দুঃসহ কুণ্ঠা রঞ্জনের কণ্ঠ যেন চাপিয়া ধরিল, রঞ্জন তাড়াতাড়ি সকলকে লইয়া অগ্রসর হইল। চলিতে চলিতে মেসোমশাই বলিলেন, "রঞ্জন, তুমি আজ বিকেলে আমাদের বাসায় যাবে?"

"না বাবু, পাণ্ডার জরুরী কাজ আছে।"

"তাইত, তোমার সঙ্গে যে তাহলে আর দেখা হবে না, আমরা কাল সকালের ট্রেনেই রওনা হব।"

ব্যস্তভাবে ছবির জননী বলিলেন, "তা হলে এইখানেই—"

"হ্যাঁ, তাই হবে।"

সকলে মন্দিরে ঢুকিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে বিগ্রহকে প্রণাম করিয়া সকলে মন্দির প্রাঙ্গণে আবার সমবেত হইলেন। অকস্মাৎ-দৃষ্ট একটি পরিচিত লোকের সহিত মেসোমশাই একটু তফাতে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন দেখিয়া রঞ্জনও অন্যদিকে সরিয়া গেল; কয়েক ছড়া কর্পূরের মালা হাতে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে অন্যমনস্কভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া সে ভাবিতেছিল। মর্মান্তিক

কাতরতায় তাহার সারা অন্তঃকরণটা আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। হায়, কাল হইতে সে আর ইহাদিগকে দেখিতে পাইবে না!

খানিক পরে মেসোমশাই ফিরিলেন। রঞ্জন আসিয়া মেসোমশায়ের গলায় একছড়া মালা পরাইয়া ছেলেদের গলায় এক একছড়া মালা দিল। রমণীদের সকলের হাতে হাতে এক এক ছড়া মালা বিলাইয়া—অবশিষ্ট মালা ছড়াটা হাতে করিয়া মার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, "মা, এ মালাটি আপনার ছবিকে দিন।"

মমতাভরা মুখে চাহিয়া একটু হাসিয়া মা বলিলেন, "তুমিই দাও না ঠাকুর।"

ঠাকুর চকিত নেত্রে একবার ছবির পানে তাকাইল। তাহার পর মুহূর্তের জন্য একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "না মা, আপনি দিন।"

রুমাল হইতে গুটিকয়েক টাকা খুলিয়া ছবির হাতে দিয়া মেসোমশাই বলিলেন, "ছবি, ঠাকুরকে প্রণাম কর মা।" ঠাকুরের চোখের সামনে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া উঠিল!

মাটিতে টাকা রাখিয়া ছবি প্রণাম করিল। কম্পিত হস্তে টাকা তুলিয়া মার হাতে দিয়া ঠাকুর বলিল, "আমি আপনার ছবিকে আশীর্বাদ করলুম মা।" চির প্রচলিত প্রথার অপব্যবহার!

"ওকি ঠাকুর, টাকা নাও, ছবির ওতে অকল্যাণ হবে, তুমি আমাদের কত উপকার করেছ,—"

গভীর দুঃখ ভরা হাসি হাসিয়া রঞ্জন বলিল, "টাকা নিয়ে উপকার বিক্রী করি না মা, এ টাকা আপনার পাণ্ডার ছড়িদারদের পাওয়া।"—চট করিয়া রঞ্জন ভিড়ের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। লোকটার আত্মম্ভরিতায় হাড়ে হাড়ে চটিয়া বিদ্বেষ বিস্ফারিত নয়নে পাণ্ডার চেলারা চাহিয়া রহিল।

॥ পাঁচ ॥

পরদিন মেসোমশাইরা দেশে ফিরিয়া গেলেন। মনে একান্ত আগ্রহ থাকিলেও কর্তব্যপরায়ণ রঞ্জন বিদায়ের শেষ মুহূর্তে, তাঁহাদের কাছে উপস্থিত থাকিতে পারিল না। পরাধীন জীবনের ক্লান্তিশূন্য কর্মস্রোতের প্রবল তোড়ে দুর্দম্য আকাঙ্ক্ষাকে নিঃশব্দে তৃণের মত ভাসাইয়া দিয়া কোলাহলের মধ্যে ডুবিয়া প্রাণের মহা শূন্যতাকে কোন রকমে পূর্ণ করিতে চাহিল, পারিল কিনা কে জানে!

দিনের পর দিন কাটিয়া চলিল, রঞ্জন মেসোমশায়ের পাণ্ডার কাছে সন্ধান লইতে লাগিল, তাঁহারা আসিবেন কি না, পত্রাদি কিছু আসিয়াছে কি ?

কিছুই না !—হতাশার নিদারুণ নিষ্পেষণে রঞ্জনের আবেগ ক্রমশঃ বাড়িয়াই উঠিতে লাগিল ! হায়, মেসোমশায়ের আসার গুরুত্ব কি তাহার মনের আকুলতার চেয়ে বেশী ? কখনই না ! ক্রমে রথের সময় কাছাকাছি হইতে লাগিল। পাণ্ডার কাছারিতে রঞ্জনের যাওয়া-আসাটা ঘন ঘন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু বিফল প্রয়াস। পাণ্ডা কোন খবরই জানে না। অবশেষে সকল সংকোচ দূরে ঠেলিয়া রঞ্জন নিজে পত্র লিখিতে বসিল। পত্র লিখিল। তাহার পর একবার তাহা পাঠ করিল, হঠাৎ কি ভাবিয়া তাহার কান দুইটি লাল হইয়া উঠিল, তৎক্ষণাৎ পত্রখানা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দিল। ছিঃ ! তাহার ছেলেমানুষী দেখিয়া তাঁহারা কি মনে করিবেন ?

তবু রঞ্জন নিজেকে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। রথের দিন যত নিকটবর্তী হইতে লাগিল, তাঁহার অধীরতাও তত বাড়িতে লাগিল ; জীবন্ত আশা বুকে করিয়া সে প্রত্যহ স্টেশনে আসিয়া ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় চতুর্দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত, বিদেশ হইতে শত শত যাত্রী আসিতেছে, যাইতেছে, কিন্তু কই ? যাহাদের খুঁজিতেছে তাহারা কই ?

সুদক্ষ কর্মচারী,—কাজে অমনোযোগী হওয়ায় প্রভু দুই চারিদিন মিঠে কড়া বচনে তাহাকে সাবধান হইতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু উদ্বিগ্ন রঞ্জনের কাণে সে কথা স্থান পাইল না। রথের দিন আসিয়া পড়িল। জগন্নাথ রথে উঠিলেন, নাবিলেন, শুইলেন, পাশ ফিরিলেন—অবশেষে উঠিয়া বসিলেন পর্য্যন্ত, তথাপি মেসোমশায়ের দেখা নাই। পূজার ছুটী আসিল, ফুরাইল, তথাপি কাহারো খোঁজ নাই।

হায় ! পৃথিবীতে কেহ কাহারো অন্তর্ভেদী যাতনা বোঝে না ! রঞ্জন গনিয়া গনিয়া প্রতি মুহূর্ত যাপন করিতেছিল। অবশেষে পূজার ছুটীর পর যখন দাসত্বজীবী, ধনগর্বী হওয়া-খাইয়েরা দলে দলে পুরী ছাড়িতে লাগিল, তখন রঞ্জন আর ভারাক্রান্ত মনটাকে লইয়া কোনমতে পুরীতে তিষ্ঠাইতে পারিল না। সে যখন কোন দিকে কিছু প্রতিকার খুঁজিয়া পাইল না তখন একদিন পাণ্ডার কাজে জন্মের মত জবাব দিয়া হঠাৎ স্টেশনে আসিয়া বঙ্গদেশের টিকিট কিনিয়া ট্রেনে চাপিয়া বসিল।

॥ ছয় ॥

গত রাত্রে ছবির বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আজ বর কন্যা বিদায়। মধুর প্রভাতী সুরের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই, সানাইয়ের সেই সুরে, বিদায়ের করুণ-রাগিনী বাজিতেছে,—সুর বায়ুর স্তরে স্তরে ঘনায়মান হইয়া উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধে পুঞ্জীকৃত বেদনায় ঠেলিয়া উঠিতেছে।

একটা লোক অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ব্যগ্র ঔৎসুক্যের সহিত বিবাহ-বাটীর চারিদিকে ক্রমাগত দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে; তাহার মুখ উজ্জ্বল। আনন্দ ও আকুল আতঙ্ক—যেন আসন্ন ভীষণতায় গাঢ়ভাবে ঘনাইয়া আসিয়াছে; লোকটার ভাব দেখিয়া বোধ হয় সে যেন বাড়ীর ভিতরকার সমারোহের তত্ত্বনির্ণয়ে উদ্গ্রীব। কিন্তু না—তাহাও তো হইতে পারে না, উৎসবের কারণ জ্ঞাত হওয়া তো কিছুই দুরূহ ব্যাপার নয়, দলে দলে লোক বাড়ী ঢুকিতেছে, বাহির হইতেছে, —চারিদিকে ঘুরিতেছে।—কতবার কত লোকের সহিত তাহার মাথায় ঠোকাঠুকি হইয়া যাইতেছে, তথাপি কই, সে তো কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছে না, —বরং বন্দুকের গুলির মুখ হইতে যেমন শিকার ত্রস্তে পলায়ন করে, সেও সেইরূপ কুণ্ঠিত ভাবে সরিয়া যাইতেছে। লোকটার রকম কি?

কিছুক্ষণ পরে, বাড়ীর কোলাহলের ঘনঘটা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। শীগ্রি নাও, শীগ্রি নাও, ট্রেনের আর সময় নেই—চারিদিকে এমনি একটা কলরব দ্বিগুন মুখরতায় উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। সকলের ব্যস্ততার মাত্রা চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল।

প্রাণপণে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া, এইবার অন্তিম সাহসে ভর করিয়া, লোকটা বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। উৎসবের বাড়ীতে কে কাহার পানে চাহিতেছে? লোকটা অবাধে গিয়া বাড়ীর ভিতর উপস্থিত হইল।

প্রাঙ্গণে আলিপনা আঁকা পীড়ির ওপর বর ও বধূকে দাঁড় করাইয়া পৌরাঙ্গনারা তখন মাঙ্গলিক ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতেছিল। চারিদিকে শাঁখ ও উলুধ্বনির উচ্চ শব্দ!—লোকটা গিয়া একেবারে আসন্ন আগ্রহে ঝুঁকিয়া পড়িল। অকস্মাৎ বজ্রাগ্নি-সম্পাতে তাহার চক্ষু যেন ঝলসিয়া গেল! প্রচণ্ড উন্মত্ত হৃদ্‌পিণ্ডটাকে সবলে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া সযত্নে শব্দ লুকাইয়া—সূর্যের উজ্জ্বল আলোকের মাঝে সন্তর্পণে আপনাকে গোপন করিয়া নিঃশব্দে সে বাহিরে আসিল। কোলাহলময়

জগৎ সহসা বিরাট নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল! চারিদিক মৃত্যুমলিন পাংশুবর্ণে রঞ্জিত হইয়া গেল, কোন দিকে একটা ক্ষীণ শব্দ অবধি আর তাহার কানে শুনা গেল না—শুনিতে সাহসও হইল না। একটা নিঃশ্বাসের শব্দ--না না, পবন অচল হোক, রুদ্ধ বায়ুতে সমস্ত জগৎ ধ্বংস হইয়া যাক—সে বরং সহ্য হইবে, তবু এ সুসজ্জিত উৎসব-ক্ষেত্রে মর্মভেদী ব্যর্থতার ঈষৎস্ফুরণ!—না না, সে কিছুতেই হইবে না! কিছুতেই না! যুগ-প্রলয়ের মহাঝটিকা ভয়াবহ কঠিনতার গহ্বরে ধীরে ধীরে সুপ্তিলাভ করিল, কেহ দেখিল না, কেহ জানিল না, কেহ ফিরিয়া তাকাইল না!—ভগবান জগবন্ধু দেব! এখনো কামনা, এখনো একটি ভিক্ষা, ঠাকুর, এক মুহূর্তের জন্য এতটুকু শক্তি ভিক্ষা দাও ঠাকুর—ওগো দয়াময় এতটুকু বল, এতটুকু শুধু বল দাও।

সুউচ্চ হর্ষনিনাদের মধ্যে একটুখানি ক্রন্দনের অভিনয় সমাপ্ত হইলে প্রকাণ্ড অশ্বযুক্ত ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে ফিটনে বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত বর বধূ সমারূঢ় হইল। গুরু গম্ভীর শব্দে মাটির অভ্যন্তরে কম্পন-হিল্লোল তুলিয়া ফিটন ছুটিল। অগ্রপশ্চাতে আরো কয়েক খানা গাড়ীতে বরযাত্রীর দল চলিয়াছে।

গাড়ী অনেক দূর আসিয়াছে। হঠাৎ বেগগামী গাড়ীর হাতল ধরিয়া ছুটিতে ছুটিতে একটা লোক সেই চলন্ত গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল! লোকটার চক্ষু নিষ্পলক, মুখে দৃঢ় কঠোরতা; হস্ত পদে মৃত্যুর শীতলতা, শরীরে শোণিত-শূন্যতা স্পষ্ট প্রতীয়মান। সে কোন দিকে না চাহিয়া, বরের গলায় একছড়া কর্পূরের মালা পরাইয়া দিয়া অচঞ্চল কণ্ঠে বলিল, "জগন্নাথ দেবের সেবাইত ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ; আপনার জীবন সফলতায় চির-গৌরবময় হোক।" বর নতমস্তকে নমস্কার করিল।

তারপরে আরও কঠিন হইয়া, আরো অসঙ্কোচে—অবগুন্ঠিতা বধূর হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া আর একগাছি কর্পূরের মালা জড়াইয়া দিতে দিতে ধীরে ধীরে, পরিষ্কার স্বরে বলিল, "এই ক্ষণধ্বংসী কর্পূরের মত—তোমাদের জীবনের সমস্ত মালিন্য লুপ্ত হয়ে যাক্, ভগবান জগন্নাথ দেবের নামে আশীর্বাদ করি, তোমরা শান্তিময় সুখে সুখী হও।"

বক্তার ললাটে গভীর স্নিগ্ধতার সহিত মহিমাময় বিজয়শ্রীর দীপ্ত জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল! মোহের দাসত্বের মুক্তি লাভে, আত্মজয়ের পূর্ণ সন্তোষে, মহা-পূর্ণতায় প্রাণ পূর্ণ হইয়া গেল। প্রসন্ন সার্থকতায় সারা জগৎ ভরিয়া উঠিল।

অপার্থিব শান্তির কিরণে সহসা চরাচর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে কি তৃপ্তি! কি আনন্দ! কি সুমহান জয়োল্লাস!

কণ্ঠস্বরে চমকিয়া বিস্ময় ব্যাকুলা ছবি অশ্রুসিক্ত অবনত দৃষ্টি তুলিয়া যখন কুণ্ঠিতভাবে বক্তার পানে তাকাইল, তখন সে গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছে! ছবি চিনিতে পারিল না, শুধু উদ্দেশে নমস্কার করিল। গাড়ী ছুটিয়া চলিল।

— —



রূপকথা

শান্তা দেবী

॥ ১ ॥

রাজা পুরুষোত্তমের প্রাসাদে আজ উৎসব লেগে গেছে। আজ কোজাগর পূর্ণিমা। লক্ষ্মীর বরপুত্রের চক্ষে আজ নিদ্রা নেই; তিনি সরস্বতীর শতদল আসন আজ শতহস্তে লুট করে এনেছেন। লক্ষ্মীর স্বর্ণভাণ্ডারের অজস্র সম্পদেও যে এ উৎসবের মাধুরী ফুটে উঠবে না, তাই শুভ্র পূর্ণিমা-রজনীকে আজ শুভ্র শতদল ও শেফালির মালায় সাজিয়ে তুলতে হবে।

ফুলে ফুলে প্রাসাদ-অঙ্গন ভরে উঠেছে; পূর্ণিমার চাঁদ শেফালিবনের সবুজ পাতায় আলোর হাসি ছড়িয়ে দিয়ে দূরে কাশবনের শুভ্র অঙ্গে জ্যোৎস্নার ধারা ঢেলে দিচ্ছে। শরৎলক্ষ্মী আজ কোমল কাশের মৃদু তালে-তালে শতহস্তে বিশ্ববাসীকে তাঁর উৎসবে ডাক দিচ্ছেন। রাজপুরীর যেখানে যে ছিল সবাই উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত। জরা যার মাথায় শরতের মেঘের মত শাদা পাগড়ী পরিয়ে দিয়েছে, সেও উৎসবের আনন্দে পাগল; আবার ধরণী যাকে সবে তার শ্যাম বাহু মেলে কোলে তুলে নিয়েছে, সেও ছোট কচি দুটি হাত মেলে উৎসবের আনন্দে যোগ দিয়েছে। বর্ষার জলধারায় স্নান করে গাছের মাথা যেমন সবল সতেজ হয়ে উঠেছে, যৌবনের স্পর্শে তরুণ-তরুণীরা তেমনি শোভন হয়ে উঠে উৎসবে প্রাণসঞ্চার করেছে।

যার যেমন বয়স সে তেমনি করেই তার উৎসব করবে। তাই কিশোরী কুমারীরা আজ তাদের সুন্দর হাতের নিপুণস্পর্শে রাজপুরী শ্রীমণ্ডিত করে তুলতে চায়। ফুলের স্তূপ যেখানে শুভ্র তুষার-পর্ব্বতের মত চাঁদের আলোয় গা ঢেলে পড়ে আছে, প্রজাপতির পাখার মত অসংখ্য বিচিত্র রঙের হাল্কা পোষাকে তরুণ তনুগুলি সাজিয়ে তারা সেইখানেই ভিড় করেছে। পলকে পলকে হাতে হাতে কত ফুলের মালা, অলঙ্কার, আসন, পাখা, ঝালর সব গড়ে উঠছে; কলালক্ষ্মী আজ যেন তাঁর সমস্ত নৈপুণ্য এই আনন্দ-প্রতিমাদের হাতে ঢেলে-দিয়েছেন।

পুরুষোত্তমদেবের সভায় নেপালরাজ্য থেকে এক শিল্পী তরুণ বয়সে এসে উদিত হয়েছিলেন। পাষাণে প্রাণের উচ্ছ্বাস ফুটিয়ে তোলাতেই তাঁর বিশেষ আনন্দ ছিল, কিন্তু তাই বলে নক্সা-কাটা, ছবি আঁকা, কি রঙের খেলা খেলানোতে যে তাঁর হাতযশ ছিল না, তা বলা যায় না। সেই শিল্পী বীরভদ্র যেদিন প্রথম এই রাজসভায় দেখা দিয়াছিলেন তখন তাঁর সঙ্গের সামান্য সরঞ্জামের মধ্যে একটি জিনিস ছিল, যাকে শিল্পীর কোন আনুষঙ্গিক জিনিস বলা চলে না, অধিকন্তু উপদ্রব বলা যেতে পারে। বীরভদ্রের কোলে ছিল একটি মাতৃহারা ছ মাসের কচি মেয়ে। এই মেয়েটিকে তাব তরুণ পিতা শিল্পলক্ষ্মীর চেয়ে কিছু কম ভাল বাসতেন না। জগতে ওই দুটিতেই তাঁর সমস্ত আনন্দ নিবিড় হয়ে ছিল। ওই দুটিকে এক করে দেখবার জন্যে বোধহয় তিনি তুলির ক্ষুদ্র লিখনের মত এই আনন্দ-কণাটির নাম রেখেছিলেন চিত্রলেখা। তবে চিত্রা নামেই সে পরিচিত। রাজসভায় আসন পেয়ে বীরভদ্র তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে চিত্রকলা ও চিত্রলেখার সেবায় লেগে গেলেন। বাহিরে রাজসভায় তাঁর যশগৌরব তাঁকে নিত্যই নূতন আনন্দ পরিবেষন করতে লাগল, ঘরে তাঁর চিত্রলেখা লোকের চোখের আড়ালে দিনে-দিনে চন্দ্রলেখার মত উজ্জ্বল হয়ে পিতার প্রাণ আনন্দময় করে তুলত।

বীরভদ্রের একান্ত ইচ্ছা ছিল, চিত্রা তাঁর মত শিল্পরসে অনুরক্ত হয়। সকল শিষ্যের চেয়ে যত্নে প্রাণের আগ্রহ দিয়ে চিত্রাকে শিক্ষা দিতেন। কিশোরী চিত্রার আশ্চর্য্য নৈপুণ্য দেখে রাজসভা স্তব্ধ হয়ে থাকত। শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা যখন বালিকা চিত্রার প্রশংসায় রাজসভা মুখরিত করে তুলতেন, তখন তরুণ শিল্পীদের প্রশংসমান চোখ বিস্ময়ে অবাক হয়ে তার প্রতিভাদীপ্ত মুখের দিকে স্থির তারকার মত চেয়ে থাকত, আর গর্ব্বে বীরভদ্রের মুখ রক্ত-পদ্মের মত রাঙা হয়ে উঠত। চিত্রার কিন্তু নিজের এ নৈপুণ্য দেখাবার বড় আগ্রহ ছিল না, সে চাইত নিভৃতে নিজের ঘরের নিরালা কোণে বসে মনের বিচিত্র কল্পনারাজি রেখা ও রঙের যোগে প্রাণময় করে তোলে আর তার সৌন্দর্য্যে আপনি বিভোর হয়ে থাকে, কিন্তু তার পিতার সকল আনন্দ, সকল গর্ব্বের আধার যে শুধু সেই; তাই তাঁর আনন্দের একটি কণাও পাছে খসে পড়ে, এই ভয়ে সে সর্ব্বদা তাঁর মন জুগিয়েই চলত। কিন্তু যতটুকু দরকার তার বেশী বড় কেউ তাকে করতে দেখেনি। তার কথাও বড় বেশী কেউ শোনেনি। তার গলার স্বর বীণার ঝঙ্কারের মত মধুর কি জলকল্লোলের মত গম্ভীর তা' তার মুগ্ধ পূজারীর

দল জান্‌ত না। হৃদয় তার পাষাণের মতন কঠিন কি কুসুমের মতন কোমল তার পরিচয় এক প্রৌঢ় বীরভদ্র ছাড়া বড় কেউ জান্‌ত না। তবে তার উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টির আড়ালে কেমন যে সর্ব্বগ্রাসী অগ্নির মতন একটা প্রদীপ্ত ভাব সকলের চোখেই পড়্‌ত।

কোজাগর পূর্ণিমার উৎসবের দিনে তরুণীদের ফুলের মেলায় চিত্রার আসন ছিল সকলের আগে। তার আঁকা নক্সা, তার গাঁথা মালা দেখেই সকলে সেদিন উৎসব-সজ্জা শোভন করতে নেমেছিল। চিত্রা নিজের হাতে তৈরী করেছিল একটি ফুলের দোলা। দোলার আসনে আর দুই পাশের বাঁধনে গুচ্ছ-গুচ্ছ ফুল বিচিত্র ভঙ্গিতে মাথা হেলিয়ে রূপের পশরা খুলে দুল্‌ছিল। প্রতি বৎসর শারদ পূর্ণিমায় রাজকুমার বিক্রমদেব নিজের হাতে এই দোলা নদীর ধারের ঘন নিমগাছের ডালে ঝুলিয়ে দিতেন। এ কাজে চিত্রাই তাঁর সহায়। আর সব ফুলের খেলায় চিত্রা কেবল সঙ্গীদের উপদেশ দিয়ে দিত; এ কাজটায় কিন্তু সে আর কাউকে হাত দিতেও দিত না। যশগৌরবের জন্য তাকে কেউ কোনো দিন লালায়িত হতে দেখেনি; তার হাতের কাজ সুন্দর কি অসুন্দর এ বিষয়ে কোনো কথা শুনতে এতটুকু আগ্রহও সে কখনও দেখায়নি। কিন্তু সমস্ত বৎসরের মধ্যে একটি দিন সে যে প্রাণভরা আগ্রহ দিয়ে কাজ করত, সে তার শিল্পদেবতার তুষ্টির জন্য নয়, নিজের সৌন্দর্যতৃপ্তির জন্য নয়, সে শুধু গর্ব্বভরা মুখে একজনের অতি নিকটে দাঁড়িয়ে তার হাতে হাতে এই শিল্পরচনাটিকে তুলে দেবার জন্য, আর প্রতিদানে একবার তার প্রশংসমান হাসিভরা দৃষ্টিলাভের জন্য। সারা বৎসর চিত্রা তার প্রিয়কে স্বর্গের দেবতার মত দূর থেকেই প্রণাম করে। কেবল বৎসরান্তে একটি দিনের মত এই দেবতা মর্ত্ত্যের পূজারিণীকে তাঁর প্রসন্ন হাস্যে ধন্য করে দিয়ে যেতেন। এই নিমেষের দানে তিনি যা দিয়ে যেতেন তাই ছিল চিত্রার সারা বছরের খোরাক।

বর্ষার-জলভারে ভৈরবী নদীর দু কূল ছাপিয়ে-উঠেছিল, শরৎকালেও তার উচ্ছ্বাস কমেনি। পূর্ণিমায় নদীর জল যখন ফুলে-ফুলে দুলে-দুলে উঠছিল, আর চাঁদের আলো ঢেউয়ের মাথায় আছ্‌ড়ে পড়ে হীরার কণার মত হাজার টুক্‌রো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল, ঠিক সেই সময়ে নদীর বাঁকের কাছের সেই ঝাঁক্‌ড়া-মাথা ঘন নিমগাছটার তলায় মহা ভিড়। এ-রাজ্যে আজ কত বছর ধরে যে ওই বুড়ো নিমগাছটার তলায় তরুণী কুমারীদের নূপুর প্রতি শরতে মধুর নিক্কণ তুলে আস্‌ছে, আর কত রাজকুমার তার ওই প্রকাণ্ড হেলানো ডালটায় ফুলের দোলা

টাঙিয়ে সুন্দরী-শ্রেষ্ঠাকে লক্ষ্মীর সম্মান দিয়ে দোল দিয়েছেন, তার হিসাব বোধহয় এক ওই বুড়ো নিমগাছটাই রাখে। তাকে ঘিরে তরুণ প্রাণের এ আনন্দ-উৎসব তার যৌবনকাল থেকেই হয়ত চলে আসছে, তাই তাদের স্পর্শে আজও সে প্রতিবৎসরে নব যৌবনের সঞ্চারে বৃদ্ধ বয়সেও পুলকিত হয়ে ওঠে! হিন্দোলের দোলাও বর্ষায়-বর্ষায় তারি শাখায় আনন্দে দোল দেয়। যাকে ঘিরে চির-চঞ্চলদের চপলতা চলেই আসছে, সে স্থবির হয় কি করে।

কুমার বিক্রম যখন তাঁর বলিষ্ঠ বাহুর সমস্ত জোর দিয়ে দোলার দড়িটা গাছের ডালের দিকে ছুঁড়ে দিলেন, দোলার ফুল-সাজটা তখন চিত্রার হাতে। চিত্রা তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। দড়িটা ঘুরে নেমে আসতেই তার দু'টো মুখ সমান করবার জন্য বিক্রম সজোরে এক টান দিলেন। কি জানি কেন আজ এ-আনন্দের আঘাত বুড়ো নিমটার সইল না! তার এত কালের বাঁকা ডালটা আজই মড়মড়িয়ে ভেঙে গেল। নদীর বাঁকের ঢেউয়ের ঘা খেয়ে-খেয়ে সেখানে গাছের পাশে জমি খুব কমই ছিল। রাজকুমার নিজের টানের জোর সামলাতে না পেরে ডালটা সঙ্গে নিয়ে ঘুরে নদীর গর্ভেই পড়লেন। প্রকাণ্ড ডালটা ঠিক তাঁর মাথার উপরে এসে পড়ল। কালো জলের মধ্যে সব যেন অন্ধকার হয়ে গেল। গাছতলার ওই ভিড়ের মধ্যে আর দ্বিতীয় পুরুষ নেই। কুমারকে তোলে কে? ওই প্রচণ্ড আঘাতের পর নিজে ওঠবার ক্ষমতাও তাঁর নেই। কিশোরী কুমারীদের কলকণ্ঠের কোলাহলই বা তখন শোনে কে? তাঁদের ক্ষীণ বাহুতেও এত শক্তি নেই যে বিক্রমের বিশাল শরীর টেনে তোলেন। চিত্রা কিন্তু এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার দীর্ঘ দেহে বলের অভাব ছিল না, সুপুষ্ট বাহুতেও শক্তি যথেষ্ট। পাহাড়ী মেয়ের রক্তের জোর তার শরীরে আজও ছিল। ডালপালা ঠেলে দুই হাতে জল কেটে সে চারদিকে বেড় দিয়ে একবার দেখে নিল। তারপর যখন একডুব দিয়ে সে উঠে এল, তখন গাছের ডালের ছড় লেগে তার হাত পা সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত, কঠিন পরিশ্রমে মুখখানা সিঁদুরের মত রাঙা, সাধের উৎসব-সজ্জা ছিন্ন ভিন্ন বিবর্ণ, কিন্তু দৃঢ়মুষ্টিতে সে কুমারের অবশ দেহ ধরে আছে।

॥ ২ ॥

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। রাজপুরীর ঘরে-ঘরে দাসীরা প্রদীপ জেলে দিয়ে গেল। সন্ধ্যাবন্দনার শঙ্খ আজ ভয়ে-ভয়ে বাজছে। রাজকুমার আজ দশদিন

পীড়িত, তাই দাসদাসী সকলের কাজকর্ম চলাফেরা কেমন যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

হাতীর দাঁতের উপর সোনার পাতের নক্সাকাটা উঁচু পালঙ্কে ধপ ধপে শাদা বিছানায় রাজকুমার শুয়ে আছেন। মাথার কাছের খোলা জান্‌লা দিয়ে মন্দ সমীরণ শিউলির গন্ধে ঘর মাতিয়ে তুল্‌ছে। চিত্রা সেই রাজকুমারের সেবায় ব্যস্ত। হাতে ছোট্ট একটি সোনার বাটিতে চন্দন, চিত্রা থেকে-থেকে বিক্রমের কপালে চন্দনের প্রলেপ দিচ্ছে। তার দুটি হাতই কাজে নিযুক্ত; হাতে জড়ানো এলোচুলের খোঁপা খসে পড়্‌ছে। চিত্রা হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মাঝে-মাঝে চুলগুলো ঠেলে দিচ্ছে, কিন্তু তাদের সংযত কর্‌তে পার্‌ছে না। তার বাসন্তী রঙের শাড়ীর আঁচলখানা উড়ে-উড়ে রাজকুমারের গায়ে এসে পড়্‌ছিল, আবার আপনি সরে যাচ্ছিল।

চিত্রা দেখ্‌ছিল, আজ সকাল থেকেই বিক্রমের মুখে মাঝে-মাঝে চেতনার ভাব ফুটে উঠ্‌ছে। তার আশা হচ্ছিল, আজ তার সেবা, তার প্রতীক্ষা, সবই ধন্য হবে। আনন্দে তার সে আগুনের মত দৃষ্টিও আজ কোমল হয়ে এসেছে। তার চোখ টল্‌টল কর্‌ছিল, পাছে কুমারের মুখে তার চোখের জল পড়ে তাই বার বার মুখখানা ঘুরিয়ে সে জান্‌লার বাইরে তাকিয়ে দেখ্‌ছিল। প্রশস্ত নীল আকাশ তখন শূন্য, এক কোণে কেবল একটি তারা উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ছিল। ক্রমে উপরের মেঘ নেমে নেমে তারাটিকে তার কালো কোলের নিবিড় আঁধারের মধ্যে লুকিয়ে নিলে। শূন্য গগনের একটি তারার মত একটি আশার শিখা চিত্রার শূন্য মনে উর্দ্ধমুখী হয়ে জ্বল্‌ছিল, কিন্তু মেঘের ভয় সে কাটাতে পারেনি। শরৎ-কালের ফুলে-ভরা শিউলির ডাল যেমন একটু নাড়া পেলেই সব কটি ফুল উজাড় করে গাছতলায় ঢেলে দেয়, চিত্রার হৃদয়ও তেমনি উন্মুখ হয়ে ছিল, একটু নাড়া পেলে সে আজ তার পূর্ণডালি বিক্রমের চরণে শূন্য করে সঁপে দিয়ে যাবে। কিন্তু যদি সে স্নেহের পরশ না পায়?

ধীরে কুমারের চোখ খুলে এল! চন্দনপাত্র নামিয়ে রেখে, এলোচুল জড়িয়ে নিয়ে, চিত্রা তাড়াতাড়ি তাঁর দিকে এগিয়ে গেল। বিক্রমের দৃষ্টি তখনও অর্থশূন্য। কোনো মানুষ কি জিনিসের ছায়া তাঁর চোখে যে পড়েছিল এমন মনে হয় না; চিত্রা দীনা ভিখারিণীর মত তাঁর মুখের বাণীর কাঙাল হয়ে সেই সুন্দর পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মেঘে যখন আকাশ ঢেকে গেছে, ঘরের সোনার প্রদীপ জালিকাটা ঢাকার

আড়াল থেকে আলোর ফোঁটা ছড়াচ্ছে, এমন সময় কুমার একটু সরে এসে বল্‌লেন, "কে তুমি, মালতী না বিজয়া? কথা কও না যে? আমি এ কোথায় রয়েছি?"

চিত্রা অতি ধীরে উত্তর দিল, "আমি চিত্রা।"

বিক্রম একটু বিস্মিত হয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, "চিত্রা বলে' কোনো দাসীকে ত মনে পড়ছে না! শিল্পী বীরভদ্রের কন্যা এক চিত্রা আছে বটে!"

চিত্রা মুখখানা রাঙা করে বল্‌লে, "আমিই সেই চিত্রা।"

"তুমি এখানে কেন? আমি কি তোমাদের বাড়ী রয়েছি না কি? আশ্চর্য্য ত!"

"আপনি ভৈরবীর জলে পড়ে গিয়েছিলেন, পূর্ণিমার উৎসবে দোলা টাঙাচ্ছিলেন মনে নেই? সেখানে আর লোকজন পাওয়া গেল না, তাই আমিই আপনাকে জল থেকে তুল্‌তে......"

বিক্রমের মুখে কিসের যেন একটা ছায়া খেলে গেল "বুঝেছি" বলে তিনি চুপ করে রইলেন।

চিত্রা রূপার বাটিতে করে সুগন্ধি সরবৎ কুমারের মুখের কাছে এনে ধর্‌ল। কুমার পান করে আবার নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে রইলেন। তাঁর মুখ দেখে চিত্রার মনে হচ্ছিল, আনন্দের আভায় পাণ্ডুর মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এতটুকু প্রদীপের আলোতে যেমন প্রকাণ্ড ঘরের সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে যায়, ওইটুকু আনন্দের দীপ্তি দেখে চিত্রার নিরাশ মনও তেমনি আশায় ছাপিয়ে উঠেছিল। স্বর্গের দেবতা আজ তার পূজায় প্রসন্ন হয়েছেন, আর তার চাইবার কি আছে, ভাব্‌বারই বা কি আছে? সমস্ত ভবিষ্যৎ আজ আনন্দময়; আর সে দীনা ভিখারিণী নয়, শ্রেষ্ঠা পূজারিণী। দেবতার বর এখনি সহস্র ধারায় ঝরে পড়্‌বে; তার ক্ষুদ্র হৃদয়পাত্রে এত দান সে কোথায় রাখ্‌বে?

রাজকুমার ঘণ্টা দুই পরে আবার চোখ মেলে বললেন, "চিত্রা শোন, আজ আমার বড় আনন্দের দিন। আজ আমার অনেক কথা বল্‌বার আছে। তুমি শুন্‌বে কি?"

চিত্রা মুগ্ধ দৃষ্টিতে কুমারের মুখের দিকে চেয়ে সরে এসে তাঁর পায়ের কাছে বস্‌ল। আনন্দে তার মুখ দিয়ে কথা সর্‌ছিল না। বিক্রমদেব বল্‌লেন, "জানো চিত্রা, আজ কোজাগর পূর্ণিমার রাত্রে আমি কি পেয়েছি? আমি স্বপ্নে দেখ্‌লাম, কোজাগরের লক্ষ্মী আমার জাগরণ সার্থক করেছেন, তিনি মুক্ত কেশে

স্বর্ণভাণ্ড হাতে আমারি শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছেন, ধানের শীষ যেমন মৃদু বাতাসের ঘায়ে দুলে-দুলে ওঠে, তাঁর স্বর্ণাঞ্চল তেম্‌নি দুলে-দুলে আমার অঙ্গ স্পর্শ করে গেল। তাঁর চির-উজ্জ্বল দীপ্তি জ্যোৎস্না-রাত্রের গগনভরা আলোর তলায় আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি নত হয়ে আমার ম্লান ললাটে নিজ হাতে জয়টীকা এঁকে দিয়ে গেলেন। সে পুণ্যকরস্পর্শে আমার আঁধার জগৎ শত সূর্য্যের আলোয় আলো হয়ে উঠল।"

শুন্‌তে শুন্‌তে চিত্রার প্রাণ পুলকে নেচে উঠ্‌ছিল; সে ভাব্‌ছিল সে লক্ষ্মী কে? এখনি শুন্‌বে, আর দেরী নেই।

বিক্রম আবার বল্‌লেন, "ক্লান্ত মুদিত নয়ন মেলে কি দেখ্‌লাম জানো?"

চিত্রা উন্মুখ হয়ে উঠ্‌ল। বিক্রম বল্‌লেন, দেখ্‌লাম আমার সে লক্ষ্মী আর নেই; চারিদিকে শুধু শূন্য। কিন্তু আজ পূর্ণিমার দিনে আমার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করে একটি বাণী বাজছে 'লক্ষ্মী লাভ হবে, লক্ষ্মী লাভ হবে' কিশোর বয়স হতে যে রূপমাধুরী ধ্যান করে এসেছি, সে আমার কল্পনারই সৃজন, কল্পলোকেই সে সুন্দরীর বাস। আজ তাকে প্রত্যক্ষ দেখেছি; আমার এ স্বপ্ন ত প্রত্যক্ষ দেখাই। আজ আমার সাধনা পূর্ণ হয়েছে; সিদ্ধি, আমারি সে মানসীর হাতে; আমি তা লাভ করবই। জ্যোতিষী গোপালভট্ট আমায় আজ সাত বৎসর ধরে বলে আসছেন,—লক্ষ্মী প্রসন্ন হলে স্বপ্নে তোমায় স্বহস্তে টীকা দিয়ে যাবেন। সেই দিন থেকে এক বৎসরের মধ্যে তুমি তোমার মানসী সুন্দরীকে লাভ করবে। ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার সে বাণী আজ সার্থক হয়েছে। তাই আনন্দে আমি অধীর হয়ে উঠেছি। এ পৃথিবীতে আমার চক্ষে আর কোনো দুঃখ কোনো দৈন্য নেই। সব আজ মধুময়। কার কি দুঃখ আছে বল; আমি মুক্তহস্ত; সর্বস্ব দিয়ে সকলের অভাব মোচন করে দেবো। আমি যেদিকে তাকাব সেই দিকেই আনন্দ-উৎসব দেখ্‌তে চাই। তুমি আমার প্রাণরক্ষা করেছ, তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা সকলের চেয়ে বেশী। বল কি চাও, রাজভাণ্ডার লুটিয়ে আমি তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর্‌ব; তোমার কোনো খেদ রাখ্‌ব না। ধন, জন, মান, যশ কি চাও বল? কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে তোমার চিরঅনুচর করে দেবো বল? তোমা হতেই আমার সব, তুমি কিসে তুষ্ট হবে তাই বল।"

চিত্রা যে কি চায়, এর পরে তা আর সে কি করে বলে? যে তারি হাতে সব পেয়েছে বলে নিজ মুখে স্বীকার করছে, তার এ পরিপূর্ণ আনন্দের দিনে চিত্রার সব আনন্দ আঁধারে তলিয়ে গেছে। তার আশার আলো এ আনন্দের

ঝোড়ো হাওয়ার বেগ সাম্‌লাতে না পেরে প্রথম ফুৎকারেই নিবে গেছে। এ ঘোর অন্ধকারে আলো আর কেউ জ্বালাবে না। চির অন্ধের মত এইখানেই তাকে হাত্‌ড়ে বেড়াতে হবে; যদি কোনো দিন প্রদীপে হাত ঠেকে যায়, যদি কোনো দিন আর-কারো আলোক-শিখায় ঠেকিয়ে তার আলোটিও জ্বালিয়ে নিতে পারে। জগৎটা আশ্চর্য্য বটে! যে দুটি মানুষের জীবন-সূত্র এমন করে জড়িয়ে আস্‌ছিল, যাদের একজনের সুখ-দুঃখই আর একজন অম্লান বদনে নিজের সুখদুঃখ করে নেবে বলে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে ছিল, কোথাকার কি একটা সামান্য আঘাতে দেখা গেল তারা দুজনে যেন বিপরীত গতিতে ঘুরে চলে গেল। বিক্রমের জগৎ আজ আনন্দময় বলেই ত চিত্রার জগৎ চির-অন্ধকার।

চিত্রা কিছুক্ষণ পরে উত্তর দিলে, "আমি দরিদ্র শিল্পীর কন্যা, রাজ-ভাণ্ডারে আমার আর চাইবার কি আছে? আপনার সেবা করবার সুযোগ আর অধিকার পেয়েই আমি ধন্য। আর কিছু আমি চাই না। শুধু আশীর্ব্বাদ করবেন যেন আমার এত দিনের শিল্পশিক্ষা সার্থক হয়। আমি যা চাই, তার হাতেই তা পাব।"

কুমার বল্‌লেন, "তোমার শক্তি অক্ষয় হোক। শিল্পের অপূর্ব্ব সৃষ্টি যেন তোমারি হাতে গড়ে ওঠে।"

চিত্রা নীরবে রাজকুমারকে প্রণাম করে সরে দাঁড়াল।

প্রায় এক বৎসর ধরে রাজকুমার বিক্রম তাঁর মানসীর সন্ধানে ফিরছেন। দেশ বিদেশে ঘুরে ঘুরে কুমারের অনুচর আর দূতদের পা ক্ষয়ে যাবার জো হয়েছে। বেচারা জ্যোতিষী গোপালভট্ট ত খড়ি পেতে পেতে হাতে কড়া পড়িয়ে ফেলেছেন। আর স্বয়ং কুমার ত আজ এক বৎসর ধরে লক্ষ্মীর আশায় নিশিপালন করছেন। নিদ্রাদেবীর সঙ্গে যে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর সতীন সম্পর্ক তা বোধ হয় ইতিপূর্বে কেউ কোন দিন মনে করেনি। বিক্রমের ঘরে লক্ষ্মীস্বরূপাদের অজস্র চিত্র গড়াগড়ি যাচ্ছে। তাঁদের এ অনাদর স্বচক্ষে দেখ্‌লে বিক্রমকে যে তাঁরা কত বড় অভিসম্পাত করতেন তা বলা যায় না।

চিত্রা এখন আর কুমারের দর্শনের আশায় ফেরে না। বিমুখ দেবতাকে প্রসন্ন করবার ব্যর্থ চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে সে বোধ হয় এখন কলালক্ষ্মীর সেবাতেই তার তরুণ হৃদয়ের সমস্ত সম্পদ ঢেলে দিয়েছে। গুটিপোকা যেমন অন্ধকারে কোটরের

মত গুটির মধ্যে বন্দী হয়ে বসে একদিন প্রজাপতির বেশে অজস্র সৌন্দর্য্য নিয়ে আলোর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, চিত্রাও তেমনি করে তার নির্জন কুটীরের কোণে বসে সৃষ্টি-রচনায় মগ্ন হয়ে দিন কাটাচ্ছে, কি গোপনে তার পুরাতন প্রিয়ের উদ্দেশ্যে অশ্রুজলের নৈবেদ্য সাজাচ্ছে তা কে জানে?

তখন বর্ষাকাল। রাজপ্রাসাদের বাঘমুখো নল দিয়ে ছাদের জল সারা-দিনরাতই গড়িয়ে-গড়িয়ে পড়ছে। বাঁধানো সানের উপর নলের জল পড়ে খই ফোটার মত ছট্-ছট্ শব্দে চারিদিক ধ্বনিত করে তুলছে। বাদল দিনে রাজকুমারের এ দীর্ঘ প্রতীক্ষা অসহ্য হয়ে উঠেছে। তিনি কোলের কাছে সাতরাজ্যের রাজকন্যা মন্ত্রীকন্যাদের ছবি জড়ো করে মেঘলা আকাশের গুরু গম্ভীর চেহারার দিকে তাকিয়ে ভাবছেন—জ্যোতিষীর বাক্য বুঝি বৃথা হয়ে গেল; কই আজও ত সে লক্ষ্মীস্বরূপার সন্ধান পেলাম না। মিথ্যা, সবি মিথ্যা। সে স্বপ্ন, স্বপ্নের মতই ফাঁকা। এ ছলনায় ভুলে থাকা পুরুষের পক্ষে শোভা পায় না।

ভাবতে ভাবতে রাত অনেক হয়ে গেল। কুমারের অজ্ঞাতে কখন্ বৃষ্টিধারার উন্মত্ত নৃত্য থেমে গেছে; মেঘের ঘোমটা ঠেলে কৃষ্ণপক্ষের বাঁকা চাঁদ বৃষ্টির জলে নিজের মুখের বিকৃতি দেখে হেসে কুটিকুটি হচ্ছেন। বিক্রমের মনে হ'ল দূরে কোথায় যেন কে বীণার ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, বর্ষার বিরহ-গাথা বীণার তারে তারে গভীর স্বরে ধ্বনিত হয়ে উঠল। সে বিরহ-গাথায় কত গোপন-দুঃখের অশ্রু যেন সুর ধরে ফুটে উঠছে। কুমার ভেবেই পেলেন না, এমন গভীর রাত্রে কে বীণার তারে তার প্রাণের কথা গেয়ে গেল। দিনের আলো কি তার গানে কান দিত না? তাই স্তব্ধ উৎকর্ণ রাত্রির দরবারে এমন অপূর্ব সঙ্গীত সৃষ্টি?

শেষরাত্রের রঙীন নেশা কাটতে-না-কাটতেই বীণা থেমে গেল। ভোরের বেলা কুমারের দূত অনেক খোঁজ করেও কিছু খবর দিতে পারলে না। সেদিন রাত্রেও আবার বাঁশীর মন-ভুলানো সুর কাকে যেন ডেকে-ডেকে প্রাসাদের চারিদিকে ঘুরে ক্রমে ক্রমে দূরে অতিদূরে সরে গিয়ে বনের ধারে মিলিয়ে গেল। তারপর আবার সেই বীণার ঝঙ্কার। পাঁচ দিন সাত দিন এমনি ভাবেই চলল। কুমার বললেন, আসছে রাত থেকেই এর খোঁজ নিতে হবে।

একদিন দূত এসে খবর দিলে, পুরানো শিবমন্দিরের পিছনে শালবনের গায়ের

কাছে মহারাজের প্রপিতামহ যে বিদেশিনী ভুবনমোহিনী রাজকন্যার জন্যে গোলকধাঁধার মত বাড়ী করেছিলেন, সেই বাড়ীর ঘরে-ঘরে, বন্দিনী কুমারীর জীবিতকালের মত আবার আলোর মালা ফুটে উঠেছে। সেখানে না জানি আবার কোন্ সুরসুন্দরীর আবির্ভাব হয়েছে, যে-সে লোকে যে সেখানে প্রাণ ধরে ঢুকবে তা ত মনে হয় না। ঘরে কি শুধু কেবল আলোর ছটা?—ধূপের গন্ধে শালবন ভরে উঠেছে। আর ফুলের সুবাস ত কোণে-কোণে। মানুষ কিন্তু বড় দেখা যায় না। তবে অলঙ্কারের মৃদু ঝঙ্কার যেন এক-একদিন কানে আসে বলে মনে হয়। নূপুর-পায়ে মাঝে-মাঝে কে যেন চঞ্চল চরণে ঘুরে বেড়ায়। তার হাতের কাঁকণও যেন মাঝে-মাঝে অধীর হয়ে বেজে ওঠে। কিন্তু সারা দিনরাতের মধ্যে এই ক্ষণিক সাড়াগুলি এত অল্প মেলে যে কেউ আছে কি না তা ঠিক করে বলা শক্ত।

কুমার বল্লেন, "আমি দেখ্‌ব কিসের এ মায়াজাল।"

দূত বল্‌লে, "দিনের বেলা কিন্তু বাড়ীর চারিদিক বন্ধ থাকে, ঠিক যেন সেই পুরাকালের কারাগার দুঃখিনী রাজ-কন্যার কঠিন কারাবাসের কথা মৌন মুখে আজও জানিয়ে দিচ্ছে। রাত্রি না হলে সে অপ্সরার নিকেতনের আভা মিল্‌বে না।"

কুমার তাইতেই রাজি।

মাঝরাত্রি অনেকক্ষণ উৎরে গেছে। দূরে শালবনের পাশে সেই পোড়ো বাড়ীটার মধ্যে আজও বাণা বেজে উঠ্‌ল। কুমার পথে বেরিয়ে পড়্‌লেন। বুড়ো নিমগাছটার আড়াল থেকে চাঁদের আলো পথের মাঝে আলোর ডোরা কেটে দিচ্ছিল। সেই ঝাপ্‌সা আলোয় কষ্টে পথ দেখে কুমার বিক্রম বন্দিনী রাজ-কন্যার বাড়ীর পাশে এসে পৌঁছলেন। এ-পথে কতকাল যে লোক চলেনি তার ঠিকানা নেই। কুমার বীণার শব্দ লক্ষ্য করে অপথ কুপথ দিয়ে কোনো-রকমে সেই বীণাবাদিনীর জান্‌লার তলাতেই এসে পড়েছিলেন। শত বৎসর ধরে শীতের আগমনে গাছের পাতা ঝরে-ঝরে সেখানে পৃথিবীর শ্যাম-অঙ্গ একেবারে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। একে ত রাজার ছেলে, অন্ধকারে পথচলা কোনো কালেই অভ্যাস নেই, তার উপরে ঝরা পাতার স্তূপে হঠাৎ এসে পা দেওয়া। শুক্‌নো পাতা আর ডালপালার মড মড় শব্দে সুরমুগ্ধার সুরের নেশা টুটে গেল বোধ হয়। হঠাৎ দেখা গেল একরাশ খোলা চুল আর একখানা সোনালি আঁচল দুলিয়ে কে যেন এসে জান্‌লাটা টেনে বন্ধ করে দিলে। তার মুখ দেখা গেল না,

দেখা গেল শুধু হীরার কঙ্কণ-পরা একখানা গৌর হাত। ঘরের প্রদীপের উজ্জ্বল আলোয় হীরার কাঁকণ ঝল্‌সে উঠ্‌ল। জান্‌লা বন্ধ হয়ে যেতেই ভাঙা প্রাসাদ আবার তেমনি চিরকালের মত অন্ধকার। আশায়-আশায় অপেক্ষা কর্‌তে কর্‌তেই কাক কোকিল জগৎকে জাগরণের বার্ত্তা জানিয়ে দিলে। অগত্যা কুমারকে রুদ্ধ দরজার বাহির থেকেই ফির্‌তে হল।

পরদিন প্রায় ভোর রাত্রে আবার বনের বীণার তারে বিচিত্র রাগিণী ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল! সে-সুরের টানে কুমার আপনি পথে এসে নাম্‌লেন। আজ কিন্তু জান্‌লার পাশে এসে দাঁড়াতে বীণার সুর ভঙ্গ হল না। বীণা-বাদিনী সুরের মোহে মুগ্ধ হয়ে আপন মনে ঝঙ্কার দিয়েই চলেছেন। খোলা জান্‌লার উল্টাদিকে দেয়ালের গায়ে ডানা মেলে রূপার পরী উড়্‌তে-উড়্‌তে শিকলে বাঁধা পড়ে আছে। তার দুই হাতে দুটা আর মাথায় একটা সোনার প্রদীপ। তিনটি প্রদীপের আলোই সুন্দরীর মুখে এসে পড়েছে। তিনি পাশ ফিরে বসে আছেন। কোলের উপর বীণা নিয়ে মুখ নীচু করে বাজিয়ে চলেছেন। শুধু আধখানা মুখ দেখা যাচ্ছে। সুন্দরীর মুখের রঙে প্রদীপের আলো যেন লজ্জায় ম্লান। ভ্রমরকৃষ্ণ চুলের মাঝখানে সোনার পদ্মের মত মুখখানি দেখে কুমারের ইচ্ছা কর্‌ছিল ছুটে গিয়ে তার মুখখানা সোজা করে ধরে একবার দেখেন। কিন্তু সেখানে পৌছানো তাঁর সাধ্যের বাইরে। কুমার দুই পায়ে ডালপালার উপর চাপ দিয়ে খড়-খড় শব্দ করে বীণার বাজ্‌নায় ব্যাঘাত করবার চেষ্টা করলেন। আজ কিন্তু বীণা থাম্‌ল না, সুন্দরী নিমেষের জন্যও চোখ তুলে তাকালেন না। আর একদণ্ড কাট্‌তে না কাট্‌তেই সূর্য্যের প্রথম রশ্মি ফুটে উঠল। অমনি ঘরের আলো কার আঁচলের ঘায়ে নিবে গেল। বীণাও তখন নীরব হল। কুমারের মনে হল অন্ধকারে তাঁর মনোমোহিনী উঠে দাঁড়িয়ে জানালা বন্ধ করে দিলেন। তরুণীর ক্ষীণ দীর্ঘ তনু ছায়ার মত দেখা গেল, মুখ অন্ধকারে অস্পষ্ট। আজ প্রাসাদ থেকে আস্‌বার সময় কুমার একখানা লিপি লিখে এনেছিলেন, "অয়ি অপরিচিতা, নিমেষের তরে আমি তোমার দর্শনভিখারী। মুগ্ধ ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করবে কি?" জান্‌লার কাছে লিপিখানা রেখে কুমার সেদিনও বাড়ী ফির্‌লেন।

তৃতীয় দিন যখন কুমার তাঁর তীর্থস্থলে এসে উপস্থিত, তখন জান্‌লা বন্ধ। তাঁর পায়ের শব্দেই সশব্দে জান্‌লা খুলে গেল। কুমার মুখ তুলে চেয়ে দেখেন কপাটের গায়ে একখানা হাত রেখে হাসিভরা মুখে উজ্জ্বল চোখ মেলে সেই

অনিন্দিতা সুন্দরী দাঁড়িয়ে। অসংখ্য রত্ন-অলঙ্কারে তাঁর দেহ সুসজ্জিত। অমন ভুবনমোহন রূপ কুমারের চোখে ত কোনো দিন পড়েই নি, স্বপ্নে তিনি যে সুর-সুন্দরীকে দেখেছিলেন, তার রূপও এর কাছে অতি ম্লান। কিন্তু এ কি হল ? কুমার নির্ব্বুদ্ধির মত নিমেষের দেখা চেয়েছিলেন বলেই কি চোখের পলক পড়্‌তে না পড়্‌তে তাঁর তৃষিত দৃষ্টিকে অবহেলা করে সুন্দরীর ঘরের জান্‌লা বন্ধ হয়ে গেল ! ব্যথিতচিত্তে কুমার সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। উপর থেকে ছবির মত সুন্দর একখানা লিপি তাঁর উষ্ণীষে এসে পড়্‌ল ; চেয়ে দেখ্‌লেন হীরার কঙ্কণ-পরা সেই বিদ্যুৎবরণীর হাতখানা জান্‌লার এতটুকু ফাঁকের মধ্যে মিলিয়ে গেল। লিপিখানায় লেখা ছিল, "তৃপ্ত হয়েছ কি ? আর কি চাই ?" কুমার ডেকে বললেন, "তোমার দর্শন-সুখ চাই।" সেদিন কিন্তু তাঁর আশা মিটল না।

পরের রাত্রে বর্ষার বারিধারা অবিশ্রাম ঝর্‌ছিল। কুমার সেই দুর্য্যোগে পথ-হারা পথিকের মত ঘুর্‌তে-ঘুর্‌তে সুন্দরীর দ্বারে এসে দাঁড়ালেন। দেখ্‌লেন একখানা উঁচু পালঙ্কের উপর জান্‌লার দিকে মুখ করে নিদ্রিতা সেই ভুবন-মোহিনী। কালো চুল রেশমের গোছার মত পালঙ্কের গা দিয়ে লুটিয়ে পড়েছে। হীরার কাঁকণ-পরা হাতখানি বুকের উপর লতার মত লতিয়ে আছে, আর একখানা হাত অলসভাবে মাথার তলায় পড়ে। শিয়রে দাসী পিছন-ফিরে বসে মুক্তার ঝালর-দেওয়া পাখায় মৃদু বাতাস দিচ্ছে। জলের ঝাপ্‌টায় কুমারের চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে আস্‌ছে ; তিনি বারবার চোখ মুছে, সেই স্থির সৌদামিনীর রূপমাধুরী দেখ্‌ছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন আকাশ ছেড়ে চাঁদের পাশ থেকে রোহিণী আজ খসে এসে পৃথিবী আলো করছেন। ভোর হতেই বৃষ্টি থেমে এল, বাণাবাদিনীর দাসী বাঁ-হাতখানা বাড়িয়ে জান্‌লার কপাট বন্ধ করে দিলে। কুমার আজ তাঁর মনের কথা সোনার অক্ষরে লিখে এনেছিলেন। সেই লিপি জান্‌লায় রেখে চলে গেলেন।

সারাদিনটা কাটলে তবে আবার রাত আস্‌বে, সেই ভাবনায় দিনটা কুমার কিছুতেই কাটিয়ে উঠ্‌তে পারছিলেন না। সময়ের চঞ্চল পাখায় আজ যেন কেউ হিমাচল পর্ব্বতের ভার ঝুলিয়ে দিয়েছে। গতি আজ তার বড় মন্থর। রাজপ্রাসাদে বন্দীরা আজ যেন এক এক যুগ পরে প্রহর ঘোষণা করছে। সন্ধ্যায় বৈতালিকের গান আজ কি আর প্রাণ আনন্দে মাতিয়ে দেবে না ? সূর্য্যদেবেরও আজ কি হয়েছে, তাঁর মুখের হাসি কিছুতেই শেষ হয় না, বর্ষার ঘনমেঘও আজ তাঁর মুখে অন্ধকারের আবরণ এনে দেয় না।

যেমন করেই হোক দিন যখন কাট্‌বেই, তখন একরকমে কেটে গেল। প্রাসাদের স্বর্ণচূড়া অস্তমান সূর্য্যের বিদায়চুম্বনে এমন মধুর হাসি বোধ হয় আর কোনোদিন হাসেনি। কুমারের হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রী আজ সে হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

রাত্রির আগমনের সঙ্গেই কুমারের বরসজ্জা সুরু হল। রাজভাণ্ডার তোল্‌পাড় করে শ্রেষ্ঠ রত্নহার তিনি নিয়ে এসেছেন, তাঁর প্রেয়সীর কণ্ঠে পরিয়ে দেবার জন্যে। শত সূর্য্যের আলোর মত তার প্রভা। আজ পায়ে হেঁটে তিনি যাবেন না, অশ্বশালা থেকে তুষারের মত শুভ্র বাহন তিনি নিজে বেছে এনেছেন। উষ্ণীষে আজ তাঁর হীরামণি ঝলক দিয়ে উঠ্‌ছে।

শেষরাত্রে যখন পথে বেরোলেন, তখন ভোর হতে বড় বেশী দেরী নেই। কিন্তু চাঁদের আলো নেই বলে আজ চারিদিক কেমন কুয়াসায় ঢাকা। কুয়াসার শীতল স্পর্শ আজ কুমারের কাছে তাঁর প্রেয়সীর হাতের শীতল স্পর্শ বলেই মনে হচ্ছিল। দূর থেকে দেখা গেল জান্‌লার নীচে এতকাল পরে আজ একটা গুপ্ত দরজা হঠাৎ খুলে গেছে, অকালেফোটা পদ্মের পাপ্‌ড়ির মত সেই দরজার কপাটদুটি তাঁর চোখে সুন্দর হয়ে উঠেছিল।

কুমার দরজার কাছে এসে ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে পড়ে একেবারে তীরের মত বেগে ভিতরে গিয়ে ঢুক্‌লেন। সাম্‌নেই সেই তন্বী তরুণী উষার আলোর মত লাল্‌চে শাড়ীতে সুগঠন দেহখানি বেষ্টন করে লজ্জানত মুখে দাঁড়িয়ে। তার হাত দুখানি বুকের কাছে জড়ো করা, হাতে সদ্য-ফোটা ফুলের মালা, তার পাপ্‌ড়ির জল তরুণীর আঁচলে জলের ছোপ ধরিয়ে দিচ্ছে। রূপের নেশায় কুমার তখন পাগল। তরুণী তাঁর গলায় বরমাল্য পরিয়ে দেবার আগেই তিনি ছুটে গিয়ে তার গলায় হীরার হার দুলিয়ে দিলেন। তারপর সে ফুলের মালা তুলে ধর্‌ল কি না, না দেখেই তিনি সেই কুসুম-কোমল হাতদুখানি চেপে ধর্‌তে গেলেন।

কি আশ্চর্য্য! তরুণীর হাত তুষারের মত শীতল, পাষাণের মত কঠিন। কুমার বিস্মিত নেত্রে চেয়ে দেখ্‌লেন, তাঁর মনোমোহিনী প্রেয়সী পাষাণী! ঘরের চারিধারে তারি ছাঁদে গড়া অসংখ্য মূর্ত্তি,—সমাপ্ত, অর্দ্ধসমাপ্ত, অসমাপ্তভাবে ছড়ানো। তারি মুখের ছবি নানারঙে মোহন ভঙ্গীতে আঁকা ঘরের মেঝেয় গড়াগড়ি যাচ্ছে। মাঝখানে তপঃক্লিষ্টা সন্ন্যাসিনীর মত চিত্রা বসে। তার একখানা হাতের রঙ তুষারের মত শুভ্র। পাষাণীর মত তারো হাতে হীরার কাঁকণ।

———



একটা প্রকাণ্ড 'হাঁ'

জ্যোতির্ময়ী দেবী

রাত্রির তিনটে হবে। নীতি উঠে বসল বিছানায়। মনে হল স্বপ্ন, না, জেগেই ছিল? কিন্তু দিনদিন ধরেই ঐ প্রকাণ্ড হাঁ করা চাঁদের মুখের মত হাসি ভরা একটা মুখ ওকে যেন মনের মধ্যে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। যেন কি বলতে চায় অথচ বলছে না। শুধু বিশ্রী ব্যঙ্গ ভরা একটা হাঁ করা হাসি ওর দিকে চেয়ে আছে। চাঁদের মুখের মত কাত হওয়া মুখটা। তার সমস্ত গালটা হাসিতে বিভাসিত। যেন মানুষের মুখের স্বাভাবিক হাসি।

নীতির পাশে ভাই বোনরা ঘুমচ্ছে। তাদের গভীর শান্ত নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। জানালার বাইরে আকাশটা দেখা যাচ্ছে। নীতি ভাবল চাঁদ কি উঠেছে? আজ কি তিথি? চাঁদটা কোন্ দিকে? উঠেছে, না উঠবে? জ্যোৎস্না কি আছে? কিন্তু কলকাতায় জ্যোৎস্না—তার আনাগোনার জায়গা খুবই সঙ্কীর্ণ। মাঝের তিথিতে অর্থাৎ পূর্ণিমার কাছাকাছি তিথিগুলোতে একটু আধটু আলো জানালার পাশে বারান্দার পাশে আর ছাতে আসে তাতে চাঁদকে যে সব সময় দেখা যাবে তা নাও হতে পারে। শুধু জ্যোৎস্নার আভাসটাই উঁকি মারে।

নীতি জানালার বাইরে একবার তাকালে। তারপর বিরস মনে টেবিল আলোটা জেলে স্কুলের পরীক্ষার খাতাপত্র বিছানায় ছড়িয়ে বসল। আর চাঁদের হাসির চালাকির কথা ভাববার দরকার নেই—চাকরী তো আছে।

খাতা দেখে। সংশোধন করে। নম্বর ফেলে।—ভালো বা মন্দ মন্তব্য লেখে। আর মাঝে মাঝে সকৌতুকে হাসে ছাত্রীদের ভুল দেখে।

হঠাৎ পাশের ঘরে দরজার খিল খোলার শব্দ হ'ল। মা উঠলেন হয়ত। ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল পৌনে পাঁচটা!

এতক্ষণে শরীরের কথা মনে হল। ওঃ পিঠটা আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে।

আর খাতা দেখে না। প্রায় শেষ করে এনেছে।

শুয়ে পড়ে। এবার জানালা দিয়ে আশ্বিনের শেষ রাত্রের হাওয়া আসে। আর হ্যাঁ, কাত হয়ে পড়া চাঁদকেও পশ্চিম দিগন্তে দেখতে পেল।

হঠাৎ ঐ সমস্ত অস্বস্তিকর ভাবনাগুলোকে কঠিন ভাবে নেড়ে চেড়ে তলিয়ে দেখতে ইচ্ছে হ'ল।

কোত্থেকে, কেমন করে, কবে, কেন ঐ প্রকাণ্ড হাসির গহ্বরওয়ালা ব্যঙ্গ হাসিভরা চাঁদের মুখ ওর মনে বাসা বাঁধল। জাগল। চাঁদ তো আজ বা কালই দেখছে। হয়ত মার কোলে থেকে 'আয় চাঁদ আয়' শুনেছে।

কিন্তু মনে মনে একটু হেসে ফেলে। মার কোলে? তিন ভাই চার বোনের একজন। মার কি কোনো মেয়ে নিয়ে আর 'আদিখ্যেতার' অবসর ছিল! আগে পরে আরো বোন আর ভাই!

যাক্, সে তলিয়ে ভাবতে বসল সেই কবেকার কথা। যখন থেকে ঐ মনের মধ্যে প্রকাণ্ড ফাঁক ঐ 'হাঁ'টা বাসা বেঁধেছে। তাকে দেখে নিয়ে হয় ঝেড়ে ফেলতে হবে, নয় কি করা যায় তাই করতে হবে।

॥ ২ ॥

হ্যাঁ, ওর ইস্কুলটা বেহালায়।

সেদিন ট্রামে ফিরছিল। মেয়েদের সিটের পাশের জায়গাটা খালি ছিল। বিকেলের রোদ্দুরে আকাশভরা আষাঢ় মাস। সে জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল।

সহসা কে একজন জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে কি একটু বসতে পারি।'

মুখ না ফিরিয়েই সে বলল, 'হ্যাঁ বসুন।' সারাদিনের ক্লান্তিতে গরমে চোখ যেন জ্বালা করছিল। বাড়ী গিয়ে শুয়ে পড়তে পারলে বাঁচে ভাবছে। চোখ বুজেই কিম্বা না দেখা চোখে সে বসেছিল।

যে পাশে এসে বসল, সে হঠাৎ বেশ একটু 'কিন্তু' 'কিন্তু' ভাবে বললে, 'কিছু মনে করবেন না। আপনি কি নীতি মৈত্র?'

নিজের নাম শুনে সে চমকে উঠে মুখ ফেরালো।

ক্ষীণকায় পাশের লোকটিও তার মুখটি দেখে চমকালো।

এবারে বললে, 'তুমি—তুমি নীতি? আপনি নীতি মৈত্র তো।'

নীতি বললে, 'তুমি! আপনি? তুমি অমল ঘোষ? তোমাকে যে চেনা যায় না এমন হয়ে গেছ··· ।'

অমল একটু হেসে বললে, '. " . -তো ওই কথাটাই বলতে পারি।'

নীতি শুকনো ভাবে একটু হাসলে। কিছু বললে না।

দুজনেই চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। ঝাপসা ছবির মত অনেকগুলো দিন আর ঘটনা তরতর করে চোখের সামনে ভেসে এলো। দুজনের মনে দুভাবে।

নীতির থার্ড ইয়ারে পড়ার সময়ে দুজনের আলাপ হয়। ভাব হয়। ভালোবাসে পরস্পরকে। ভালো লাগাটা ভালোবাসার পরিণতি লাভ করে।

তারপর পিতার ক্রোধ জননীর বিরাগ প্রতিবেশীদের ইঙ্গিতময় নিন্দার গুঞ্জন সব জড়িয়ে একটা জটিল অবস্থা।

অসবর্ণ বিয়ের কথা তারা বলে। প্রচণ্ড রাগে তাতে পিতা জননীকে দিয়ে বলেন, 'ওসব বিয়ে হতে গেলে কোমরে টাকার জোর থাকা চাই। বুঝলে, টাকার জোর বড় জোর। টাকার জোর থাকলেই ওসব 'প্রেম ট্রেম' করে বিয়ের ব্যবস্থা করা যায়। ওসব খেয়াল ছাড়তে বল। এই করার জন্যে ওকে আমি কলেজে পড়াই নি। মন দিয়ে পড়ে পরীক্ষাটা দিয়ে আমার মাথা কিনতে বলো।'

ছোট বাড়ী।—পাশের ঘরে সরব কথা মাকে আর বলতে হল না কিছু। ভাই বোনে সবান্ধবে বসে নীতি সব কথাই শুনতে পেল।

মা এসে কেঁদে ফেলে বললেন, 'আমি কি করে মুখ দেখাব পাড়ায়—সমাজে সকলেরি কাছে। তোরা এই করে আমাদের মুখ ডুবিয়ে দিবি······।'

নীতি লজ্জায় ধিক্কারে যেন মরে গেল। কিন্তু নাঃ। নীতি প্রেমের জন্যে আত্মহত্যাও করেনি। পালিয়েও যায়নি বাড়ী থেকে। ভালো করে মন দিয়ে পড়ে বি. এ. পরীক্ষা ভালোভাবেই পাশ করল।

তারপর বি. টি.। তারপর চাকরী। বাবার সংসারের কিছু ভার নেওয়া।

ট্রাম চলেছে রেস কোর্সের পাশ দিয়ে। নামবার সময় হয়ে এলো। তার চোখটা পাশে বসা অমলের দিকে পড়ল।

সেও ভাবছিল ঐ রকমই সব কথা। পড়ায় ভাল। তার ভাগ্যে এসে

পড়েছিল পিতার মৃত্যু, ফিফ্‌থ ইয়ারেই পড়া বন্ধ। মা ভাই বোন, সংসার। সকলের ভার। জীবিকার সন্ধান ……।

একটা ষ্টপে ট্রাম থামল।

কিছু কথার আগেই একটি মেয়ে এসে সিটের পাশে দাঁড়াল। অমল উঠে দাঁড়াল।

ধর্মতলা এসে পড়ল। এবার নামতে হবে। নীতি এদিক ওদিক তাকাল। অমল কোন্ দিকে? নেমে গেল কি? না। অমল নামছে। সেও নামল।

সে একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কোন দিকে?'

নীতি বললে, 'বেলেঘাটা। তুমি?'

শ্যামবাজার। দুজনে নামল।

'এদিকে তোমার কি আপিস?' নীতি বলে।

'খিদিরপুর ডকে একটা কেরাণীগিরি' একটু হেসে অমল বলে। 'তুমি?'

'আমিও বেহালায় একটা স্কুলের টিচার।'

প্রতিদিনের একই পথের যাত্রী! এতদিন দেখা হয় নি। আশ্চর্য। দুজনেই ভাবে।

অমল।'—আচ্ছা। আজ যাই। তুমি কটায় বেরোও? কিছু কথা হল না আজ।'

নীতি। '—বড্ড ভিড় হয়ে যায় তাই প্রায় একটু সকালেই বেরুই। মাঝে মাঝে বাসেও উঠি।'

॥ ৩ ॥

তারপর থেকে এখন প্রায়ই দেখা হয়। যেন দেখা হবার জন্যেই দুজনেই সময়ের একটু বেশী আগে আসে। দু একটা কথা কয়। হাসে।

নীতি ভাবে যেন কতদিন হাসেনি। কারো সঙ্গে গল্প করেনি।

দু একদিন পরে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'সেই বাড়ীতেই আছ?'

অমল বললে, হ্যাঁ।

নীতি জানত অমলের বিয়ে হয়েছে। একটু দ্বিধা করে বললে, 'কে কে আছেন বাড়ীতে? ভাইরা মা কোথায়? ছেলেমেয়ে আছে?'

অমল বললে, 'মা আছেন। আর কেউ নেই একটি ছেলে আছে শুধু।'

'—বৌ কোথায়?'

একটু থেমে অমল বললে, 'এই বছর খানেক হল হাসপাতালে বাচ্চা হতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি।'

নীতি চুপ হয়ে গেল।—তারপর বললে, 'আহা! বাচ্চাটি?'

'সেও নেই।'

'বাড়ীতে তবে শুধু মা আছেন?'

'হ্যা, আর বড় ছেলেটি আছে।'

অমল কথা শেষ করে বললে, 'নিজের কথাই বলছি তোমার কথা তো কিছুই জিজ্ঞেস করিনি। সিঁথির দিকে তাকালো। সরু সাদা সিঁথেটা। বিয়ে করনি দেখছি?'

সে শুবনো ভাবে একটু হেসেছিল। কিছু বলে নি।

অমল একটু পরে জিজ্ঞাসা করল, 'ভাই বোনদের বিয়ে হয়েছে? প্রীতি, বীথি, গীতি? প্রীতি তো তোমারি মত দেখতে অনেকটা। বেশ সুন্দর ছিল, না?'

ওর মত? সুন্দর দেখতে! নীতির চোখবসা ক্লান্ত মুখে একটা শীর্ণ হাসি উঁকি মেরে যায় যেন। মুখে বললে, 'হ্যাঁ ওদের বিয়ে হয়েছে। দাদারও বিয়ে হল। শুধু গীতি বাকি।'

'ও!' অমল অবাক হল। '—প্রীতির কোথায় বিয়ে হল? বর ভালো হয়েছে?'

নীতি ওর দিকে ফিরে একবার তাকালো। তারপর বললে, হ্যাঁ খুব ভালো বর ঘর। পূর্ববঙ্গের এক জমিদারের ছেলে। সুধাংশু মিত্তিরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। দাদারও হয়েছে একটি দত্ত বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে। অসবর্ণ, ওরাও একসঙ্গে পড়ত। ভাব হয়েছিল। সুধাংশুরা খুব বড় লোক। এরাও বড লোক নয়। কিন্তু দাদা তো রোজগার করে।'

যেন নীতি রোজগার করে না। অমল একবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। অসবর্ণ? দুটো অসবর্ণ বিয়ে দিলেন ওর বাবা মা? না, তাঁরা হয়ত নেই।

নীতি চুপ করেই ছিল। দুজনেই এককথাই ভাবছিল। সেই নিজেদের কথাই কি?

অমল এবারে বললে, 'মা বাবা আছেন? মত দিলেন এই সব বিয়েতে?'

ট্রাম ধর্মতলায় এসে পড়েছে। নামতে হবে। নীতি উঠে দাঁড়িয়ে

বলেছিল, 'হ্যাঁ। খুব বড় লোক তারা। বাবার অমত হয়নি। চল নামি।'

…তার মুখে মৃদু একটু হাসির রেখা ফুটল কি? অমল ভাবে।

॥ ৪ ॥

নীতি শুয়ে শুয়ে আবার ভাবে! হ্যাঁ খুব বড়লোক জমিদার সুধাংশুরা। প্রায়ই গাড়ি করে আসত। জমিদারীর মাছ ফল আম কাঁঠাল গুড় মিষ্টি সন্দেশ পাঠাত ঝাঁকা ঝুড়ি ভরে থালা ভরে। বাড়ীতে উৎসব পড়ে যেতো। তাকে নিমন্ত্রণ করা হত। সেও আবার সকলকে সিনেমা থিয়েটারেও নিয়ে যেতো। মাছ এলে সেদিন বাবা রান্নার মেনু করে দিতেন। রাত অবধি বসে তার সঙ্গে সকলের খাওয়া-দাওয়া হ'ত।

বিয়ের প্রস্তাব আসার আগেই তাঁরা মনে মনে সব ঠিক করে রেখেছিলেন। ছেলে নিজেই কর্তা।—বিধবা মা কোনো আপত্তি করবেন না। আভাস দিয়েছিল প্রীতি।

* * * *

ছেলের প্রস্তাবে মা আর বাবা বললেন, 'এত ভাগ্য প্রীতির হবে তা কে জানত।……'

তারপর ঘোর ঘটা করে পাশের বাড়ীর ছাত সামনের বাড়ীর উঠান বাহিরের ঘর সব নিয়ে মহা জাঁকজমক করে প্রীতির বিয়ে হয়ে গেল।—বাবা জামাইকে হীরের আংটি দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। প্রীতিকেও গহনাপত্র দিলেন। কিছু ধার দেনাও হ'ল। কিন্তু সে তো 'হাঘরে' বরের হাতে দিতে গেলেও নগদে গহনায় দিতেই হত।……

এবার নীতির মুখে একটা হাসির রেখা ফুটে ওঠে। সে উঠে বসে খোঁপাটা ঠিক করতে করতে ভাবে, কিন্তু এবার আর মা কেঁদে বলেন নি, কি করে মুখ দেখাব লোকের কাছে। বেশ মুখ মাথা উঁচু করেই লোকজন খাওয়ালেন। গর্বিত ভাবেই মুখ দেখালেন মা। প্রতিবেশীদের কাছে জামাইয়ের ঐশ্বর্য এবং সৌন্দর্য নিয়ে কাহিনী বিস্তৃত করেই বলতে লাগলেন। তারা বিতৃষ্ণ ঈর্ষাতুর শুকনো মুখে শুনতে শুনতে নেমন্তন্ন খেল। খেয়ে বাড়ী গেল। নিন্দে করতে বা জাতের খোঁটা দিতে পারল না। অত বড় লোক কম কথা।…কত বড় গাড়ীখানা। গলিতে ঢুকতেই পারে না।

॥ ৫ ॥

আর চাঁদটা নিজের খুশীমত নীতির অবসর হলেই 'হাঁ' করে হেসে যায় তার মনে। সেটা বেশীর ভাগই নীতির রাত্রের নিশুতি অবসরে। যখন বাবা মা নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়েন। ভাই ভাজ পাশের ঘরে গুনগুন করে গল্প করে। ভাইয়ের ভালো কাজ হয়েছে। সংসার সচ্ছল হয়েছে। বোনেরা শ্বশুরবাড়ী থেকে আসা যাওয়া করে। বাড়ীতে হাসি গল্পের ধুম। চায়ের আসর সন্ধ্যা-রাতে জমে। যখন নীতি খাতার বোঝা ছড়িয়ে খাতা দেখে। চাঁদটাও হাসে মনের ভেতরে।

* * *

পাশের ঘরে—এবার বাবা মা জাগলেন। নীতি শুয়েছিল সেও এপাশ ওপাশ করে ক্লান্ত মুখে উঠে বসল।

ঝি এসে কড়া নাড়ল।—তারপর উনোনে আগুন পড়ল।—ভাজ উঠলো। মা রান্নাঘরে গেছেন। চায়ের কেতলী বসেছে। নীতি মনে মনে সব দেখতে পাচ্ছে। কার জন্য বিস্কুট, কার জন্য রুটি, কার জন্য জিলিপি আসবে। সিঙ্গাড়া আসবে কোনদিন তাও সে সব জানে।

তারপর প্রকাণ্ড হাড়ি করে সিদ্ধচালের ভাত বসবে আলু ভাতে আর—হয়ত কুমড়ো ঝিঙেও ভাতে দেওয়া হবে। হয়ত ডাল ভাতে। বাবা বাজারে যাবেন। মাছ আসবে তরকারি আসবে। ততক্ষণে নীতির স্নান কাপড পরা হয়ে যাবে। ডাল ভাতই খেতে পাবে। মাছ কুটে বেছে দিতে ঝিয়ের সময় হয় না! বৌদিকেই কুটতে হয়। সে ছোট ছেলে নিয়ে সব দিন ঠিক সময়ে আসে না।

মা বলেন, 'একখানা মাছ ভাজা হলে হতে। রোজই ডাল ভাত আলুভাতে বেগুন পটল ভাজা দিয়ে খাওয়া.... ।'

কিন্তু তাই খেতে হয়। খেতে দেন। সে আর কিছু বলে না। বেহালা তো কম দূর নয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাসে ট্রামে শরীর 'তক্তা' হয়ে যায়।

মনে মনে হাসে 'তক্তা!' হ্যাঁ তক্তাই তো! সংসারকে দাঁড়াতে বসতে আশ্রয় দিতে সে তো 'তক্তার' কাজই করছে।

কিন্তু হঠাৎ যেন কি রকম মনটা ভাল হয়ে যায়। সে ডাল ভাত খেয়ে

বেরিয়ে পড়ে প্রতিদিনের চেয়ে কুড়ি মিনিট আগেই। অমলকে ধর্মতলায় পেয়ে যাবে তাহলে।

ভাই বলে, 'এত আগে ছুটছিস কেন?'

বাবাও বলেন, 'এখনো তো নটাই বাজেনি।'

তার মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। 'যা ভিড় হয়ে যায় জানইতো।'

দুজনে দেখা হয়। হয় ফেরবার পথে নয় যাবার মুখে।

দুজনেরই যে একই কথা অনেক বার ভেবেছে। আবারো ভাবে। কেউ কাউকে যদিও বলে না।

আবার একদিন অমল বলল, 'ছেলেটার পড়াশোনার জন্যে ভাবনায় পড়েছি। মা বুড়ো হয়েছেন সামলাতে পারেন না রাস্তায় বেরিয়ে যায়। নিজের তো কিছু হ'ল না ছেলেটিকে যে কি করে দেখি শুনি। একটা ভালো বোর্ডিং-এর সন্ধান দিতে পার? কিংবা ভালো মাষ্টার?'

নীতি বললে, 'আচ্ছা সন্ধান দেখব। কিন্তু বোর্ডিং-এ অনেক খরচ হবে। কত বড় হ'ল?'

'এই ছয় হয়েছে।'

'বড্ড ছোট্ট না বোর্ডিং-এর পক্ষে?'

'কিন্তু বাড়ীতে আর তো সামলাবার লোক নেই।'

॥ ৬ ॥

বাড়ীতে বোনেরা এসেছে। হৈ হৈ উৎসব পড়ে গেছে তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে। বরদের অর্থাৎ জামাইদের নিয়ে।

নীতি শুকনো চোখে বসা ক্লান্ত মুখে এসে রান্নাঘরে পিঁড়িতে বসে চা আর যা হোক দুটি রুটি অথবা অতিথিদের জন্য আনা ভালো মন্দ খাদ্য খেয়ে উঠে পড়ে।

কোনো দিন পর্বতপ্রমাণ খাতার বোঝা নিয়ে বসে। কোনো দিন ক্লান্ত মুখে চোখ বুজে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে।

ভাবে, ভাই টাকা রোজগার করে। বাবাও অর্জন করেন কিছু...। কিন্তু তার মত এই অবসাদ ক্লান্তি কষ্ট তাঁদের তো হয় না!

ভাই পরমোৎসাহে বৌকে নিয়ে সিনেমা চলে যায়। নয়তো বৌয়ের বাপের বাড়ী, মাসী পিসির বাড়ী যায় কিংবা যেখানে খুসি।

বাবা ঘরে বসে রাজনীতি সমাজনীতি করেন। পরম উদারভাবে এককালে তাঁরই নিন্দিত ধিকৃত অসবর্ণ বিবাহকে এখন সমর্থন করে নিজের ঔদার্য প্রকাশ করেন।

বোনেরা যখন আসে মার সঙ্গে শ্বশুরবাড়ীর জা ননদদের 'শ্রাদ্ধ' করে। কিংবা বাড়ীর ঝি চাকরদের পিণ্ডদান করে অথবা সেজে গুজে তারাও সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরোয়।

সে তখন খাতা দেখে নয়ত কোনো ছাত্রাকে পড়াতে যায়। চুপি চুপি এক একবার ভাবে যদি এম. এ.-টা দিত। আরো ভাল করে পাস করতে পারত। তাহলে এই খাতা দেখার বিরাট খাটুনিটা থেকে অব্যাহতি পেত।

নাঃ এম. এ. পড়া হয়নি।

। ৭ ।

আশ্বিনের সূর্য অস্তোন্মুখ। ধর্মতলা এলো।

দুজনেই ধর্মতলায় নামল। দুটো বাস না ট্রাম থেকে।

নীতির স্কুল গরমের ছুটির পরে খুলেছে। অনেক দিন দেখা হয়নি।

অমল এগিয়ে এল হাসিমুখে। সকালে ওঠবার সময় দেখা হয়নি। বিকালেও ভিড়েতে কেউ কাউকে খুঁজে পায় নি।

দুজনে দাঁড়াল একটু পথে। খুব ভিড়।

তারপর অমল বললে, 'একটু পরেই যাব।' হয়—চল একটু ঘুরি ময়দানে।'

নীতি বললে, 'চল।'

অমল। 'কার্জন পার্কে বসবে? বেশ ঠাণ্ডা। যদিও ভিড়।'

'তা হোক। ভিড় আর কোথায় নেই পথে পার্কে ঘরে। বাড়ীতেও তো ভিড়।'

অমল কিছু বলে না। তার বাড়ীতে ভিড় নেই!...

নীতির মনে হয় একটা ছোট শোবার ঘর। এক গাদা বিছানা। ছোট বোন ছোট ভাইয়ের পড়ার একটু জায়গা। নিজের একটা টেবিল। মাটিতে রাত্রে তিনটে বিছানা পড়বে। তাকে টেবিলে নিজের বই। ভাইবোনদেরও বই আছে।

ঘাসের ওপরে বসে একটা একপাশে জায়গা দেখে।

নীতি বললে, 'তোমার ছেলের জন্য বোর্ডিং-এর খোঁজ করেছিলাম। ঐটুকু

ছেলের জন্তে বিলিতী বোর্ডিং খুব বেশী চায়। দেশীতেও কম নয় অথচ পড়া বা খাওয়াও ভালো নয়। মুস্কিল। আর একটু বড় হলে না হয় অত খরচ করতে।'

অমল বললে, 'তা তো বুঝি। কিন্তু কেউ যদি দেখবার মত বাড়ীতে থাকত। মার পক্ষে তো দুরন্ত ছেলের ভার নেওয়া সম্ভব নয়। তা পার তো একটি ভালো মাষ্টার দেখো যদি কোনো মেয়ে পড়াতে পারেন।'

'দেখব। কিন্তু সে তো ওদিকের কাউকে পেলেই ভাল হয়। এদিকের মানুষ অতদূর যাওয়া আসার ঝঞ্চাট পোয়াতে যাবে না হয়ত। তা' একদিন ছেলেকে নিয়ে এসো না। দেখতে ইচ্ছে করে।'

'খোকাকে?' তারপর একটু হেসে বললে, কিন্তু কোথায় নিয়ে আসব?

নীতি বললে, 'তাইতে! তা একদিন ময়দানেই নিয়ে এসো না।'

'সে বাড়ী ফিরে গিয়ে তো আর হয় না। তাহলে একদিন ছুটির দিন আনব।'

'তাই এনো। দেখা যাবে পড়াশোনা ও কেমন করে?'

'একটা ছোট স্কুলে পড়ে পাড়ায়। ভালো পড়া কি আর হবে।'

'তবু এনো। চল বাড়ী ফের যাক।'

সন্ধ্যা শেষ হল। বাড়ী ফিরতে হবে। বাড়ী?

দুজনেই অন্যমনে ট্রামে ওঠে। একজনের ভাইবোন বাপ মা সব আছে বাড়ীতে! আর একজনেরও মা ছেলে আছে। কিন্তু বাড়ী মনে হচ্ছে না যেন সেটা দুজনেরই। যেখানে স্বজন আছেন। শয্যা আছে। খাদ্য আছে। তবে?

॥ ৮ ॥

একটা রবিবারের বিকালে অমল ছেলেকে নিয়ে এসে ময়দানের পথে দাঁড়াল।

নীতিও নামল বাস থেকে। হাতে একটা বল চকোলেট খেজুরের প্যাকেট। কাগজে মোড়া।

ছেলে বাপের হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল। অকুণ্ঠ মুখে বলটা নিল। চকোলেটের মোড়ক খুলল। ছাড়িয়ে দু' একটা খেল।

তারপর বললে, 'তুমি কে?'

তার বাবা বললে, 'মাসী হয়।'

নীতি হাসল। বললে, 'তুমি কে?'

ছেলে বললে, 'আমি অনিল। বাবা খোকা বলে। আমি এবারে বল খেলি।'

বল গড়িয়ে দেয় যেদিকে ইচ্ছে। কুড়িয়েও আনে! আবার অমল নীতি যেদিকে বসেছে সেদিকেও ছুঁড়ে ফেলে।

একটা বেলুনওয়ালা এলো। একটা চিনেবাদামওয়ালা। ঝালমুড়ি ফেরিওয়ালা আসে। কাজুবাদামওয়ালা আসে।

নীতি বেলুন কিনল। বাদাম কিনল। খোকা বেলুন ওড়াল এবং ফাটালো। আর খুব হাসল। নীতি ওর হাসি দেখে ওর সঙ্গে হাসে। অমলও হাসে।

অমল বললে, 'মাসী আর বেলুন কিনে দেবে না।'

খোকা নীতির দিকে চেয়ে বলে, 'দেবে না আর? সত্যি?' শুনতে নীতির ভারি ভালো লাগে। ওরা বসে বসে বাদাম ছাড়ায় আর একটা দুটো করে খায়। সন্ধ্যা শেষ হয়ে রাত হয়ে গেল।

অমল উঠে দাঁড়াল. বললে, 'এবারে যাই, মা ভাববেন। খাবার সময় হল খোকার।'

অন্ধকার থেকে বল কুড়িয়ে নিয়ে ছেলে ফিরে এলো। নীতিও দাঁড়াল।

॥ ৯ ॥

মা বসেছিলেন রান্নাঘরে আর সকলের খাওয়া হয়ে গেছে। এক বোন এসেছে শ্বশুরবাড়ী থেকে। আঁতুড় হবে।

নীতি খেতে বসে। মাও বসেছেন।

মার লাল পাড় শাড়ী। পরিষ্কার চুল বাঁধা সিঁদুর টিপ কপালে। আগের মত মুখে আর চিন্তার রেখা নেই। তিন ভাই-ই বড় হয়ে গেছে। দুজন ভাল কাজ করে। একজন পড়ে। ছোট বোনেরই শুধু বিয়ে হয়নি।

আর নীতির। হঠাৎ আজই যেন নীতির মনে হল আর নীতিরও তো বিয়ে হয়নি।

মা ওকে ভাত দেন। দিয়ে নিজে বসেন।

নীতি ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করে মুখে তোলে অন্যমনস্কভাবে। কত কি

ভাবছে। কূল মেলে না যায়। একটা ভাবনা থেকে আর একটা। তারপর আর একটা। খেই হারিয়ে যায়। মূল সূত্রটা কি আবার ভাবতে বসে। মূল সূত্রটা কি অমল? অমলের অসহায়তা! না তার সুন্দর ছেলেটি! যে বললে অবাক হয়ে, 'আর বেলুন দেবে না?' অথবা সেই চাঁদের হাঁ করা ব্যঙ্গ ভরা হাসি। যা রাত্রে ওকে ঘুমের সময় ঠাট্টা করে কি বলে কে জানে।

নীতি মুখ তুলে বললে, 'মা।'

মা খাচ্ছিলেন। বললেন, 'কিরে খেতে পারছিস না? রোজই আজকাল রাত করে ফিরিস। খাটুনি বেড়েছে? আর একটু ঝোল নিবি! নেবু দেব?'

মা ঝোল তুললেন কাঁসি থেকে। আর কি একটা ছোট্ট বস্তু বড়ির মত। মাছ না বড়ি?

নীতি সকালে মাছ খেতে পায় না। এটা সকালের ক্ষতিপূরণ।

সে থালা সরিয়ে নিল। বললে, 'আর কিছু লাগবে না মা।'

অবাক হয়ে মা বললেন, 'তবে ভাতগুলো কি করে খাবি।'

'আর পারব না খেতে।'

মা শঙ্কিত মুখে বললেন, 'শরীর ভালো নেই?' এবার ভাবনা হল। রোজগারী মেয়ে।

নীতি বললে, 'না ভাল আছি। আমি আর চাকরী করব না মা।' তারপর খুব আস্তে বললে, 'এবার তোমরা আমার বিয়ে দাও।'

সবটাই মা শুনতে পেলেন। কিন্তু বুঝতে পারলেন না। এমনই আশ্চর্য কথা দুটোই।

চোখ বড় করে বললেন, 'চাকরী করবি না! তাহলে কি করবি?'— বিয়ের কথাটা বুঝতেই পারলেন না।

এবারে নীতি মুখ তুলল। কথাটা একবার বলা হয়ে গেলে আর দ্বিতীয় বার মুখে আনা বা বলবার জন্য বেশী সাহসের দরকার হয় না। সেটা বেরিয়ে ঘরের বাতাসে মিশে গেছে তখন।

বললে, 'তোমরা আমার বিয়ের ব্যবস্থা করো।'

মা হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। বিয়ে! নীতি বিয়ের ব্যবস্থা করতে বলছে— নিজের!

কিছুক্ষণ পরে মুখে কথা এলো। 'তোর বিয়ে? এই বয়সে? পাত্র কোথায় পাব! এত বয়সের মেয়েকে কে বিয়ে করবে?'

নীতির গলায় সাহস এসেছে। 'পাত্র তোমায় খুঁজতে হবে না। আছে মা।'

পাত্র আছে! নীতি সব ঠিক ক'রে ফেলেছে তাহলে!

মা আবার হতবুদ্ধি স্বরে বললেন, 'পাত্র আছে! কে পাত্র? খরচপত্রের কি হবে? বিয়ের তো খরচ আছে একটা। তার কি হবে?'

নীতির গলা স্পষ্ট হয়ে বললে, 'পাত্র অমল ঘোষ। খরচপত্র? আমার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা আছে। বেশী লাগবে না।

মা স্তম্ভিত। সেই অমল ঘোষ! কায়স্থ! কায়স্থ বলার অসবর্ণ বলার আর মুখ নেই। উপায় নেই। কিন্তু দোজবরে! বললেন, 'দোজবরে।'

নীতি স্পষ্ট গলাতেই বললে, 'হ্যাঁ মা, দোজবরে। ছেলেও আছে একটা! কিন্তু তখন আগে সেতো দোজবরে ছিল না। এবারে দোজবরেতেই দাও। নইলে তেজবরে হয়ে যাবে।'

মার মুখে কথা এলো না! নীতির বিয়ে হয়ে চলে যাবে।···একটা আয়। মোটা আয় বন্ধ হয়ে যাবে। চাকরী কি করবে না সত্যি? আর করলেও তাঁদের কি লাভ। মনে ভয় জাগে।

বললেন, 'দেখি ও'র কি মত হয়।'

নীতি উঠল। বললে, 'বাবাকে শুধু দিন ঠিক করতে বলো। মতামতের আর কিছু নেই। খরচের টাকা আমার আছে।'

অনেক রাত। শোবার ঘর অন্ধকার। ভাইবোনেরা ঘুমোচ্ছে।

জানালা খোলা! মনে হল চাঁদটার কথা। এখনো সে আজ ওঠেনি! কি তিথি কে জানে।

মনে হল না আর চাঁদের হাসির কথা। নীতি ঘুমিয়ে পড়ল সেদিন।

॥ ১০ ॥

অমল ট্রাম থেকে নামল। দেখতে পেল একটু দূরে নীতি দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাসিমুখে এগিয়ে গেল সেদিকে। বললে, 'আমার আসতে আজ দেরি হয়েছে? কাজ ছিল একটু, আর ভিড়ে তিনখানা ট্রাম ছেড়ে দিতে হয়েছে। তুমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে?'

'বেশীক্ষণ নয়। চল একটু গঙ্গার ধারে যাই। যাবে?'

দুজনে হাঁটে। পথিক মানুষ। আপিস ভাঙা ভিড়; যানবাহনের ভিড়। নীরবে এগোয়।

সামনেই গঙ্গা। ঘাটের সিঁড়ি। জোয়ার এসে কখন নেমে যায় সে হিসাব ওরা রাখে না।

নীতি নেবে গেল, বললে, 'এসো না। একটু গঙ্গাকে ছুঁই আজ—।'

সিঁড়ির কাদা মাড়িয়ে গঙ্গাজল হাতে স্পর্শ করে মাথায় ঠেকাল। ওর দেখাদেখি অমলও তাই করল।—যেন দুজন ছোটবেলায় ফিরে গেছে হঠাৎ। নীতি বলে, 'এসো বসি একটু।'

অমল বললে, 'বড় কাদা।—'

নীতি বললে, 'কিন্তু এইখানেই একটু শুকনো দেখে বসব আজ।'

দুজনে বসে। পায়ের কাছে জল। বসার জায়গা শুকনো। নীতি একটু কাছাকাছি হয়ে বসল। অমল অবাক। সূর্য অস্ত গেছে। আকাশটা লাল। কোনোখানে ঘোর লাল। কোনোখানে কালো হয়ে আছে। গঙ্গার জলও কোথাও কালো কোথাও রঙীন।

দুজনে নীরব। হঠাৎ নীতি বললে, 'তোমার সেই টীচার দেখতে বলেছিলে। পাইনি। অত দূর কেউ যেতে চায় না।'

অমল বললে, 'যাক্‌গে। কি আর করা যাবে।'

নীতি একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'ভাবছি আমি যদি পড়াই।'

পাশাপাশি বসা দুজন। তার দিকে চেয়ে অমল আশ্চর্য আনন্দে বললে, 'তুমি? এত ভাগ্য ওর হবে? কিন্তু তোমার সময় হবে সেই বেলেঘাটা থেকে শ্যামবাজার। এই ভিড়ে যাওয়া আসা!'

নীতি জলের দিকে চেয়ে ছিল। ওর দিকে তাকায় নি। একটু চুপ করে থেকে বললে, 'যাওয়া আসা করতে হবে না।'

অমল আশ্চর্য। তারপর হেসে বললে, 'তার মানে? মজা করছ?'

একটু অপ্রতিভ ভাবে নীতি বললে, 'মাকে বলেছি কাল, আমি শ্যামবাজারে গিয়ে থাকব এখন থেকে। এই মাসেই একটা ভাল দিন দেখতে। তুমি তোমার মাকে বোলো ব্যবস্থা করতে।'

গঙ্গায় সন্ধ্যার অন্ধকার। অমল নীতির অত কাছে বসার মানে বুঝতে পারল এবার। সে তার একখানি হাত নিজের দু হাতে জড়িয়ে নিল।

কতক্ষণ গেল। কখন পায়ের কাছে কুলকুল করে জোয়ারের জল এসে ছলাৎ ছলাৎ করে ঘাটের সিঁড়িতে ঢেউ দিতে লাগল। নীতির শাড়ীর পাড় জুতো জলে ভিজে গেল।



মুক্তির মূল্য

সীতা দেবী

অদূরবর্তী গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া ছ'টা বাজিতেই মা তানের ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গেল। সারারাত গরমে তাহার ঘুমই হয় নাই, তবু বেশী বেলা করিবার তাহার উপায় নাই। সকালের ট্রেন আসিয়া পড়িল বলিয়া। এখন হুড়মুড় করিয়া যাত্রীর দল আসিয়া পড়িবে, তখন কাজ সামলান দায় হইবে।

বড় রাস্তার উপর প্রৌঢ়া মা তান্ বাস করে। তাহার একটি হোটেল আছে। ইহাতে তাহার গ্রাসাচ্ছাদন ত চলেই, তাহার উপর বিলক্ষণ বেশ কিছু হাতেও থাকিয়া যায়। বাহির হইতে দেখিলে অবশ্য ঘরটিকে হোটেল বলিয়া মোটেই মনে হইবে না। বারান্দায় দুখানা তক্তপোষ, তাহার উপর মোটা মোটা চাটাই বিছানো। ঘরের ভিতরটায়ও আসবাব-পত্র বেশী নাই। গুটি দুই তিন বাক্স কাঠের বেঞ্চির উপর রক্ষিত, একটা আলমারি, দুটা চেয়ার, একটা ছোট টেবিল। কাঠের পার্টিশন দিয়া ঘরখানি দুই অংশ বিভক্ত। একটা অংশ একেবারে খালি, কেবল কোণে কতকগুলি চাটাই এবং পাটি গুটানো রহিয়াছে। এই ঘরেই যাত্রীরা রাত্রিবাস করিয়া থাকে। অবশ্য ঘরে থাকিতে তাহারা বিশেষ পছন্দ করে না, কারণ এখানে আলো-বাতাসের বিলক্ষণ অভাব, এবং পিছনের ময়লা গলির দুর্গন্ধ ব্রহ্মদেশীয় নাসিকাকেও কাতর করিয়া তোলে। কাজেই বৃষ্টির দিন না হইলে যাত্রীগণ বারান্দায় এবং সামনের

ফুটপাথে চাটাই বিছাইয়া মনের আনন্দে নিদ্রা দেয়। হাওয়া পাওয়া যায় খুব এবং দশটার পর ফুটপাথে লোক চলাচল এতটা কমিয়া যায় যে, পথিকের অসতর্ক পদক্ষেপে আহত হইবারও কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

আশেপাশে সবই দোকান এবং হোটেল। সব নামজাদা জায়গা, দিব্য ফিট্‌ফাট্ সাজান। এক পাশে চীনা ভোজনাগার, তাহার প্রকাণ্ড সাইন্‌বোর্ড, সাদা জমির উপর বড বড় কালো চীনা অক্ষরে লেখা, এক লাইন ইংরাজী লেখাও আছে, একটা পাউরুটির ছবিও আছে। এখানে ইংরাজ, ফিরিঙ্গী, আর সৈনিক সারাক্ষণই আসে, সুতরাং একটু সাহেবীয়ানা না করিয়া উপায় নাই। জায়গাটি খুব পরিষ্কার, চীনা 'বয়'গুলি দিনে দশবার দরজার সামনে ঝাঁট দেয়, চেয়ার টেবিল মুছিয়া রাখে। যখন খরিদ্দার থাকে, তারা একমনে কাজ করিয়া যায়, যখন হাত খালি থাকে, তখন ফুটপাতের উপর বল খেলে, পরস্পরের পিঠের উপর দিয়া লাফ মারে।

মা তাদের দোকানের অপর পার্শ্বে মোটর মেরামত এবং রং করিবার কারখানা। দুই বিপুলদেহ মুসলমান ইহার স্বত্বাধিকারী। তাহাদের চেহারাগত সাদৃশ্যে বেশ বুঝা যায়, ইহারা দুই ভাই হইবে। তাহারা নিজেরা কোনো কাজই করে না। দুখানা বড় বড় চেয়ার টানিয়া, একরকম রাস্তার উপরেই আসিয়া বসে, এবং সাহেব-সুবা কাজে আসিলে তাহাদের সঙ্গে গম্ভীর ভারিক্কি চালে কথাবার্তা বলে। ভিতরে দশ বারোজন মুসলমান এবং বর্মা কারিগর অবিশ্রান্ত খাটিয়া যায়, সমস্ত দিন তাহাদের নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় নাই। তাহাদের নিপুণ হাতের সেবায় ভগ্ন, জীর্ণ, বিবর্ণ এক একখানা গাড়ী নবযৌবন লাভ করিয়া ঝক্‌ঝকে, চক্‌চকে রূপে পাড়ার বালকবৃন্দকে লুব্ধ, বিস্মিত করিয়া বাহির হইয়া আসে। এক একখানি গাডীর কাজ হইয়া যায়, আর সেটাকে সকলে ঠেলিয়া রাস্তায় নামাইয়া দিয়া যায়। তাহার পর যাহার গাড়ী সে আসিয়া, বিল চুকাইয়া দিয়া, গাড়ীখানা হাঁকাইয়া চলিয়া যায়। কারখানাটি যেন এক মোটরকারের এক্‌জিবিশান্। এখানে বিপুলাকৃতি 'মোটর-বাস্' হইতে, ক্ষুদ্রাকার 'বেবী আস্‌টিন্' পর্যন্ত সর্বজাতীয় গাড়ীই দেখিতে পাওয়া যায়।

এ ছাড়া সামনে পিছনে, এদিকে ওদিকে জমকালো দোকানের অভাব নাই। কাছাকাছি গোটা-দুই বায়োস্কোপও আছে—সন্ধ্যা হইবামাত্র ব্যাণ্ডের আওয়াজে কানে তালা ধরে, সারি সারি বৈদ্যুতিক আলোয় পথিকের চোখ ঝলসিয়া যায়।

ইহাদের ভীড়ে, মা তানের হোটেল পথিকের চোখে ধরাই পড়ে না। না আছে বৈদ্যুতিক আলো, না আছে শাদা রং করা বড় বড় দরজা। কোন্‌কালে বাড়ীওয়ালা দয়া করিয়া ঘরের সামনে এবং ভিতরে খানিকটা হলদে রং লাগাইয়া দিয়াছিল, তাহার পর আর কিছু করা প্রয়োজন মনে করে নাই। মা তানও এ লইয়া কিছু উচ্চবাচ্য করে না, কারণ ঘর দেখিতে যেমনই হউক, তাহাতে তাহার যাত্রী সমাগমের কোনোই হানি হইবে না। সৌন্দর্যবোধ তাহার কিছু প্রবল ছিল না, সুতরাং চুন বালি খসা দেওয়াল এবং বিবর্ণ দরজা-জানালা তাহার চক্ষুকে বিন্দুমাত্রও পীড়া দিত না। অন্যান্য দোকান বা হোটেলের মত লোকের চক্ষে সে ধাঁধা লাগাইতে পারে না বটে, কিন্তু তাহাতে কি-ই বা আসিয়া যায়? তাহাদের অনেকের চেয়ে আয় তাহার বেশী এবং ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম। ঘরভাড়া তাহার পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র। বহুকাল হইল, এ বাড়ী যখন প্রথম তৈয়ারী হয়, তখন হইতে, সে এখানে আছে। বাড়ীওয়ালা পুরানো ভাড়াটিয়া বলিয়া তাহার ঘরের ভাড়া আর বাড়ায় নাই; যদিও অন্য ঘরগুলির ভাড়া যথেষ্টই বাড়িয়া গিয়াছে। বৈদ্যুতিক আলো সে জ্বালায় না কাজেই মাসের শেষে কুড়ি-পঁচিশ টাকার বিলও তাহার আসে না। ছ' পয়সার কেরোসিন তেল কিনিলে তাহার দুদিন কাটিয়া যায়। চাকর-বাকর রাখার উৎসাহ তাহার নাই। খালি দুই বেলা ভাত দিয়া বুড়ী মা পোয়েকে সে রাখিয়াছে, তাহার কাজে একটু সাহায্য করিবার জন্য। মা পোয়ে সকালবেলা ফুল বিক্রী করিতে বাহির হয়, বেলা বারোটা আন্দাজ সব ফুল তাহার বিক্রী হইয়া যায়, তাহার পর সারাদিন তাহার অবসর। শুধু শুধু আলস্যে কাল না কাটাইয়া, মা তানকে সে একটু সাহায্য করে, ইহার বদলে খাইতে পায় এবং থাকিতে পায়, ফুল বিক্রয়ের লাভের টাকা তাহার জমাই থাকিয়া যায়। পাড়াপ্রতিবেশী সকলেই জানে, দুই বুড়ার অনেক টাকা জমা আছে, বিশেষ করিয়া মা তানের। ইহাদের খরচ কিই বা? ঐ ত বাড়ী। খাওয়া-দাওয়ারও বাড়াবাড়ি রকম ব্যবস্থা কিছুই নাই। যাত্রীদের জন্য যে রান্না হয়, উহারা নিজেরাও তাহাই খায়। এমন কি ব্রহ্মদেশীয়া রমণীমাত্রেরই প্রায় যে খরচাটা অবশ্যম্ভাবী,—সেই পোষাকের খরচও তাহাদের বেশী নাই। রেশমী লুঙ্গী বা ভাল জামা, কেহ কস্মিনকালেও তাহাদের পরিতে দেখে না। ছিটের লুঙ্গী আর শাদা জামাই তাহাদের সব দিনের পোষাক।

মা তানের বয়স কত ঠিক করিয়া বলা যায় না। বারো বৎসর আগে প্রথম

যখন সে এই বাড়ীতে আসিয়া হোটেল খোলে, তখনও তাহার এই রকম চেহারাই ছিল। আন্দাজে বোধ হয় বয়স চল্লিশ হইতে পঞ্চাশের মাঝামাঝি হইবে। শরীর ইদানীং কিছু ভারি হইয়া পড়িয়াছে, কৃশাঙ্গী বৃদ্ধা মা পোয়ের পাশে তাহাকে রীতিমত মোটাই দেখায়; রং কিছু ময়লা, রূপচর্চার একেবারেই অভাব, সুতরাং যতটা কালো সে, পুরাপুরি ততটা কালোই তাহাকে দেখায়। রাগী মেজাজ এবং নির্ভীকতার জন্য সে রেঙ্গুনে বিখ্যাত। এ পর্যন্ত ঝগড়ায় কেহ কোনোদিন তাহার সঙ্গে পারিয়া ওঠে নাই, এক পয়সা কেহ কোনোদিন তাহাকে ঠকাইয়া লইতে পারে নাই। কিন্তু ফাঁকি দিবার চেষ্টাও সে কোনোদিন করে না। এইজন্য তাহার হোটেলে যাত্রীর অভাব কোনোদিনই হয় না।

আজও সে ঘুম হইতে উঠিয়া, আর এক মিনিট বসিয়া কুড়েমী করিল না। মস্ত একটা হাই তুলিয়া, একেবারে দাঁড়াইয়া পড়িল। নিদ্রিত মা পোয়েকে এক ঠেলা দিয়া উঠাইয়া দিল। তাহার পর বালিশ মাদুর উঠাইয়া লইয়া ঘরের ভিতর চলিল।

মুখ ধুইয়া বাহির হইয়া আসিতেই মা পোয়ে বলিল, "আজ আর বেরোব না, শরীরটা ভাল নেই। রাত্রে ভাল করে ঘুম হয়নি।"

মা তান্ বলিল, "ওমা, একটু ঘুম হয়নি বলে সারাদিন বসে কাটাবি? এইজন্যে তোর পয়সা হয় না।"

মা পোয়ে পাশের পাখাখানা তুলিয়া লইয়া হাওয়া খাইতে খাইতে বলিল, "যাক গে। পয়সা বেশী নিয়ে করবই বা কি? না ছেলে না পিলে। যা আছে তাতে আমার শ্রাদ্ধের খরচা বেশ চলে যাবে। তুই ত ক্রমাগতই জমাচ্ছিস, তোর পয়সা খাবে কে? কোন্‌কালে বিধবা হয়েছিস, আর ত বিয়েও করলি না?"

"বিয়ের মুখে ঝাঁটা", বলিয়া মা তান্ মুখ ছুটাইয়া দিল। "গায়ের রক্ত জল করে যে পয়সা করলাম, তা কোন্ লক্ষ্মীছাড়া এসে দুদিনে মদ খেয়ে উড়িয়ে দিক আর কি? আমাকে এখন বিয়ে করলে লোকে টাকার লোভেই ত করবে? আর আমি পিছন ফিরলেই আমার টাকা নিয়ে অন্য কোন মুখপুড়ী ছুঁড়িকে গহনা গড়িয়ে দিয়ে আসবে।"

রেলওয়ে স্টেশন খুব কাছেই। এই সময় ট্রেন আসিয়া পড়ার শব্দ শোনা গেল। মা তান্ বিবাহ সম্বন্ধে বক্তৃতা ছাড়িয়া ছুটিল উনান ধরাইতে, কারণ

যাত্রীরা আসিয়াই চায়ের জন্য গোলমাল লাগাইবে। মা পোয়ে নিজের বালিশ ঘরে রাখিয়া আসিল, এবং মা তানের নির্দেশ মত ঝাঁটা লইয়া ঘর বারান্দা ঝাঁট দিতে আরম্ভ করিল।

মিনিট পাঁচ পরেই সামনের রাস্তা দিয়া রেলগাড়ীর আমদানী যাত্রীর দল সহরের চতুর্দিকে যাত্রা স্থরু করিল। প্রথমে ঘোড়ার গাড়ীর দল, গাড়ীর মাথায় ট্রাঙ্ক, হোল্ডঅল্, স্যুটকেস্ প্রভৃতি উঁচুদরের মাল। তাহার পর রিক্‌শ, রেঙ্গুনের ভাষায় "লাঙ্কা", তাহাতেও যাত্রীর পায়ের কাছে বাক্স, বিছানা—কম্বল বা সতরঞ্চিতে জড়ানো। সর্বশেষে পদাতিকের দল। ইহাদের জিনিষপত্র ও পোষাক-পরিচ্ছদ একেবারে সহরবাসী বর্মার ধার দিয়াও যায় না। বেতের বাক্স, বিছানার পোঁটলা—সব নিজেরাই বহন করিয়া চলিয়াছে। কাহারও বা বাক্সও নাই, কাপড়ের পুঁটলি বাঁশের লাঠিতে ঝুলাইয়া তাহারা লাঠি ঘাড়ে করিয়া চলিয়াছে। পুরুষ মানুষগুলিরও মাথায় লম্বা চুল। খোঁপা করিয়া বাঁধা এবং রঙীন রুমাল দিয়া জড়ানো। সকলেরই পরনে পুরু ছিটের বা রং করা লুঙ্গী। রেশমের ধার ইহারা ধারে না, বেশভূষার পারিপাট্যও কিছু নাই। কাহারও পায়ে বর্মা চটি, কাহারও বা পা খালিই। কলিকাতার রাস্তায় পল্লীগ্রাম হইতে আগত কালীঘাটের যাত্রীদলকে যেমন চিনিতে একটুও বিলম্ব হয় না, ইহাদেরও দেখিবামাত্র চেনা যায় যে, রেঙ্গুনের অধিবাসী ইহারা মোটেই নয়।

গুটি ত্রিশ মানুষ আসিয়া মা তানের হোটেলের সম্মুখে দাঁড়াইল এবং মাথা হইতে ঘাড় হইতে জিনিষপত্র নামাইয়া রাখিতে প্রবৃত্ত হইল। উহাদের ভিতর বৃদ্ধ আছে, প্রৌঢ় আছে, যুবক এবং বালকও আছে। ইহারা নানা কাজে পল্লী-গ্রাম হইতে রেঙ্গুনে আসে। দোকানদার আসে জিনিষ কিনিয়া লইতে, চাষী আসে ক্ষেতে উৎপন্ন জিনিষ বিক্রয় করিতে, কেহ বা আসে কাপড়-চোপড় কিনিতে, কেহ বা আসে মহাজনের কাছে টাকা ধার করিতে। বালকবালিকা যাহারা আসে, তাহারা আসে শুধু স্ফূর্তি করিবার জন্যই। এখানে বায়োস্কোপ আছে, থিয়েটার আছে, বড় প্যাগোডা আছে। রাস্তার ধারে বসিয়া থাকিলেই এখানে হাজার রকম তামাসা দেখা যায়। দেশে এসব কিছুই নাই, আছে কেবল দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ, বন-জঙ্গল, ঝিল। মানুষও পরস্পরের কাছে থাকে না। একজনের বাড়ী হইতে আর একজনের বাড়ী কতদূরে তাহার ঠিকানা নাই। দিনের পর দিন কাটিয়া যায়, ঘরের লোক ছাড়া অন্য একটা

মানুষের মুখ তাহারা দেখে না। এইজন্য সুবিধা পাইলেই তাহারা দল বাঁধিয়া সহরে আসিয়া উপস্থিত হয়। কোন উৎসব বা পর্ব থাকিলে ত আর কথাই নাই। এপ্রিল মাসে বর্মীদের মস্ত উৎসব, কাজেই এ সময়ে পাড়াগাঁয়ের যাত্রীর ভীড় খুব বেশীই হয়।

যাত্রীর সংখ্যা দেখিয়া, মা তান্ সঙ্গিনীকে বলিল, "যাক্, যাস্‌নি ভালই হয়েছে। যা দল এসে পৌঁছল, একলা পেরে ওঠা দায় হত। 'জল-খেলার' সময়, লোক ত বেশী হবেই এর পর।"

প্রকাণ্ড ডেক্‌চীতে চায়ের জল বসাইয়া সে বাহিরে যাত্রীদের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বেশীর ভাগই তাহার পুরানো মক্কেল, বছরে দশবারো বার রেঙ্গুনে আসে। কয়েকজন নূতন মানুষও দেখা গেল। ইহার ভিতর একটি যুবক বিশেষ করিয়া তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অন্যদের চেয়ে তাহার বেশভূষার পারিপাট্য অধিক, মাথার চুলও ছোট করিয়া ছাঁটা। পায়ে বিলাতী জুতা। তাহার সঙ্গীদের মধ্যে তাহাকে নিতান্তই খাপছাড়া বেমানান দেখাইতেছিল। সকলের সঙ্গে দুচারটা কথা বলিয়া, মা তান্ আবার ভিতরে চলিয়া আসিল। মা পোয়েকে বলিল, "তুই চা-টা একটু দিয়ে দে, আমি বাজারটা ঘুরে আসি। সকাল সকাল গেলে সস্তায় জিনিষ পাওয়া যাবে।" প্রকাণ্ড এক ঝুড়ি লইয়া সে বাহিরে চলিল। যাত্রীদের হাত-মুখ ধুইয়া চা খাইতে উপদেশ দিয়া সে রিক্‌শ ডাকিয়া চড়িয়া বসিল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে মাছ তরকারি কিনিয়া ফিরিয়া আসিল। যাত্রীর দলের চা-পান শেষ হইয়া গিয়াছে। দুচারজন কাজে এদিক ওদিক বাহির হইয়া গিয়াছে, বেশীর ভাগ চাটাই বিছাইয়া ফুটপাথের উপর বসিয়া গিয়াছে। রাস্তার জনস্রোত, হাজার রকম গাড়ী ঘোড়া, মোটর দেখিয়াই তাহারা দিব্য আনন্দ লাভ করিতেছে। মা তান্ লক্ষ্য করিয়া দেখিল, নবাগত যুবকটি নাই, কোথাও বাহির হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, তখন তাহার এসব দিকে মন দেবার অবকাশ ছিল না, সমস্ত রান্নাবান্না তাহার সম্মুখে; রিক্‌শওয়ালাকে পয়সা এবং কিঞ্চিৎ গালাগালি দিয়া সে বাজারের ঝুড়ি লইয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

সকলে যখন খাইতে বসিল, তখনও দেখা গেল, সেই যুবক অনুপস্থিত। মা তান্ এক প্রৌঢ়কে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের সঙ্গের ছোকরা কোথায় গেল? সেই যে দিব্যি ফুলবাবু সেজে এসেছিল?"

প্রৌঢ় বলিল, "কে জানে?" কিসের ধান্দায় ঘোরে তারও ঠিকানা নেই।

কি করতে এসেছে তাও জানি না। ওর বাবা মান্দালেতে দোকান রেখে বেশ দু'পয়সা উপার্জন করে। ছোঁড়ার খাবার ভাবনা ত নেই, নিজের খেয়ালেই ঘোরে।"

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া যাত্রীর দল আপন আপন কাজে বাহির হইয়া গেল। ইহারা সাধারণতঃ একদিন একরাত মাত্র রেঙ্গুনে বাস করে। পরের দিন সকালেই ট্রেনে চড়িয়া যে যার ঘরে ফিরিয়া যায়।

মা তান্ ও মা পোয়ে নিজেদের খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে বসিল। মা পোয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "ছোঁড়াটা কিছু ত খায়নি। তার জন্যে কিছু রাখবে নাকি?"

মা তানের নিয়ম সকলকে সময় মত খাইতে হইবে। কাহারও জন্য সে বসিয়া থাকে না বা খাবার তুলিয়া রাখে না। কিন্তু ঐ যুবকটির প্রতি প্রথম দর্শনেই তাহার একটু মায়া জন্মিয়া গিয়াছিল। কেন যে, সে তাহা নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না। যুবক দেখিতে বেশ সুন্দর বটে, তবে রেঙ্গুনে সুপুরুষের কিছুমাত্র অভাব নাই, অমন চেহারা সে ঢের দেখিয়াছে।

মা পোয়ের কথার উত্তরে মা তান্ বলিল, "রেখে দে কিছু। ছোঁড়া এই প্রথমবার এসেছে, খেতে না পেলে কোনোদিন আর এমুখোও হবে না।"

মা পোয়ে খাবার তুলিয়া রাখিল। তাহার পর আহারাদি সারিয়া রাত্রে ঘুমের যেটুকু ব্যাঘাত হইয়াছিল, তাহা পুরাইয়া লইবার চেষ্টায় মাদুর পাতিয়া বারান্দায় গিয়া শুইয়া পড়িল। মা তানের দিবানিদ্রার অভ্যাস মোটেই ছিল না। সে মস্ত বড় একটা বর্মা চুরুট ধরাইয়া, মা পোয়ের পাশে বসিয়া রাস্তার লোক-চলাচল দেখিতে লাগিল।

ছোকরার কথা আরো দুই চারিবার তাহার মনে হইল। ছোঁড়া কোথায় ঘুরিতেছে ঠিকানা নাই। সকাল হইতে এক পেয়ালা চায়ের বেশী কিছুই তাহার পেটে পড়ে নাই। এক যদি রাস্তায় কিনিয়া খাইয়া থাকে! কিন্তু তাহা কি আর করিবে? হোটেলের খরচ তাহাকে পুরাই যখন দিতে হইবে, তখন আবার গাঁঠের পয়সা খরচ করিয়া সে খাইতে যাইবে কেন? মা তান্ মনে করিত, দুনিয়ার সকল মানুষই তাহার মত হিসাবী।

ছোকরা বেলা দুইটার সময় রোদে পুড়িয়া ফিরিয়া আসিল। তাহাকে বড়ই ক্লিষ্ট ও বিষণ্ণ দেখাইতেছিল। এক হাত লম্বা চুরুটটা মুখ হইতে নামাইয়া মা তান্ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় ছিলে এতক্ষণ? ভাত জুড়িয়ে ত বরফের মত হয়ে গেল।"

ছোক্‌রা বলিল, "কাজে ঘুরছিলাম, তাই দেরি হয়ে গেল।"

মা তান্‌ বলিল, "কি কাজে সহরে এসেছ? তোমাকে ত এই প্রথম দেখছি এখানে।"

ছোক্‌রা বলিল, "কাজ তেমন কিছু নয়। আমার এক বন্ধু এখানে এসেছে, তার সন্ধানে এসেছি।"

মা তান্‌ মনে মনে বলিল, "বন্ধু ত কত! কোনো ছুঁড়ী গুণ করেছে আর কি!" মুখে বলিল, "কোথা থেকে আসছ? তোমার নাম কি?"

যুবক বসিয়া বলিল, "আমার বাড়ী মান্দালে। নাম মঙ্‌লাট।"

মা তান্‌ বলিল, "চল, ভাত দিচ্ছি, খেয়ে নাও।"

যুবক বলিল, "ভিতরে কল নেই? একটু স্নান করে নিতাম।"

কল ছিল অবশ্যই, তবে মা তানের মক্কেলরা স্নান করিবার ইচ্ছা-প্রকাশ কেহই করিত না। মা তান্‌ বুঝিল, এ ছোক্‌রা সত্যই অন্য পর্যায়ের মানুষ। কল-ঘর দেখাইয়া সংক্ষেপে বলিল, "ঐখানে যাও।"

যুবক স্নানাহার সারিয়া বাহিরেই আসিয়া বসিল। মা পোয়ে তখনও বিপুল নাসিকা গর্জন করিয়া ঘুমাইতেছে। মঙ্‌লাট একটা ভাঙা কাঠের বাক্সের উপর বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি তোমার বোন নাকি?"

মা তান্‌ বলিল, "না, আমার আপনার জন কেউ নেই। ওকে রেখেছি আমার কাজের একটু সাহায্য করবার জন্য।"

মঙ্‌লাট হঠাৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আপনার কেউ না থাকাই ভাল।"

মা তান্‌ ভাবিল, "একেবারে আস্ত গিলে খেয়েছে গো। কে ছুঁড়ী কে জানে।" ব্রহ্মদেশীয় মানুষ মাত্রেরই তুক্‌তাক্‌, গুণ করা প্রভৃতিতে অগাধ বিশ্বাস। বৌদ্ধ ফুঙ্গী (সন্ন্যাসী), ভারতবর্ষীয় যাদুকর, জ্যোতিষ সকলেরই প্রতি ইহাদের গভীর ভক্তি। কত পয়সা যে জুয়াচোরে ইহাদের নিকট হইতে ঠকাইয়া লয় তাহার ঠিকানা নাই। অত্যাশ্চর্য মন্ত্রশক্তি, বশীকরণ প্রভৃতির গল্প ইহাদের মুখে লাগিয়াই আছে।

মঙ্‌লাটের পেট হইতে কথা বাহির করিবার জন্য মা তান্‌ বলিল, "আপনার জন না থাকা ভাল আর কি? আপদ-বিপদে দেখবার কেউ থাকে না। এখন গতর আছে খাটছি খাচ্ছি, কিন্তু যদি অসুখে পড়ি, মুখে জল দেবার কেউ নেই।"

যুবক কথাটা ফিরাইয়া দিল। নিজের সুখ-দুঃখের কথা সকলের কাছে প্রকাশ করার স্বভাব সব মানুষের থাকে না! বিশেষ করিয়া মা তান্ একেবারে অপরিচিত, এই প্রথম দিন তাহাকে সে দেখিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, "ঐখানের ওটা বর্মা বায়োস্কোপ না? কখনো যাও দেখতে?"

মা তান্ হাত উল্টাইয়া তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী করিয়া বলিল, "বায়োস্কোপ দেখবার সময়ও নেই, সখও নেই। ওসব তোমাদের বয়সেই সাজে। সাড়ে তিনটা বাজুক না, দেখবে ছোঁড়া-ছুঁড়ীর কিরকম ভীড় লেগে যায়।"

মঙ্লাট বলিল, "গিয়ে একটু দেখে এলে হয়, কাজ ত হাতে নেই। এক টাকা করে টিকিট বুঝি?"

মা তান্ বলিল, "বেশীও আছে, কমও আছে।"

সাড়ে তিনটা বাজিতে বড় বেশী দেরি ছিল না, অল্প একটু পরেই ব্যাণ্ডের বাজনা সুরু হইয়া গেল। যুবক জুতার ফিতা বাঁধিতেছে দেখিয়া মা তান্ জিজ্ঞাসা করিল, "কোনো কাজে তাহলে এসনি? এমনি বেড়াতেই এসেছ?"

মঙ্লাট বলিল, "কাজ অল্প একটু আছে। বাবার দোকানের দুচারটে জিনিষ কিনে নিয়ে যেতে হবে। তা সে কাল কিনলেই হবে। আজ মনটা ভাল নেই, একটু বায়োস্কোপ দেখেই আসি।"

মা তান্ একটু উৎসুক ভাবেই যেন জিজ্ঞাসা করিল, "কালও থাকবে নাকি? এখানেই?"

যুবক জুতার ফিতা বাঁধা শেষ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "হ্যাঁ দুচারদিন থাকবই মনে করছি! এখানে যখন উঠেছি, এখানেই থাকব।"

মঙ্লাট চলিয়া যাইতেই মা তান্ ঠেলা দিয়া মা পোয়েকে উঠাইয়া দিল। বলিল, নে ওঠ্, নাক ডাকাচ্ছিস যেন রেলের ইঞ্জিন। উনুনটা ধরাগে যা। এখনি সব এল বলে, গলা শুকিয়ে।" দুইজনেই কাজে ডুবিয়া গেল, একেবারে খাওয়া-দাওয়া চুকিলে পর তাদের ছুটি।

রান্নাঘরে গরমে টেঁকা যায় না, প্রাণ যেন বাহির হইয়া আসে। মা পোয়ে মশলা ইত্যাদি কি সব কিনিতে গেল, মা তান্ ভাত চড়াইয়া বারান্দায় একটু আসিয়া বসিল। সাড়ে পাঁচটা আন্দাজ বাজিয়াছে। বায়োস্কোপের একটা পালা শেষ হইল, হুড়মুড় করিয়া লোক বাহির হইতে লাগিল। মোটরের ভ্যাঁক্ ভ্যাঁক্, গাড়ীর ঘড়্ ঘড়্, মানুষের কলরবে, একেবারে চারিদিক মুখর হইয়া উঠিল।

হঠাৎ মা তান্ উঠিয়া পড়িল। মঙ্‌লাট একটি বাদামী রঙের লুঙ্গী-পরা মেয়ের সঙ্গে কথা বলিতেছে যেন। মা তানের বড় কৌতূহল হইল মেয়েটি কে দেখিবার জন্য। বারান্দা ছাড়িয়া রাস্তায় নামিয়া সে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গেল। মঙ্‌লাটই বটে! এই ছুঁড়ীর সন্ধানে মান্দালে হইতে এতদূরে আসিয়াছে? দেখিতে মন্দ নয়, তবে এমন কি রূপসী? মেয়েটাকে কোথায় যেন সে দেখিয়াছে বলিয়া মনে হইল, কিন্তু স্থির করিতে পারিল না। যাহা হোক তখন আর বেশী সময় ছিল না, ভাত পুড়িয়া যাইবার ভয়ে সে তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া ঢুকিল।

খাওয়া-দাওয়া সারিতে একটু রাতই হইয়া যাইত। সাড়ে ন'টা দশটার আগে প্রায়ই হইত না। রাত্রে আর মঙ্‌লাট দেরি করিল না, অন্য সকলের সঙ্গেই বসিয়া খাইল। মা তানের ইচ্ছা ছিল বায়োস্কোপে দৃষ্টা যুবতীর বিষয় একটু কথা বলে, কিন্তু অন্য লোকের সামনে বলিতে পারিল না।

রাত দশটা বাজিতে বাজিতেই ফুটপাথ একরকম খালি হইয়া যায়। বর্ষা এখনও আরম্ভ হয় নাই। কাঠের তক্তা, চাটাই, পাটি প্রভৃতি বিছাইয়া যাত্রীর দল রাস্তা জুড়িয়া শুইয়া পড়িল। সারাদিন গরমে ঘোরাঘুরি করার ফলে অধিকাংশই কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল। মঙ্‌লাট কেবল একটা চুরুট ধরাইয়া তাহার চাটাইয়ের উপর বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিল।

মা তান্ এবং মা পোয়েও কাজকর্ম আহারাদি সারিয়া বাহির হইয়া আসিল। দারুণ গরম। ঘরের ভিতর ঘুমানো মানুষের অসাধ্য। যাত্রীরা সকলেই বাহিরে শুইয়াছিল, বারান্দার তক্তপোষগুলি খালিই পড়িয়াছিল। উহারা দুজনে ঐখানেই শুইবে ঠিক করিয়া বালিশ প্রভৃতি বাহির করিয়া আনিল। নিদ্রার সঙ্গে বুড়ী মা পোয়ের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। শয়ন করিবামাত্রই সে ঘুমাইয়া পড়িত এবং তাহার প্রবল নাসিকাধ্বনি পাড়ার ছেলেমেয়েদের কৌতুকের জিনিষ ছিল।

মা তানের অত শীঘ্র ঘুম আসিত না। অন্তত আধঘণ্টা চুরুট ফুঁকিয়া তবে সে শুইতে যাইত। আজও নিজের বিপুল বর্মা চুরুটটি ধরাইয়া, তক্তপোষের উপর আসিয়া বসিল। মঙ্‌লাট তখনও জাগিয়া বসিয়া আছে, অন্য যাত্রীরা সকলেই নিদ্রিত। মা তান্ কি বলিয়া তাহার সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় যুবকই কথা আরম্ভ করিল। মা তানের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখান থেকে চিমেওাইন্ কত দূর?"

মা তান্ মুখ হইতে চুরুট নামাইয়া বলিল, "তা দূর আছে। কিন্তু দূর হলেই বা কি? হেঁটে ত কেউ যায় না। মোটর-বাসে যায়, না হয় ট্রেনে যায়।"

মঙ্‌লাট বলিল, "সব সময় কি গাড়ী পাওয়া যায়? কাল সকালে একবার যেতে হবে।"

মা তান্ বলিল, "সবসময়। সকাল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত। এই যে বায়োস্কোপ দেখছ, এর ত অর্দ্ধেক লোক আসে ওখান থেকে। রাত বারোটার মোটর-বাসে চড়ে সব ফিরে যায়।'

যুবক বলিল, "আমার সেই বন্ধুটির খোঁজ পেয়েছি। তারা চিমেণ্ডাইনেই থাকে, একবার যেতে হবে তাদের বাড়ী

মা তান্ আবার চুরুটটা মুখে দিয়া টানিতে লাগিল। ছুঁড়ীকে কোথায় দেখিয়াছে, এতক্ষণে তাহার মনে পড়িল! চিমেণ্ডাইনেই বটে। মা তানের এক দূর-সম্পর্কের ভাই থাকে সেখানে, পাশের বাড়ীতেই ঐ ছুক্‌রী থাকে, বাপ নাই, নিজের মাও নাই, এক সৎমা আছে। সৎমার ছেলেপিলে আছে কয়েকটা।

যুবক আর গল্প চালাইবার চেষ্টা করিল না। মা তান্‌ও শুইয়া পড়িল, তবে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাহার ঘুম আসিল না।

পরদিন ভোরবেলা যাত্রীর দল পোটলা পুঁটলি বাঁধিয়া, টাকাকড়ি চুকাইয়া দিয়া, রেলওয়ে স্টেশনের পথে বিদায় হইয়া গেল। কেবল বাকি রহিল মঙ্‌লাট। মা পোয়েও ভোরেই চলিয়া গেল ফুলের ডালা লইয়া। মা তান্ চা ·ইয়া খানিকক্ষণ চুপচাপ বসিয়া রহিল। আজ তাহার হাত একেবারে খালি, কোনো কাজ নাই। মনটা, কেন জানি না, তাহার একটু ভার হইয়া ছিল। পাশের ঘরের বর্মা যুবতীটির নিশ্বাস ফেলিবার সময় নাই। তিন চারিটি ছেলেমেয়েকে মুখ ধোয়ানো, খাওয়ানো, সামলানো, কম ব্যাপার নয়। ইহাকে মা তান্ কোনো দিন হিংসা করে নাই, বরং উহার দারিদ্রের জন্য কৃপার চক্ষেই দেখিত। কিন্তু আজ হঠাৎ তাহার মনে হইল, একদিক দিয়া মেয়েটি তাহার অপেক্ষা ভালই আছে। তাহার স্বামী আছে, সন্তানসন্ততি আছে! তাহার নিশ্বাস ফেলিবার সময় নাই সত্য, কিন্তু জগৎসংসার তাহার কাছে পরিপূর্ণ। বাহিরের লোক না আসিলেও সে গ্রাহ্য করে না, বুড়া বয়সে কোথায় গিয়া মরিবে সে ভাবনাও তাহার নাই।

মঙ্‌লাট উঠিয়া, চা খাইয়া বাহির হইয়া গেল। মা তান্ আর কিছুক্ষণ

শুধু শুধু বসিয়া থাকিয়া ঝুড়ি লইয়া বাজারে চলিল।

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া মঙ্ লাট সকাল সকাল বাহির গেল। যাইবার আগে, ঘরে ঢুকিয়া পোষাক-পরিচ্ছদ বদল করিল, জুতাজোড়াও পালিশ করিয়া লইল। মা তান্ বারান্দায় বসিয়া তাহার রকম দেখিতে লাগিল এবং মনে মনে চটিতে লাগিল। ছোঁড়ার রকম দেখ না। যেন কোন রাজনন্দিনীর সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছে। মেয়েটা দেখিতেই বা কি এমন ভাল? সৎমায়ের ঝাঁটা খাইয়া ত দিন কাটে, পরনের লুঙ্গীও দুখানার বেশী চারিখানা আছে কি না সন্দেহ।

মা পোয়ে ফুল বিক্রী করিয়া আসিয়া দেখিল, মা তান্ আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বকিতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, "কার সঙ্গে ঝগড়া হল আবার আজ?"

মা তান্ বলিল, "ঝগড়া হতে যাবে কেন লা? আমার কি ঝগড়া করাই ব্যবসা?"

মা পোয়ে অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "না, তা কেন। চটে রয়েছিস্ কিনা তাই জিগ্ গেস করছি।"

মা তান্ বলিল, "চটি কি সাধে? চটি মানুষের আক্কেল দেখে। মরুকগে থাক্। আয় আয়, খাবি আয়।"

খাইয়া দাইয়া মা পোয়ে অভ্যাস-মত নাক ডাকাইয়া নিদ্রা সুরু করিল। মা তান্ খানিকক্ষণ চুরুট ফুঁকিয়া উঠিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। ঘরের কোণে তাহার বাক্স-প্যাটরা বছরের পর বছর একই ভাবে সাজানো আছে, কো-দিন সে খুলিয়াও দেখে না। আজ কি মনে করিয়া সে বড় কাঠের বাক্সটা খুলিয়া ফেলিল। তাহার ভিতর মূল্যবান রেশমী লুঙ্গী, মিহি কাপড়ের লেশ দেওয়া জামা, গলায় জড়াইবার পাতলা রেশমের টুকরা, থরে থরে সাজান। কোণে একটা ছোট কারুকরা হাতীর দাঁতের বাক্স। সেটাও খুলিয়া দেখিল। সব ঠিক আছে। নীলা-বসান চুড়, চুনীর বোতাম, হীরার কানফুল, হীরার আংটি, চুনী-বসানো দু'ছড়া সোনার গলার হার, সোনার গিল্টী করা পায়ের মল। এসব মা তানের বিগত বধূজীবনের সম্পত্তি, এখন আর কোনো কাজে লাগে না। মুখে মাখিবার তানাখা, বড় বড় পাথর বসানো চিরুণী, মখমলের চটি জুতা পর্যন্ত সে তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছে। কাহার জন্যই বা রাখিয়াছে? একটা মেয়েও জন্মায় নাই পেটে যে, তাহাকে সাজাইয়া দেখিয়া সুখ হইবে। মরিলে পর এসব কোন্ হতভাগীর গর্তে যাইবে কে জানে?

পোষাক-পরিচ্ছদগুলির দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া, সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাক্সের ডালাটা বন্ধ করিয়া দিল। মনে মনে বলিল, "থাক, এখন আবার এ পরতে গেলে লোকে হাসবে। যখনকার যা, তখনকার তা।"

বিকালে মা তান্ আবার বাজার যাইতেছে দেখিয়া মা পোয়ে বলিল, "তরকারি ত ঢের রয়েছে, আবার বাজার যাচ্ছিস্ যে?"

মা তান্ বলিল, "একটু মাংস নিয়ে আসি। অনেক দিন মাংস খাই নি।"

মা পোয়ে বলিল, "তা ছোঁড়া চলে গেলে আনলেই ত হয়। এখন রাঁধলে তাকেও ত দিতে হবে?"

মা তান্ বলিল, "তা দেব এখন। ছোঁড়া খায় ত এই ক'টা। সারাক্ষণ কিসের চিন্তায় মজে আছে ঠিকানা নেই।"

মা পোয়ে অবাক হইয়া চুপ করিয়া গেল। মা তানের এ ধরনের বদান্যতা কেহ কখনও দেখে নাই।

মঙ্লাট ফিরিয়া আসিল সন্ধ্যার সময়। চা খাইয়া, রাস্তার ধারে বসিয়া আকাশপাতাল ভাবিতে লাগিল।

মা পোয়ের উপর রন্ধনের ভার দিয়া মা তান্ও বাহিরে আসিয়া বসিল, কিন্তু গল্প মোটেই জমিল না। মঙ্লাট অন্যমনস্কভাবে দু-একটা উত্তর দেয়, আবার চুপ করিয়া ভাবে। মা তান্ শেষে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল; ছোঁড়াকে ধরিয়া তাহার চড়াইতে ইচ্ছা করিতেছে। চং দেখ না!

রাত্রে তাহার অত যত্নে প্রস্তুত মাংস তাহাকে এবং বুড়ী মা পোয়েকেই খাইতে হইল। মঙ্লাট কিছুতেই খাইল না, চাদর মুড়ি দিয়া নিদ্রার ভাণ করিয়া শুইয়া রহিল।

সকাল বেলা মা তান্ বলিল, "আজ শরীরটা ভাল ঠেকছে না। কাল অতগুলো মাংস খাওয়া ঠিক হয়নি। তুই আজ ফুল বেচতে যাস্নে, রান্নাটা একটু দেখ।"

মা তানের শরীর খারাপ হইতে জীবনে কেহ কখনো দেখে নাই। কিন্তু তাহার মেজাজকে মা পোয়ে সমীহ করিয়া চলিত, কাজেই আর উচ্চবাচ্য না করিয়া সে থাকিয়া গেল। মা তানের প্রতি তাহার ভালবাসাও ছিল খানিকটা, কাজেই একটু চিন্তিতও বোধ করিতে লাগিল। কেহ মাসীকে গুণটুন করিল নাকি? ঐ ছোঁড়াটার ধরনধারণ ত ভাল ঠেকে না। সব মানুষ চলিয়া গেল, সে কিসের জন্য মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে? কাজও ত তাহার কিছু দেখা যায় না।

সে আসার পর হইতেই মা তানের একটু পরিবর্তন সুরু হইয়াছে। কিন্তু মা তান্‌কে কিছু বলাও যায় না এ বিষয়ে। সে হয়ত তখনি ঝাঁটা লইয়া তাড়া করিয়া আসিবে।

মঙ্‌লাট সকাল হইতেই বাহির হইয়া গিয়াছিল, চায়ের জন্যও অপেক্ষা করে নাই। মা তানের মেজাজ ইহাতে আরো বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছিল। এতকাল এত মানুষের সঙ্গে সে কারবার করিয়াছে, কাহাকেও লইয়া তাহাকে এতটা ভুগিতে হয় নাই। কেন যে সে এত বিচলিত হইতেছিল, তাহা নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না। মঙ্‌লাটের দৃষ্টি নিতান্তই অন্য স্থানে, না হইলে মা তানেরও মা পোয়ের মত সন্দেহ হইত যে যুবক তাহাকে গুণ করিয়াছে। কথাটা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু একটা দীর্ঘনিশ্বাস তাহার বুক হইতে বাহির হইয়া আসিল। গুণ করিলেও হয়ত ছিল ভাল! কিন্তু কি দেখিয়া করিবে? একদিকে সুন্দরী যুবতী, আর একদিকে বিগত-যৌবনা রূপ-হীনা হোটেলওয়ালী। মঙ্‌লাটকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু কি এ দৈবের বিড়ম্বনা! এতদিন সে নিরুপদ্রবে কাটাইয়া, এই বুড়া বয়সে মজিল কেন? তাহার কাজে মন লাগে না, সারাক্ষণ প্রাণ ছটফট করে। অপরিচিতা যুবতীর প্রতি হিংসায় জ্বলিতে থাকে। মঙ্‌লাটকে সম্মুখে দেখিলে, তাহার সহিত দুইটা কথা বলিতে পারিলে সে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পায়। ছোঁড়া কোথা হইতে মরিতে আসিল? সে কি যাদু জানে? দুই তিন দিনের ভিতর মা তানের এমন অবস্থা হইল কি করিয়া?

মা তান্ দুপুরে ভাত পর্যন্ত খাইল না, মঙ্‌লাটের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল। মা পোয়ের ঠোঁট অবধি নানা কথা ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু ভয়ে সে কিছু বলিল না। অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, কি কাণ্ডই মা তান্ করিতেছে, লোকে বলিবে কি? তাহার পরিচিত এক ফুঙ্গী ছিল, তুকতাক্, ঝাড়-ফুঁকে তাহার নাম খুব। মা তানের ভূত ছাড়াইবার জন্য তাহার শরণ লইবে কি না, মা পোয়ে ভাবিতে লাগিল।

মঙ্‌লাট ফিরিয়া আসিতেই মা তান্ গলা চড়াইয়া ঝগড়া সুরু করিল। খাওয়ার সময় খাওয়া নাই, শোয়ার সময় শোওয়া নাই, এসব কি ঢং? কে তাহার ভাত আগলাইয়া বসিয়া থাকিবে? এখানে তাহার দশটা বিয়ে করা বৌ বসিয়া আছে না কি?

মঙ্‌লাট অবাক হইয়া ক্যাল ক্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। মা তানের এমন

মূর্তি আগে সে কখনও দেখে নাই। যে কদিন সে এখানে আছে, মা তান্ তাহাকে খুবই যত্ন করিয়াছে, এমন কি সে আছে বলিয়া অন্য যাত্রীদের সঙ্গে গালাগালি বকাবকি করে নাই। সুতরাং এমন ভাবে আক্রান্ত হইয়া সে একেবারে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

মা তান্ নিশ্বাস লইবার জন্য থামিবামাত্র সে বলিল, "আমার জন্য বসতে ত আমি বলিনি! ভাত ফেলে রাখলেই পারতে। আমার অনেক দূর যেতে হয়েছিল, তাই দেরি হয়ে গেল।"

মা তান্ স্বর নরম করিয়া বলিল, "একটা মানুষ সকাল থেকে গলা শুকিয়ে বসে আছে জানলে, কে কাঁড়ি গিলতে বসতে পারে? হাজার হোক, আমার ঘরে রয়েছ ত?"

মঙ্লাটের চোখ দুটো কেমন যেন করুণ হইয়া আসিল। সে বলিল, "তিন দিন আগে ত আমায় মোটে দেখেছ, অথচ আমার জন্যে এত মায়া তোমার? আর যারা কত বছর ধরে দেখছে, তারা পারে ত আমার গলায় ছুরি দেয়।"

মা তান্ বলিল, "উপরের গিল্টি দেখে ভুললেই ঐ দশা হয়। সব গিল্টির নীচে সোনা থাকে না।"

মঙ্লাট কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কার কথা বলছ? আমি গিল্টি দেখে ভুলেছি কে তোমায় বললে?"

মা তান্ বলিল, "তোমার কথাই বলছি। আমায় কেউ কিছু বলেনি, কিন্তু কপালে চোখ ত দুটো আছে? বায়োস্কোপে কার দেখা পেয়েছ তাও জানি, আর কার লোভে চিমেগুাইন্ ছুটছ দিনে দশবার করে, তাও জানি।"

মঙ্লাট জিজ্ঞাসা করিল, "মা শিন্‌কে তুমি চেন নাকি?"

মা তান্ বলিল, "চিনি না, তবে ওদের বাড়ীর কাছেই আমার ভাইয়ের বাড়ী। অনেকবার ওদের দেখেছি, ওদের হালচাল সবই জানি।"

মঙ্লাট কি যেন বলিতে গিয়া চুপ করিয়া গেল। মা পোয়েও সেই সময় নিদ্রা হইতে উঠিয়া পড়ায়, আর কথাবার্তা কিছু হইল না।

ইহার পরের দিনটা কাটিল প্রায় একইভাবে। মঙ্লাট সমস্ত দিনটা বাহিরে ঘুরিয়াই কাটাইল। মা তান্ সেদিনও শরীর খারাপের ছুতা করিয়া মা পোয়েকে ধরিয়া রাখিল, এবং খাওয়া-দাওয়া ছাড়িয়া সারাদিন বারান্দায় বসিয়া চুরুটের পর চুরুট ধ্বংস করিতে লাগিল। মা পোয়ে রান্নাঘরে বসিয়া

কত কি যে মানত করিতে লাগিল, তাহার ঠিকানা নাই। ফুঙ্গীর কাছে যাওয়া সে একরকম স্থির করিয়া ফেলিল। রাত্রের রান্না হইয়া গেলেই সে ভাইঝিকে দেখিবার ছুতা করিয়া বাহির হইবে।

কিন্তু অত কষ্ট আর তাহাকে হইল না। বিকেল বেলা মঙ্‌লাট অনেকগুলি জিনিসপত্র কিনিয়া ফিরিয়া আসিল। তাহার চেহারা অত্যন্ত ম্লান ও বিষণ্ণ। মা তান্ তাহার অপেক্ষায় বারান্দায় বসিয়াই ছিল। যুবককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি সব এত সওদা করে নিয়ে এলে ?"

মঙ্‌লাট বলিল, "এ সব আমার বাবার ফরমাশী জিনিষ। কাল ভোরের ট্রেনেই আমি বাড়ী চলে যাব।"

মা তানের বুকের ভিতরটা হঠাৎ ঠাণ্ডা হইয়া আসিল। চলিয়া যাইবে, কালই ? তাহার মুখ দেখিতে পাইবে না, কথা শুনিতে পাইবে না! উঃ, জগৎটা কি ভয়ানক কালো, কি বিরাট শূন্যতা এখানে!

কিন্তু মুখে বলিল, "ভালই, দেশে গিয়ে কাজকর্মে মন দাও। রাস্তায় রাস্তায় ছুঁড়ীর পিছনে ঘুরলে ত আর ভাত কাপড় মিলবে না ?"

মঙ্‌লাট নীরবে জিনিষপত্রগুলা গুছাইয়া বাক্সে ভরিতে লাগিল। মা পোয়ে একটু দূরে সরিয়া যাইতেই মা তান্ নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "মা শিন্ তোমায় বিয়ে করছে না তা হলে ?"

মঙ্‌লাট মুখ না তুলিয়াই বলিল, "তার ত আশা কিছু দেখছি না।"

মা তানের মনের পাষাণ ভারটা অনেকখানি যেন লঘু হইয়া গেল। জগতে আশার বিনাশ নাই। মা তান্‌কে বিবাহ করিতে ইচ্ছা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, তবু যতক্ষণ মা শিন্‌কে সে বিবাহ না করিতেছে, ততক্ষণ মা তান্ মনে মনে আকাশ-কুসুমের মালা গাঁথিতে ছাড়িবে না।

মঙ্‌লাট যাইবার সময় টাকাকড়ি চুকাইয়া দিতে আসিল। মা তান্ টাকা লইল না। মঙ্‌লাটের প্রসারিত হস্ত ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "তোমার কাছে টাকা নেব না।"

মঙ্‌লাট বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন ?" মা তান্ বলিল, "আমার মান্‌তি আছে, মাসে একজন লোককে বিনা খরচায় খাওয়াই। আবার রেঙ্গুনে এলে এখানেই উঠো কিন্তু।"

"নিশ্চয়ই," বলিয়া মঙ্‌লাট রিক্‌শ ডাকিয়া চড়িয়া বসিল, এবং দেখিতে দেখিতে চোখের অদৃশ্য হইয়া হইয়া গেল।

মা তানের কাছে বিশ্বসংসার যেন বিস্বাদ নিরর্থক হইয়া গেল। পাঁচ দিন আগেকার তাহার যে জীবন, আর আজকার জীবন, কি বিপুল ব্যবধান! পূর্বের জীবনের নিশ্চিন্ততা, স্বাধীনতার ভিতর আর তাহার ফিরিবার উপায় নাই। কোথা হইতে, কেমন করিয়া, এ কঠিন মায়ার ফাঁস তাহার গলায় আসিয়া জড়াইল? কোথায় তাহার মুক্তি? যাহা পাইবার নয়, তাহারই জন্য মাথা কুটিয়া কি তাহার চিরটা দিন কাটিয়া যাইবে? জগতে কাহারও অনিষ্ট সে কোনদিন করে নাই, পরিশ্রম করিয়াছে, খাইয়াছে, তবে কেন দেবতা তাহাকে এমন দুঃখ দিলেন? এ ত শুধু দুঃখ নয়, এ লজ্জাও যে সুগভীর। কাহারও সহানুভূতি সে পাইবে না, অন্যের হাস্যের খোরাকই ইহাতে জুটিবে। ঘরের কোণে রক্ষিত বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে সে মাথা কুটিতে লাগিল। সে মুক্তি চায়, যেমন করিয়া হোক। ভালবাসাহীন জীবনও তাহার স্বর্গ ছিল, কিন্তু এই বেড়া-আগুনের ভিতর সে কেমন করিয়া বাঁচিবে? দেবমূর্তির প্রশান্ত মুখে কোথাও করুণার রেখা দেখা দিল না।

মা তান্ সব দিক দিয়াই কেমন একরকম হইয়া গেল। সে খায় না, ঘুমায় না, কাজকর্ম দেখে না। হঠাৎ সাজ পোষাকের ঘটা তাহার লাগিয়া গেল। এখন সে রেশমের লুঙ্গী পরে, লেশ-বসানো জামা পরে, চুলের যত্ন করে। মান্দালয়ের দিকের ট্রেন আসিবার সময় হইলেই সে একেবারে অস্থিরভাবে ঘর আর বাহির করে। মঙ্ লাট আবার নিশ্চয়ই আসিবে, অন্ততঃ আরো একবার ত আসিবে? মা তানের জন্য নাই আসিল, কিন্তু তাহার প্রেয়সী মা শিন্ও ত এই সহরেই বাস করে!

একদিন চিমেণ্ডাইনে ভাইয়ের বাড়ীতে সে গিয়া হাজির হইল। তাহার নূতন সাজসজ্জা লইয়া ভাই, ভাইয়ের বউ অনেক রসিকতা করিল, বর কবে আসিতেছে তাহারও খোঁজ করিল।

মা তান্ সে সব কথা উড়াইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পাশের বাড়ীর ওরা কোথায় গেল?"

ভাজ বলিল, "একটু দূরে ঘর নিয়ে কম ভাড়াতে। মেয়েটার ত বিয়ে শুন্ছি।'

মা তানের মাথা ঘুরিতে লাগিল। কোনমতে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায়? কার সঙ্গে?"

তাহার ভাজ বলিল, "কে এক ছোঁড়া আসে রোজ, তার সাথে জিগ্‌গেস

করলে বলে এখানে কোন দোকানে কেরানীর কাজ করে! ঠিক কিনা জানি না।"

মা তান্ আর বসিল না। বাড়ী ফিরিবার পথে মানৎ করল, মা শিনের বিবাহ যদি মঙ্লাট রেঙ্গুনে আসিবার পূর্বে হইয়া যায় তাহা হইলে সে প্যাগোডায় সোনা দিবে। ট্রেন আসিবার সময় তাহার ব্যাকুলতা আরো যেন বাড়িয়া উঠিত। সে ঘরের ভিতর টিঁকিতে পারিত না। সাজ-গোজ করিয়া ফুটপাথের উপর পায়চারি করিত। বুড়ী মা-পোয়ে বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে মাথা কুটিয়া কুটিয়া কপাল ফুলাইয়া ফেলিল, ফুঙ্গীকে চুপি চুপি কত পয়সা দিল তাহার ঠিকানা নাই, কিন্তু মা তান্কে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিল না। পাড়ার ছেলে-মেয়েরা মা তান্কে লইয়া রঙ্গ করিয়া ছড়া বাঁধিতে লাগিল।

আবার একদিন হুড়মুড় করিয়া একপাল যাত্রী আসিয়া জুটিল। যতক্ষণ দূর হইতে তাহাদের দেখা যাইতেছিল, ততক্ষণ মা তান্ একেবারে আগ্রহে ঔৎসুক্যে অধীর হইয়া ফুটপাতে ঘোরাঘুরি করিতেছিল। বুড়ী মা-পোয়ে মনে মনে দেবতাকে ধন্যবাদ দিতেছিল, কাজে কর্মে ডুবিয়া থাকিলে, মা তানের ঘাড়ের ভূত নামিয়া যাইবে।

কিন্তু কার্যতঃ যাহা ঘটিল, তাহাতে বুড়ী মা পোয়ে একেবারে সকল আশা ছাড়িয়া দিল। যাত্রীর দল কাছে আসিয়া পোটলা-পুঁটলি নামাইবার জোগাড় করিতেছে, এমন সময় মা তান্ বলিল, এখানে না হে, আরো একটু এগিয়ে মঙ চিটির হোটেলে যাও। আমি হোটেলের ব্যবসা তুলে দিয়েছি।"

যাত্রীর দল অবাক হইয়া মা তানের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহারা পোটলা-পুঁটলি তুলিয়া লইয়া আবার অন্য হোটেলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।

মা পোয়ে মাথার চড় মারিয়া বসিয়া পড়িল। শয়তানে মাগীকে একেবারে গিলিয়া খাইয়াছে। মা তানের ভয় ভুলিয়া গিয়া সে চিৎকার করিয়া উঠিল, "তুই কি ক্ষেপলি মা তান্? ঐ ছোঁড়ার জন্যে নিজের গলায় ছুরি দিবি? সে ত শুনলে হাসবে। তোর কি আর বিয়ের বয়স আছে?"

মা তান্ হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল। মা পোয়ের কথার উত্তর না দিয়া ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল। মা পোয়ে ঠিকই বলিয়াছে। মঙ্লাট হাসিবে। মা তান্ মরিতেছে বটে, কিন্তু ইহাতে সে ছাড়া আর কেহ দুঃখের কারণ দেখিবে না। বুড়ী মরিতেছে যুবককে ভালবাসিয়া, এ ত হাসিরই জিনিষ।

তাহার মাথায় যেন রক্ত চড়িতে লাগিল। এত অধঃপতন তাহার

হইয়াছে। এখন তাহার সামনেই তাহাকে লইয়া লোকে হাসাহাসি করে। ছোট ছেলেমেয়েগুলা ছড়া বলে, চেঁচায়, হাততালি দেয়। একমাস আগে, এ পাড়ায় কেহ তাহার মুখের উপর একটা কথা বলিতে সাহস করিত না। দু পয়সা ধার পাইবার আশায় কত লোক আসিয়া হাতজোড় করিত।

কাহার জন্য সে এমন করিয়া মরিতেছে? মঙ্‌লাট কখনও তাহার হইবে না। দেবমূর্তির সামনে সে পড়িয়া রহিল, প্রাণপণে প্রার্থনা করিতে লাগিল, তাহার মন হইতে এই অসম্ভবের প্রলোভন কাটিয়া যাক্, সে আবার মানুষের মত হইয়া উঠুক।

পরদিন সকালে ট্রেনের সময় সে জোর করিয়া নিজেকে সংযত করিল। ঘরের ভিতরেই বসিয়া রহিল। ফুলফল লইয়া দেবতার পূজার জোগাড় করিতে লাগিল।

হঠাৎ শুনিল বাহিরে কে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "মা তান্ ঘরে নাই?"

এ যে মঙ্‌লাটের গলা! দেবতা, সংকল্প, সব ভুলিয়া সে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। সত্যই ত মঙ্‌লাট।

তাহাকে দেখিয়া মঙ্‌লাট বলিল, "ওখানে থাকতে শুনেছিলাম, তুমি হোটেল তুলে দিয়েছ, তবু একবার দেখে যেতে এলাম।"

মা তান্ ব্যগ্র হইয়া বলিল, "কিসের হোটেল তুলে দিয়েছি? জিনিষপত্র নামিয়ে রাখ। মাঝে শরীর ভাল ছিল না বলে যাত্রী ফিরিয়ে দিয়েছিলাম।"

মঙ্‌লাট জিনিষ নামাইয়া রিক্‌শওয়ালাকে বিদায় করিয়া দিল। মা তান্ ছুটিয়া গিয়া তাহার জন্য চা লইয়া আসিল। মা পোয়ে রাগে বিড়বিড় করিতে করিতে ফুলের ঝুড়ি লইয়া চলিয়া গেল।

মা তান্ তাড়াতাড়ি বাজার করিয়া আনিল, বেশ ভাল দেখিয়া। রান্নার জোগাড় করিতে করিতে বলিল, "এবার খাওয়া-দাওয়া করবে ত ঠিক মত? না সেবারের মত খালি টো টো করবে?"

মঙ্‌লাট বলিল, "কাল ঠিক করে বলতে পারব।"

মা তান্ জিজ্ঞাসা করিল, "তার মানে কি? আজ বলতে পার না কেন?"

মঙ্‌লাট্ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "আজ ত গিয়ে দেখি। শুনছি মা শিনের অন্য কোথায় সম্বন্ধ হচ্ছে। তা যদি হয়, তাহলে এরপর জেলের ভাত খাব, না হয় ফাঁসি যাব।"

মা তান্ রান্না ফেলিয়া কাঠের পুতুলের মত বসিয়া রহিল। মা শিনের জন্য মঙ্লাট ফাঁসি যাইতেও প্রস্তুত। এতভেও কি মা তানের আক্কেল হইবে না? খানিক পরে তাকাইয়া দেখিল মঙ্লাট চলিয়া গিয়াছে।

রান্নার জোগাড় তেমনি পড়িয়া রহিল। মা তান্ দরজায় তালা লাগাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। মোটর-বাসে চড়িয়া একেবারে চিমেণ্ডাইনে উপস্থিত হইল।

ভাজের কাছে খোঁজ লইয়া সে মা শিনের বাড়ি শীঘ্রই বাহির করিয়া ফেলিল। মা শিন্ বাহিরে বসিয়া উল বুনিতেছিল, মা তান্‌কে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে চাও? মাকে ডেকে দেব?"

মা তান্ তাহার পাশে উবু হইয়া বসিয়া বলিল, "না, মাকে দরকার নাই, আমি তোমার কাছেই এসেছি।"

যুবতী অবাক হইয়া বলিল, "কিন্তু তোমাকে ত আগে কখনও দেখিনি "

মা তান্ বলিল, "তা নাই বা দেখলে? আমি তোমায় অনেকবার দেখেছি। মঙ্লাটকে জান ত? আমি তার আপনার লোক।"

যুবতীর মুখের ভাব বদ্‌লাইয়া গেল। একটু কঠিন স্বরে বলিল, "তা কি মনে করে এসেছ? মঙ্লাট আবার এখানে এসেছে না কি? তাকে এমুখো হতে বারণ করো, অনর্থক একটা খুনোখুনি হবে।"

মা তান্ বলিল, "তুমি তাকে বিয়ে করতে চাও না কেন? তোমাব কেরানী কি তার চেয়ে দেখতে সুন্দর?"

মা শিন্ হাত তুলিয়া একটা সোনার চুড়ী দেখাইল। বলিল, "দেখেছ? সে দিয়েছে। তোমার মঙ্লাটকে নিঙড়লেও এক ফোঁটা সোনা বেরোবে না।"

মা তান্ হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল, "এর জন্যে? আচ্ছা, তুমি মঙ্লাটকে বিয়ে যদি কর, যত সোনা-দানা চাও সব পাবে।"

যুবতী বিরক্ত হইয়া বলিল, "কথায় চিঁড়ে ভেজেনা গো। চোখে দেখলে বিশ্বাস হয়।"

মা তান্ বলিল, "তা আমার সঙ্গে যাও যদি ত দেখাতে পারি।"

যুবতী কি মনে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "আচ্ছা, একটু দাঁড়াও, মাকে যা হোক একটা কিছু বলে আসি। না হলে চেঁচিয়ে মরবে।"

মা তান্ বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে চটি পায়ে দিয়া মা শিন বাহির হইয়া আসিল; বলিল, "চল। কোথায় যাবে? রেঙ্গুনে ত?"

মা তান্ বলিল, "হ্যা"। আধ ঘণ্টার মধ্যে তাহারা মা তানের বাড়ি আসিয়া পৌছিল। তখনও মা পোয়ে বা মঙ্লাট কেহই ফেরে নাই। তালা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া মা তান্ বলিল, "এই দেখ।"

নিজের কাপড়ের বাক্স, গহনার বাক্স সে খুলিয়া ফেলিল, বলিল, "এর ভিতর যা কিছু আছে সব। তোমার কেরানী এত দিতে পারবে? এখনই দেব। কিন্তু ঐখানে দেবতা বসে, তাঁর সামনে শপথ কর যে মঙ্লাটকে বিয়ে করবে।"

লোভে, আনন্দে যুবতীর দুই চোখ জল্ জল্ করিতে লাগিল। সে দামী রেশমী লুঙ্গীগুলির উপর হাত বুলাইয়া দেখিতে লাগিল। আংটি হাতে পরিয়া দেখিল, গলায় হার ঝুলাইয়া দেখিতে লাগিল, নীলার চূড় দুইটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, "সব দেবে আমায়?"

মা তান্ বলিল, "সব দেব, যদি ওকে বিয়ে করে মান্দালে চলে যাও এখনি।"

যুবতী মিনিট দুই ভাবিয়া লইল, তাহার পর বলিল, "আচ্ছা।" মা তান তাহাকে বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল।

গাড়ী ডাকিয়া তাহাতে গহনা ও কাপড়ের বাক্স সমেত যুবতীকে উঠাইয়া দিল। ঘরে আর প্রবেশ করিল না। মা পোয়ের অপেক্ষায় বাহিরে বসিয়া রহিল।

মা পোয়ে বেলা বারোটায় আসিল। মা তান্‌কে বাহিরে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি, এমন করে বসে আছিস্ যে? রান্না চড়াসনি?"

মা তান্ বলিল, "না, ওসব থাক্ এখন। তুই যা পারিস দুটো রেঁধে খাস্। মঙ্লাট এলে তাকে চিমেওাইন চলে যেতে বলিস্, আমি তার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছি।"

মা পোয়ে বিস্মিত হইয়া বলিল, "তুই আবার কি ব্যবস্থা করলি? তুই কোথায় যাচ্ছিস্?"

মা তান্ ঘরের ভিতরের শূন্য কোনটা দেখাইয়া বলিল, "ঐ দেখ। তাহলেই বুঝবি।"

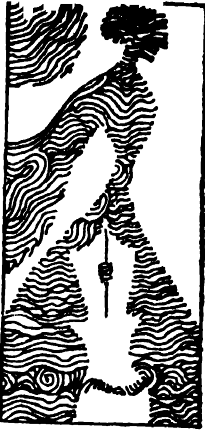
মা পোয়ে একেবারে বসিয়া পড়িল। চীৎকার করিয়া বলিল, "সব দিয়ে দিয়েছিস্? পোড়াকপাল! বুড়ো বয়সে তোর গতি হবে কি?"

মা ভান্ বলিল, "গতি যাতে হয়, সেই জন্মেই দিলাম। ওর লোভ মন থেকে না গেলে আমার আর রক্ষে ছিল না। কুকুরের মরণ হত। এখন আবার মানুষের মত হলাম। জানি, তাকে আর কোনদিন চোখে দেখব না। কতদিনের জন্যে পিণ্ড যাচ্ছি, তুই ঘর-দোর দেখিস, যাত্রী এলে রাখিস্।"

মা পোয়ে তবু বিলাপ করিয়াই চলিল, "অত টাকার জিনিষ দিয়ে দিলি ?"

মা ভান্ বলিল, 'যাক গে। কোন্ কাজে আমার লাগত ? মেয়েও নাই, ছেলেও নাই। টাকা এখনও কিছু আছে, আরো যতদিন বাঁচি, রোজগারই করব। মরবার সময় ভাইকে বলে যাবো, আমার নামে যেন প্যাগোডার দু হাত জায়গা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেয়।"

মা ভান্ খালি হাতেই বাহির হইয়া গেল। বুড়ী মা পোয়ে বিলাপ করিয়াই চলিল। শয়তানের উদ্দেশ্যে গালাগালি করিতে লাগিল।



সেকালের রোমান্স

সরলাবালা সরকার

'রোমান্স' জিনিসটা চিরকালের। তবে দেশ কাল ও পাত্র ভেদে তার ধরনটা ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়।

আমার এই কাহিনী এমন এক প্রেমের কাহিনী, যে-কাহিনীর নায়িকার বয়স তেরো বৎসর। মেয়েটির নাম বিজয়িনী, ডাক নাম বিজু।

আট বৎসর বয়সেই বিজুর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল ; বাবা ছিলেন সরকারী বড় চাকুরে, তাই তাঁকে দেশে দেশে বেড়াতে হত, বিজুও বাপের সঙ্গে নানা দেশ বেড়িয়েছে। শ্বশুরবাড়ি বাংলা দেশের এক পল্লীগ্রামে। বিয়ের চার বছর পরে সে একবার শ্বশুরবাড়ি এসেছে, আর এসেই সে তার স্বামীর প্রেমে পড়ে গিয়েছে।

স্বামীর সঙ্গে প্রেমে পড়া, এটা অবশ্য একটা নূতন কথা, কেন না বিয়ের মন্ত্রই হচ্ছে 'যদিদং হৃদয়ং তব, তদিদং হৃদয়ং মম।' সুতরাং হিন্দু বিবাহমন্ত্রই যখন প্রেমের গ্রন্থিবন্ধন, তখন নূতন করে আবার প্রেমে পড়ার কথাই উঠতে পারে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল, কেন না বিয়ের পর বিজুর সঙ্গে তার স্বামী বিনয়ের খুব কমই দেখা হয়েছে, আবার যদি বা দেখা হয়েছে সে কথা বিজুর বিশেষ মনেই নেই।

পশ্চিমে থেকে থেকে বিজুর স্বভাবটা এমন হয়েছিল যে সে বাঙালীর ঘরের বৌ হয়ে কি করে যে একগলা ঘোমটা টেনে একেবারে ভাল মানুষটি হয়ে থাকবে বিজুর মা সে কথা ভাবতেও পারতেন না। তাই যখন বিজুর শ্বশুরবাড়ি যাবার পর তিনি তাঁর বেয়ানের পত্রে জানলেন যে, 'বিজু বড়ই সরল ও লক্ষ্মীমেয়ে' তখন

তাঁর মন অনেকটা হাল্‌কা হল। কিন্তু শাশুড়ী একথাও লিখেছেন "পশ্চিমে থেকে বাংলা দেশের আদব কায়দা কিছু শেখে নি সেজন্য ভাববেন না, দু দিনেই সব শিখে নেবে।"

বিজুর শ্বশুরবাড়ি গ্রাম্য জমিদারের বাড়ি। শ্বশুর—জেলার বড উকিল, কিন্তু ছেলেরা কেউই বিদ্বান নয়। বিজুর স্বামীর বয়স বাইশ বৎসর, কিন্তু সে এনট্রান্স পাস করার পর পডাশুনা ছেড়ে দিয়ে গ্রামের ছেলেদের মোড়লগিরি করছে। চাষাদের সঙ্গে তার বিষম ভাব, এমন কি মাঠে গিয়ে মাঝে মাঝে লাঙ্গল চষেও দেয়। চাষীরা বলে, "ন বাবুর মত আর মানুষ হয় না, ওঁকে তো দ্যাবতা বললেই হয়।" কিন্তু বাড়িতে তার উৎপাতে বৌ-ঝিরা সব সময় তটস্থ থাকে, কোন সময় তার কি খেয়াল হয় কে জানে! তাই বিজয়িনী শ্বশুরবাড়ি এলে মেজবৌ একদিন বলেছিল, "এবার তো নবৌ আসছে, এবার তুমি জব্দ হবে, তার সঙ্গে এমন করে লাগতে পারবে না।" এখন এক পারিবারিক নাটক অভিনয়ের দৃশ্যের বর্ণনায় আসছি।

১২৫১ সাল। তখনকার দিনের একান্নবর্তী পরিবার। দরদালানে একসঙ্গে প্রায় চল্লিশ জন খেতে বসেছে, খুড়্‌তুতো, জেঠ্‌তুতো, পিস্‌তুতো ভাইয়েরা, ভাগনে এবং শ্যালকও আছে, গুরুজনদের মধ্যে আছেন ছোটকাকা ও পিসেমশাই। বধূরা এবং মেয়েরা পরিবেশন করছে, গৃহিণী আছেন রান্নাঘরে।

পরিবেশনে বিজুর খুবই উৎসাহ। মাছের থালায় দু হাতই জোড়া, তাই মাঝে মাঝে তার ঘোমটা সরে যাচ্ছে। মেজো ননদ এসে মাঝে মাঝে ঘোমটা ঠিক করে দিচ্ছেন। গৃহিণীর আদেশ, নবৌকে কিছু বলা চলবে না তবে সহবত অবশ্য শিখিয়ে দিতে হবে।

বিজুর স্বামী বিনয় হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "মেজ্‌দা, দেখ, বড় মুড়োটা দেখছি আমারই পাতে পড়েছে। তোমরা কখানা করে মাছ পেয়েছ দেখি, আমার পাতে দেখ বড় বড পাঁচখানা মাছ।"

মেজদাদা বললেন, "বিনয়, থাম্ দেখি। বড মাছটা তুইই তো ধরেছিলি তবে মুড়োটা তোর পাতে পড়বে না কেন?"

বিনয় বললে, "পরিবেশন করছে কে, ও নবৌ বুঝি? ঘোমটা দিয়ে আছে বলে আগে চিনতে পারি নি, আমি বলি বুঝি মেজবৌদি। তবে তো আমার পাতে থালা শুদ্ধ মাছই পড়বে। মা, মা, ওকে কেন মাছ পরিবেশন করতে দিলে?"

মা তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে বাইরে এসে বললেন, "বিনু, আবার কি নষ্টামি জুড়েছিস্? কেন ওকে ওরকম করিস্? আমিই তো বলেছিলাম তোর পাতে বড় মুড়োটা দিতে। কাল আবার অভয়কে দেব। পুকুরে কি মাছের অভাব হয়েছে?"

বিজয়িনী আড়ষ্ট, থালা হাতে করে দাঁড়িয়ে। তার চোখের জলে ঘোমটা ভিজে গিয়েছে। শাশুড়ী এসে তার হাত থেকে থালাটি নিয়ে বললেন, "ছিঃ, কাঁদে না, যাও মা, হাত মুখ ধুয়ে এস।"

মুড়োটি বিনয় খায় নি, পাতেই পড়ে আছে। সেজবৌ ফুস্ ফুস্ করে বললে, "দেখলে তো ভাই, নঠাকুরপো মুড়োটা নবৌয়ের জন্যে পাতে রেখে গেল।"

কথাটা শাশুড়ীর কানে গেল, বললেন, "পাতে রেখেছে তাতে হয়েছে কি? যাও মা, বিনুর পাতে গিয়ে বোসো। স্বামীর পাতের মাছের মুড়ো খেলে স্বামীর আয়ু বৃদ্ধি হয়, সেজপিসিমা বলেন, শোন নি?"

দু ঘণ্টা পরে। বিজয়িনী ডাঁসা পেয়ারার সন্ধানে পেয়ারা গাছের তলায় গিয়েছে। গিয়ে দেখল, বিনয় গাছতলায় দাঁড়িয়ে।

বিনয়কে দেখে বিজুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কাছে গিয়ে বললে, "আমাকে গোটা কতক পেয়ারা পেড়ে দেবে?"

বিনয় বললে, "গোটা কতক? ও বাবা, আস্বা তো কম নয় দেখছি। বল না কেন, গাছে যতগুলো পেয়ারা আছে সবই পেড়ে দাও।"

বিজয়িনী: "সব পেড়ে দিতে বলব কেন? সবগুলো তো আর ডাঁসা পেয়ারা নয়?"

বিনয়: "আচ্ছা, পেয়ারা পেড়ে দেব। তার আগে বল্ দেখি, ঘাটে তোদের চুপি চুপি কি পরামর্শ হচ্ছিল?"

বিজুর মুখ মলিন হয়ে গেল। সে বললে, "ছাড়, মার ঘরে যাব, মা ডেকেছেন পাকা চুল তুলে দিতে।"

কিন্তু বিনয় জোর করে তার হাত চেপে ধরল, বললে, "সেটি হবে না। কি পরামর্শ হচ্ছিল না বললে ছেড়ে দেব না। বল, শিগ্গির বল পরামর্শটি কি? বনভোজন হবে? ও না, বোধ হয় চাষীদের খেজুর গাছের রস চুরি করা হবে, তাই না?"

বিজু বললে, "রস চুরি করব কেন, তুমি ভারি বাজে কথা বল। রোজ তো এক কলসী করে জিরেন রস চাষীরা দিয়ে যায়।"

"তা হলে কি হবে, কৃষ্ণযাত্রা? হ্যাঁ, এইবার ঠিক ধরেছি।"

বিজু বললে, "তাই বুঝি, বেহুলার ভাসান তো করা হবে। দেখো নি সেদিন। কি সুন্দর বেউলার ভাসান গান করেছিল মুসলমানপাড়ার ছেলেরা?" বলতে বলতে চমকে উঠল, : "ওমা! কি হবে? দিদিরা যে বারণ করেছিল বলতে?"

সন্ধ্যার সময় কোন কাজ থাকে না। রান্নার পাট দিনে দিনেই চুকিয়ে রাখা হয়, কেবল সময়মত গরম ভাতটি নামিয়ে নেওয়া, আর সেও রাত্রি দশটা এগারোটায়। কাজেই সন্ধ্যাতে প্রায়ই কড়ি খেলার আসর বসে, দশ-পঁচিশ, ছক্কা-পাঞ্জা, বাঘবন্দী খেলা। তার মধ্যে দশ-পঁচিশই প্রধান খেলা। দশ-পঁচিশের ঘরে ঘরে যে চারটি করে কড়ি বসানো হয় তার জন্য কত রঙ-বেরঙের কড়ি সংগ্রহ করা হয়েছে, আবার দানের সাতটি কড়িও বাছাই-করা বড় বড় কড়ি।

কিন্তু আজ আর কড়িখেলা নয়, আজ হবে বেহুলার ভাসানের গান। দর-দালানের উপরের বড় ঘরটা তালা চাবি দিয়ে বন্ধ করাই থাকে, কেবল একবার ঘরটা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করবার জন্য খোলা হয়। দেয়ালে বড় বড় ছবি আছে সেগুলোও মাঝে মাঝে মুছে পরিষ্কার করা হয়। চাবিটা থাকে ভাঁড়ার-ঘরের তাকের উপর। আজ সেই ঘরেই বেহুলার ভাসান করা হবে।

বেহুলার ভাসানে কান্নার পালা অনেক আছে, আবার তার মধ্যে সং এনে হাসির খোরাকও জোগান দেওয়া হয়। মাথায় পাগড়ী বাঁধা রামসিং জমাদারের সে কি ভঙ্গী, সে কি লাঠি ঘুরানো, যেন বাতাসের সঙ্গে লড়াই করছে। আবার যেই শুনেছে একটা "ম্যাঁও" শব্দ, অমনি "ডাকু আয়া, ডাকু আয়া" বলে তার পালানোর ভঙ্গিমা দেখে দর্শকেরা হেসে কুটি কুটি হয়ে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে। তখনকার দিনে লোকের আমোদবোধের বিশেষ প্রবণতা ছিল।

বেহুলার নৌকায় 'গোদা' গিয়ে উঠেছিল, বেহুলা যখন স্বামীর দেহ নিয়ে ভেসে যাচ্ছিলেন কলার ভেলায় করে; নৌকা নয়, কলার ভেলা। সেই 'গোদা'কে নিয়েও সং দেওয়া হ'ত। গোদা পায়ে তুলো আর পাট জড়িয়ে 'গোদ' তৈরী করেছে, আর থপ্ থপ্ ক'রে হাঁটতে হাঁটতে গোদা-পা তুলে তুলে তার তিন বৌকে শাসাচ্ছে, "মারব এই গোদা পায়ের লাথি।" আবার গানও করছে নেচে নেচে,—

"আমায়, 'গোদা, গোদা' করিস নে গোদা বড় ভাগ্যিমান।
গোদার ডোলে গরু, শামুখে ধান।"

একটা ছোট বাছুরকে ধান রাখা ডোলের ভিতর ক'রে নিয়ে এসেছে, আবার একটা শামুখে ধান ভরে এনেছে। সেই শামুখটা সকলের সম্মুখে তুলে ধরে বলছে "ত্যাখ্ তোরা আমার কত ধান ; গোলায় আর কত ধানই ধরবে, আমার শামুখের ধানে সম্বৎসর ওড়ন্ ফোড়ন্, অতিথ-পতিত, এসো জন বসো জন সব কুলান হয়ে যাবে।" আবার বেহুলার নৌকা ধরবার জন্যে মাটিতে উপুড় হয়ে সাঁতারের অভিনয়।

এই অভিনয়গুলিই বিশেষ করে দর্শকদের মন আকর্ষণ করত, তাই মাঠে ঘাটে গান শোনা যেত—

"গোদা গোদা করিস নে গোদা বড় ভাগ্যিমান।"

আজ গোদা সেজেছে সেজো বৌ, পায়ে তুলো জমিয়ে গোদ করা হয়েছে, আবার শামুখে ধান ভবেও আনা হয়েছে কিন্তু ডোলটি খালি ডোল, বাছুর তাতে নেই।

এদিকে রামসিং-জমাদারবেশী মেজবৌ লাঠি ঘাড়ে পাঁয়তারা কষতে কষতে এমন এক লাফ দিয়েছে যে জানলার সার্সি ভেঙে চুরমার এবং ঠিক সেই সময়েই বিনয় ঘরের মধ্যে এসে হাজির।

অভিনয়কারিণীগণ এর পর যেভাবে লাঞ্ছিতা হলেন, তা বর্ণনা করা যায় না। দুজন দুজন করে চুলের বিনুনিতে বিনুনিতে বেঁধে এক এক কোণে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বিনয় বললে, "ঠিক এইভাবে আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাক, তারপর ছুটি হবে।"

বিজু কোথায়? বিজুকে কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না। সেই বিশ্বাস-ঘাতিনীই যে সমস্ত সন্ধান দিয়েছে তা বুঝতে কারও আর বাকি রইল না।

বেচারা বিজয়িনা! এই কাণ্ডের পর সে একেবারে একঘরে হ'ল। তার সঙ্গে আর কেউই কথা বলে না—সে সকলের পিছনে পিছনে বেড়ায়, কিন্তু কেউই তার দিকে ফিরেও তাকায় না।

শাশুড়ী ব্যাপারটি লক্ষ্য করলেন, বললেন, "হ'ল কি তোদের? বিজু অমন মুখ কালি করে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? রান্নাঘরের দুয়োর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল, তোরা ওকে কাজে ডাকিস নি বুঝি?"

সেজ মেয়ে বিমলা বললে, "না, ওকে আমরা আমাদের কোন কাজেই ডাকব না। ও ভারী দুষ্টু, যে কথাটি হবে সেইটি গিয়ে ন-দার কানে তুলে দেবে। এদিকে দেখে মনে হয় ভাজা মাছটি যেন উল্টে খেতে জানে না।"

বিজয়িনী কাঁদছিল, বললে, "মা, আমি তো ওর কাছেই যাই নি, আমি তো তোমার ঘরে আসছিলাম, তোমার পাকা চুল তুলতে, ও যে জোর করে ধরে নিয়ে গেল।"

সেজ ননদ মুখ নাড়া দিয়ে বললে, "নিয়ে গেল তো নিয়ে গেল, ওকে সব বলে দিতে গেলি কেন ?"

বিজয়িনী অবিশ্রান্ত চোখের জল ফেলছিল : "আমি তো বলতে চাই নি, আমি তো বলতে চাই নি—ও যে, ও যে—"বলতে বলতে কান্নায় তার কথা বন্ধ হয়ে গেল।

আবার পরের দিন। মায়ের অনুরোধে বৌয়েরা ও মেয়েরা অপরাধিনীকে ক্ষমা করেছে, সঙ্গে নিয়ে বাগানে গিয়েছে। বিজু একেবারে কৃতার্থ।

বাগানের মাঝখানে একটা ঝাপড়া তেঁতুলগাছ। বিজু মনের আনন্দে অনবরত বকে চলেছে, "জান ভাই, জান ভাই, উনি হাত গুনতে পারেন, তোমাকে সব বলে দেবেন, সব ঠিক মিলে যাবে। এই যে গাছটা দেখছ, এটা কি গাছ বল দেখি ?"

ননদ বিমলা বললে, "ওটা তো তেঁতুলগাছ, তুই কখনও বুঝি তেঁতুলগাছ দেখিস নি ?"

বিজু বললে, "না ভাই, ওটা তেঁতুলগাছ নয়। উনি বলেছেন, ওটা এক রকমের তালগাছ। দেখো, তালের সময় ও-গাছে তাল ধরবে।"

এই অদ্ভুত কথায় সকলে হেসে উঠল। কিন্তু বিজুর তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে বলতে লাগল, "দেখো, তালের সময় ও-গাছে তাল ধরবে। উনি বলছিলেন যে, তোমরা গাছটাকে তেঁতুলগাছ মনে কর, কিন্তু আসলে ওটা তালগাছ। কি জন্যে যেন ওর পাতাগুলো তেঁতুলগাছের মত হয়ে গিয়েছে, উনি সে কথা আমাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন, আমি ভুলে গেছি।"

মেজ-জা ধমক দিয়ে উঠল, "থাম্ দেখি নেকি, অত 'উনি, উনি' করিস নে। তোর 'উনি' সগ্গ্ থেকে নেমে এসেছেন। আমরা তো মানুষ নই, আমাদের তো চোখ নেই !"

কিন্তু বিজয়িনীর দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ গাছে তাল ধরবেই। সে বললে, "আচ্ছা, দেখো, তালের সময় গাছে তাল ধরে কি না !"

বিজয়িনী যখনই বিনয়কে এড়িয়ে চলে, চতুর বিনয় তখনই বুঝতে পারে নিশ্চয় কিছু পরামর্শ চলছে। আর তখনই সে "বিজু, বিজু", ডাক ছাড়ে।

সেই "বিজু বিজু" ডাক শুনলে বিজয়িনী আর দূরে থাকতে পারে না। বিনয়েরও আর বিজয়িনীর গোপন কথা বের করে নিতে কষ্ট হয় না।

তাই আজকাল গোপন-সভায় বিজয়িনীর আর প্রবেশের অধিকার নেই। বিজু যতই কাকুতি-মিনতি করুক কেউই তাকে দলে নেয় না, বলে, "বিজু তো! ন-ঠাকুরপো কাছে এলে ওর কি আর জ্ঞান থাকে? দেখ না, যে দিকে ন-ঠাকুরপো, ওর নজরটি কেবল সেই দিকেই আছে।"

গ্রীষ্মের দুপুর, বিনয় ঘরের মেঝেয় শীতলপাটি পেতে শুয়ে আছে। ছেলেদের খাওয়া হয়ে গিয়েছে, এইবার মেয়েরা পাতে পাতে খেতে বসবে। বিজয়িনী কি একটা কাজে ঘরে এসেছিল, বিনয় ডাকল, "বিজু, বিজু, এদিকে আয় দেখি।"

বিজয়িনী এগিয়ে এসে বলল, "মা খেতে ডাকছেন, কি চাই তোমার?"

"খেতে ডাকছেন? বলিস কি? তোর যে চোখ লাল হয়েছে দেখছি, নিশ্চয় জ্বর হয়েছে। এদিকে আয় তো! ও বাবা! এ যে বিষম জ্বর! শো, শো, শীগ্‌গির খাটের ওপর শুয়ে পড়্। আমি লেপ এনে তোর গায়ে ঢাকা দিচ্ছি।"

সেই দারুণ গ্রীষ্মে বিজয়িনী লেপ গায়ে দিয়ে হাসফাঁস করছে। শাশুড়ী শুনলেন, বৌয়ের জ্বর এসেছে। ছেলের মুখে সংবাদ পেয়ে শাশুড়ী ঘরে এসে বধূর অবস্থা দেখলেন, বললেন, "দুখানা লেপ দেখছি গায়ে চাপিয়েছ, খুব কি শীত করছে?"

বিজয়িনী বললে, "না মা, ভয়ানক গরম হচ্ছে।"

শাশুড়ী ব্যাপারটি তখনই বুঝতে পারলেন, বললেন, "ওঠো, ভাত খেতে চল। বাছা রে, একেবারে ঘেমে ভিরথুস্তি। বিনু, হতভাগা ছেলে, আয় এদিকে, বৌটাকে খুন না করে বুঝি তোর শান্তি হবে না?"

বিনয় দুয়ারের কাছে মুখ বাড়িয়ে বললে, "ও গিয়ে বিছানায় লেপ মুড়ি দিল কেন, আমার কি দোষ? নিজের জ্বর হয়েছে কি না সেটুকু বুদ্ধি নেই?"

বিজয়িনী তবুও উঠতে রাজী হয় না, বলে, "উনি বলেছেন খুব জ্বর হয়েছে।"

শাশুড়ী রেগে উঠলেন, "বলুন উনি। জ্বর হয়েছে না ওর মাথা হয়েছে। আয় এদিকে, ওকে উঠতে বল্, আমি চলে যাচ্ছি।"

সেদিনের এই ঘটনায় বিজয়িনীকে অনেক ঠাট্টা সহ্য করতে হয়েছিল, কিন্তু

উপহাসের কারণটি যে কি বিজয়িনী বুঝতে পারে নি।

ইতিমধ্যে একদিন চিঠি এল দুঃসংবাদ নিয়ে, বিজয়িনীর বাবা হঠাৎ মারা গিয়েছেন।

চিঠি পড়ে গৃহিণী স্তম্ভিত। তিনি তো জানেন বিজয়িনী তার বাবাকে কতখানি ভালবাসে। সময় ও সুযোগ পেলেই সে সকলকেই বাবার কথা শোনায়। বিশেষ করে শাশুড়ীর যখন পাকাচুল তুলতে বসে তখন অনর্গল বকে যায়, কেননা সে বেশ বুঝতে পারে শাশুড়ী মনোযোগ দিয়েই তার কাহিনী শোনেন এবং শুনতে ভালবাসেন।

গৃহিণীর মনে পড়ছিল, সরলা বালিকার সেই উজ্জ্বল দৃষ্টি, সেই হাসিমাখা মুখের ভাব। বাবার কথা বলতে বলতে সে যেন আত্মহারা হয়ে যেত। অবশ্য বাপের বাড়ির সকল খুঁটিনাটি ঘটনাই সে বলত। মার কথা, ভাইবোনদের কথা, ঝগড়ু সহিসের বৌয়ের কথা, এমন কি মেনি বেড়ালটার কথাও বাদ দিত না। কিন্তু বাবার কথা বলতে গেলেই তার মুখ সবচেয়ে যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠত, গৃহিণী তা লক্ষ্য করেছেন বৈ কি!

আজ যখন বিজয়িনী শুনবে তার বাবা আর নেই, তখন তার কি অবস্থা হবে সে-কথা যেন মনে করাই যায় না।

গৃহিণী ছেলেকে ডেকে তার দুই হাত ধরে মিনতি করে বললেন, "লক্ষ্মী বাবা, রাত্রেই যেন মেয়েটাকে এই দারুণ খবর শোনাস নে।"

খাওয়াদাওয়ার পর যে যার ঘরে শুতে গেল। গৃহিণী উদ্বিগ্ন হয়ে বিজয়িনীর শোবার ঘরের দিকে কান পেতে থাকলেন।

বিজয়িনী স্বামীর কাছে এলেই খুশী হয়ে উঠত, আর অনর্গল নানা কথা বলত। স্বামী সে কথায় কান দিচ্ছে কি না সে দিকে তার খেয়াল থাকত না। আজও ঘরে এসে আনন্দময়ী মহা আনন্দের দিনে কি কি ঘটেছে অর্থাৎ মেজদিদি, সেজদিদি ও ঠাকুরঝি যখন পুকুরঘাটে গিয়েছিল, তখন মেজদিদি কিভাবে পা পিছলে পড়ে গেল, সেজদিদি ঘড়া বুকে দিয়ে সাঁতরাবার সময় ঘড়াটা হঠাৎ কি করে ডুবে গেল, আবার সেজদিদি ডুব-সাঁতার দিয়ে কি কৌশলে ঘড়াটি তুলল ইত্যাদি বর্ণনা দিতে দিতে নিজের মনেই মাঝে মাঝে হেসে অস্থির, তখন বিনয় হঠাৎ বলে উঠল, "হ্যাঁ, খুব তো হাসিখুশি হচ্ছে, এদিকে কি চিঠি এসেছে জান? তোমার বাবা মারা গিয়েছেন।"

"কি বললে?" বিজু-চমকে উঠল, "বাবা মারা গিয়েছেন বলে চিঠি এসেছে?

তোমার পায়ে পড়ি, কি হয়েছে বল। আমার বাবা নেই? আমার বাবা?"

বিজুর গলা দিয়ে "বাবা গো!" শব্দের আর্তনাদ শুনেই গৃহিণী ছুটে এলেন।

দরজায় ঘা দিচ্ছিলেন তিনি: "দোর খোল্, শীগগির দোর খোল, লক্ষ্মীছাড়া ছেলে! বউটাকে তুই নিকেশ না করে ছাড়বি নে দেখছি।"

সেই আনন্দ-প্রতিমা কেমন যেন হয়ে গেল। তার মুখের দিকে যেন আর চাওয়াই যায় না। গৃহিণী কোন রকমে তাকে দিয়ে চতুর্থী করালেন, ভাবলেন বধূকে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। মা-ও তো শোকাতুরা, মা মেয়েকে দেখে হয়তো কিছু শান্তি পাবেন, আর বিজুও মায়ের কোলে গিয়ে একটু জুড়বে।

কিন্তু কাকে পাঠাবেন? বিজু বিষম জ্বরে শয্যাগত হয়ে পড়ল, তার আর উঠবার শক্তি নেই।

জ্বরের ঘোরে অজ্ঞানের মত হয়ে থাকে, কিন্তু বিনয় কাছে আসলেই যেন বুঝতে পারে তখন চোখ খুলবার চেষ্টা করে।

গৃহিণী সিদ্ধেশ্বরীর কাছে ডাব-চিনি মানত করেছেন, বিজুর বাপের বাড়িতেও খবর দেওয়া হয়েছে।

বিনয় ছটফট করে বেড়ায়, বিজয়িনীর কাছে বেশীক্ষণ বসতে পারে না। বাড়ির সকলেই পালা করে রাত জাগে, সকলেরই মুখ মলিন, বাড়ির আনন্দের উৎস যেন একেবারে শুষ্ক হয়ে গিয়েছে।

গৃহিণী সব সময়েই বধূর ঘরে আছেন, তাঁর রান্নাবান্নায় আর মন নেই। মাঝে মাঝে বিনয়কে বলেন, "তুই গিয়ে ওর কাছে একটু বোস্, তা হলে হয়তো হুঁশ আসবে।"

হুঁশ এল, কিন্তু একেবারে শেষ অবস্থায়। স্বামীর হাত দু হাতে জড়িয়ে ধরে বিজয়িনী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল, "তুমি,—তুমি তো আমায় ভালবাসতে না!"

এইটিই তার শেষ কথা।

বিনয় যেন পাগলের মত হয়ে গেল। মার কোলে মুখ লুকিয়ে অস্ফুট স্বরে কেবলই বলতে লাগল, "মা, মা, সে কিনা বলে গেল, আমি তাকে ভালবাসতাম না!"



বর

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

স্নেহের লীলা,

তোর পত্রখানা সেদিন পেয়েছি। আমার কথা বিশেষ করে জানতে চেয়েছিস বলে তোকে আজ সব লিখছি।

তুই তো জান্‌তিস—আমি তোকে আগে বলেছিলাম মানুষকে কাউকে না কাউকে ভালবাসতেই হবে। আমি ভীষণ ভালবাসায় পড়ে গিয়েছিলুম। কথাটা শুনে হাসিসনে যেন, কেননা আমি নেহাৎ কাঠখোট্টা-গোঁয়ার গোছের মেয়ে ছিলুম। তোরা যখন বিয়ে আর ভালবাসার কথা বলতিস আমি তখন কেবল হাসতুম। হাসতুম কেন জানিস? তোদের মনের ভাব দেখে। মানুষ হলে যে তাকে ভালবাসতে হবে, এমন কোন কথা থাকতে পারে না।

আমার জীবনে সুযোগ এসেছিল বলেই আমি এ পর্য্যন্ত কাটিয়ে আসতে পেরেছিলুম। আমি ছোটবয়সে বিবাহিতা এবং তারপরে তিনটী বছর যেতে না যেতে বিধবা হয়েছিলুম বলে তোরা সব কত দুঃখই না করতিস। বাবা নিষ্ঠাবান হিন্দু, তাই আমার তের চৌদ্দ বছর বয়েস হতে ব্রহ্মচর্য্য শিখাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলেন। আমায় সংযমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, যেন একটু আমার পদস্খলন না হয়। আমি হাসতুম, বাপমার ভয়েতে কিছু নয় বলে উড়াতে গিয়েছিলুম, কেন না, আমি ঠিক জান্‌তুম নাটক নভেলের প্রেমের মত অপর প্রেম আমার হৃদয়ক্ষেত্রে কিছুতেই জন্ম নিতে পারে না। আমি যার বিরুদ্ধাচারণ এ পর্য্যন্ত করে আসছি তাই শেষটায় আমার ভাগ্যে ঘটবে এ-কি একটা কথা।

এই সময় আমাদেরই দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় বিমলদা আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে এলেন। তিনি এখন সবেমাত্র এম, এ পাশ দিয়ে বার হয়েছেন, সংসারের চাপ তখনও মাথায় পড়েনি, তাই মনটা দিনরাত স্বপ্নের মধ্যে ডুবে থাকতো।

প্রথমটায় তাঁর সঙ্গে মিশতে একটু সঙ্কুচিতা হতুম, তারপর বেশ মিশে গেলুম। তিনি কত বিদেশের গল্প করতেন, আমি অবাক হয়ে শুনতুম।

তাঁর বাড়ী হতে প্রতিদিন তাঁর স্ত্রীর পত্র আসত। যে কয়দিন তিনি আমাদের বাড়ী ছিলেন, এর মধ্যে একটা দিন তাঁর পত্র আসার বিরাম দেখতুম না।

তাঁর কাছ হতে যে পত্র যেত তা দেখতে পেতুম না, কিন্তু তাঁর স্ত্রীর পত্র ঘরঝাঁট দিতে গিয়ে রোজই পেতুম। তিনি কেন যে পত্রগুলি এমন আলগা ফেলে রাখতেন তা জানিনে। ভালবাসাপূর্ণ এই পত্রগুলি যে আর কেউ দেখতে পারে এ চিন্তা বোধ হয় কোনদিনই তাঁর মনে উদয় হয়নি। এই পত্রগুলিই প্রথম আমার মনে অনেকদিন আগে আমাদের মধ্যে ভালবাসা ও প্রেমের তর্ক উপস্থিত হয়েছিল তার কথা জানিয়ে তুললে। তারপর যখনই আমি অন্যমনস্ক থাকতুম তখনই ভাবতুম সেই ভালবাসা ও প্রেমের কথা।

হ্যাঁ, মানুষের হৃদয়ের পুঞ্জীভূত ভাবটা গলিয়ে ভালবাসা রূপে একটা কিছুর ওপর ঢেলে দেওয়া চাই, কিন্তু সেই আধারটা যে মানুষই হবে এমন কোনও কথা নেই। সে মানুষ না হয়ে কুকুর বিড়াল গরু প্রভৃতি হতেও তো পারে।

আমি মানুষকে চাইনি। বিমলদা' আমার ওপর বড় পক্ষপাতিত্ব দেখাতেন, সেটা যেন ক্রমে আমার অসহ্য বলেই বোধ হতে লাগল। তাঁর স্ত্রীর পত্র আমি পেয়েছি—তাতে বুঝেছি সে নারী জানে তার স্বামী তাকে জীবন দিয়ে ভালোবাসে, সে অন্যাসক্ত কখনই হতে পারে না। ঠিক বিমলদা'কে, একজনকে ছলনা করে আর একজনকে বরণ করতে চায়।

কিন্তু অন্তরটা যথার্থই আমি শূন্য বোধ করছিলুম। বিমলদা'কে ঠেলে ফেলেও তাঁর কথাগুলোকে তো ঠেলতে পারতুম না। অবশেষে একদিন কোমর বেঁধে দাঁড়ালুম—ভালবাসতে হবে। কিন্তু হায় রে, কাকে ভালবাসব, কে আমার ভালবাসা চাইবে?

আমি চেয়েছিলুম সেই রকম ভালবাসা—আমি শুধু নিঃশব্দে ভালবেসে যাব, যারে ভালবাসব সেও যেন না জানতে পারে। মনে হতো তাতেই আমি বড়

তৃপ্তি পাব, সেই ভালবাসতে পাওয়া টুকুই আমার পক্ষে আশাতীত পাওয়া হবে।

সেদিন পুকুর ঘাটে বাসন মাজতে মাজতে তাই ভাবছিলুম, ঠিক সেই সময় আমার ভালবাসার পাত্র ভগবান জুটিয়ে দিলেন।

শুনে হাসবে তুমি—সে একটা ছেলে, ছোট্ট ছেলে, বয়েস তার বছর পাঁচ হবে। সে আমায় প্রথম দেখাতেই অত্যন্ত ভালবেসে ফেললে, আমি হলুম তার বউ, সে হলো আমার বর।

সে আমার সম্পর্কীয় এক বোনঝির ছেলে, তার মা আমার চেয়ে কয় বছরের বড় হলেও আমায় মাসী বলে ডাকত। নাতিটিকে বরের আসনে বসিয়ে, বরের নামে পরিচয় দিয়ে আমি যতটা খুসি হয়েছিলুম, দেখলুম—সে তার চেয়ে বেশী খুসি হয়ে গেল।

সত্যি কথা, আমি তাকে প্রাণভরে ভালবেসে ছিলুম, আমার অন্তরটা সে নিঃশেষে চুঁইয়ে নিচ্ছিল। মানুষ তার ভালবাসার পাত্র বা পাত্রীকে যতটা ভালবাসতে পারে আমি তার চেয়ে কম তাকে ভালবাসিনি। আমি তাকে আমার যত গোপন কথা সব বলতুম, সে বুঝত না, শুধু আমার মুখের পানে তাকিয়ে বলে যেত—হুঁ, তারপরে ? সে আমার কথাগুলোকে নিছক গল্প বলেই ভাবত, বোধকরি আমিও তার কাছে গল্পকথার রাণীর মতই ছিলুম।

যথাসময়ে সংসারের কাজ হয় না, বাবা মা তাতে একটাও কথা বলতেন না, শুধু হাসতেন। রাগ হতো বিমলদা'র, তিনি এমন করে আমার শিশু বরের পানে চাইতেন যে সে ভয় পেয়ে দুই হাতে আমার গলাটা আঁকড়ে ধরে আমার বুকের মধ্যে তার ছোট মুখখানা লুকিয়ে ফেলত।

পোড়া যমের চোখে কি এও সইল না ? তাই ভাবি, কেন—আমি যাকে ভালবাসব সেই চলে যাবে, আমার এমন ভালবাসা মরে যাক না কেন ? যখন বিয়ে হয়েছিল তখন দশ বছরের মেয়ে ছিলুম, তের বছর না পুরতেই স্বামী মারা গেলেন। আঠার বছর বয়সে ভালবাসলুম একটী চার বছরের শিশুকে, আমার কুড়ি বছর পুরতে না পুরতে সেও চলে গেল।

আজ পাঁচ বছর হল সে মারা গেছে, আমার বয়েস পঁচিশ বছর হয়ে গেছে। ভুলতে পারিনি ভাই, আমার যৌবনে যে শিশুটী স্বামী হয়ে বুকে এসেছিল, তার সে কথা এখন ভুলতে পারিনি, ভুলতে পারবও না। আমার ভালবাসার আধার চলে গেছে, আমিই সব নিয়ে পড়ে আছি।

আবার কোনও রূপে এই জীবনের মাঝে আমার বর আসবে কিনা তা কে জানে? মানুষ মরে যায়, প্রেম মরে না, ভালবাসা মরে না; আমি মরে যাব, কিন্তু আমার প্রেম ভালবাসা অক্ষয় হয়ে থাকবে।

কাউকে এতটুকু দেব না ভাবা বড় অন্যায়, কেন না মানুষ মানুষ হিসেবেই মানুষের কাছ হতে তার প্রাপ্য গণ্ডা আদায় করে নিয়ে তবে ছাড়ে। আমি যতটা দৃঢ়চিত্তা ছিলুম, আর ততটা নেই। একটা ক্ষুদ্র শিশু এসে তার নিবিড় আলিঙ্গনে বেঁধে আমায় বড় কোমল করে দিয়ে গেছে।

আজ এই পর্য্যন্ত। এর পর যে পত্র দেব তাতে আরও অনেক কথা জানাব।

তোর নীরজা।



মলাটের মুখ

আশাপূর্ণা দেবী

অবশেষে সেই প্রতীক্ষিত মুহূর্তটি এলো।

নিশিবাবু মারা গেলেন।

হয়তো 'প্রতীক্ষিত' শব্দটা ব্যবহার করা শোভন হলো না, শুনতে খারাপই লাগলো, কিন্তু ও ছাড়া আর কীই বা বলা যেতো? আর কোন্ শব্দে ঠিক অবস্থাটা বোঝানো যেতো?

'প্রতীক্ষা ছাড়া আর কী বা করছিল এরা?

নিশিবাবুর আইবুড়ো মেয়ে কাবেরী, নিশিবাবুর বিধবা পুত্রবধূ সন্ধ্যা, আর নিশিবাবুর পাড়ার ডাক্তার প্রভাংশু! নিশিবাবুর এই দীর্ঘ-বিলম্বিত মৃত্যু-শয্যাটিকে ঘিরে বসে থেকে যারা গোটা তিন-চার বর্ষা-বসন্তকে হাত নেড়ে বিদায় দিয়েছে।

অবশ্য সন্ধ্যার কাছে ওই 'বিদায় দেওয়া' কথাটা অর্থহীন। তার জীবন থেকে তো বর্ষা বসন্তের চিরবিদায় ঘটে গেছে। আসলে ও কথাটা কাবেরী আর প্রভাংশুকে নিয়ে। অলিখিত দলিলে যাদের ভবিষ্যতের চুক্তিপত্র সম্পাদন হয়ে গেছে।

খোলাখুলি প্রেম-নিবেদনের পথে যে একে অপরের কাছে কোনোদিন উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তা নয়, দীর্ঘকাল ধরে দেখা মানুষটার সঙ্গে তেমন রোমান্টিক পরিস্থিতিও হয়তো আসে নি। নিশিবাবুর এই দীর্ঘস্থায়ী রোগটাও অসতর্ক একটা মধুর মুহূর্ত গড়ে ওঠার পক্ষে বাধা স্বরূপ হয়েছে, তবু প্রভাংশু যে কেন এই দীর্ঘকাল ধরে শুধু বিনা ভিজিটে রোগী দেখাই নয়, বিনামূল্যে ওষুধ-পথ্যও যোগান দিয়ে চলেছে, তার উত্তর তো কাবেরীর কাছে আছে।

কাবেরী আর এখন নতুন করে কৃতজ্ঞও হয় না।

আগে হতো।

প্রথম যখন প্রভাংশু ওষুধের দাম নিত না, বলতো, 'আমার দাম লাগে নি। ডাক্তারদের কাছে ওষুধের স্যাম্পেল আসে জানেন তো? তার থেকেই নিয়ে এলাম।' তখন কথাটা বানানো কথা বুঝেও আর প্রতিবাদ করতো না কাবেরী, শুধু সকরুণ একটু কৃতজ্ঞ দৃষ্টি মেলে ধরতো অনেকটা অর্থভরে। ক্রমশ পথ্যেরও যোগানদার হয়েছে প্রভাংশু।

'যাচ্ছি বাজারের দিকে, নিয়ে আসবো এখন', অথবা 'গিয়েছিলাম বাজারের দিকে, নিয়ে এলাম—' এই ছদ্মবেশ পরিয়েই সাহায্যটাকে চালান দিয়েছে। দামের কথা তুললেই তাড়াতাড়ি বলেছে, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান, ব্যস্ত হবেন না, বাড়ির জন্যেও তো কিনেছি কিছু, 'হিসেব হয়নি এখনো।'

সে হিসেব অবিশ্যি আর উঠতো না।

তারপরে আরো অন্য অনেক বস্তু এসে যেত।

যেমন ফিডিং-কাপ্, অয়েলক্লথ, মেজার-গ্লাস, এটা ওটা। হিসেব জমতেই থাকে। ওদিকে সম্পর্কটা গভীরে আসতে থাকে।

সন্ধ্যাও বলে, 'ঋণের কথা আর তুলবো না, তার তো পাহাড় জমে উঠেছে। পরজন্মের জন্যে শোধ দেওয়াটা তোলা থাক।'

তা, কাবেরী ক্রমশই সপ্রতিভ হয়ে উঠছিল প্রায়। 'পরিণীতা'র নায়িকা ললিতার মতোই সহজ অধিকারবোধে প্রভাংশুর জিনিসকে 'নিজের জিনিস' বলে গ্রহণ করতে আর বাধছিল না তার। তাই বৌদির ওই ঋণশোধের প্রশ্নে ঝঙ্কার দিয়ে বলে, 'তাই বা ভাবছো কেন বৌদি? এটাও তো ধরে নেওয়া যেতে পারে, 'উনিই পূর্বজন্মের ঋণশোধ করছেন।'

'তা, এটাও মন্দ না', প্রভাংশু হেসে হেসে বলে, 'দেখছেন তো—বয়সে আপনি বড় হলে কি হবে, সংসারজ্ঞান আপনার থেকে আপনার ননদিনীর অনেক বেশী। পরজন্মের খাতার অঙ্কটাও গুছিয়ে রাখছেন।'

প্রভাংশুর বাড়ির লোকেরা অবশ্য প্রভাংশুর এই 'নিশিভবন'-প্রীতিটা খুব একটা সুচক্ষে দেখত না, কিন্তু বারণই বা করে কোন্ লজ্জায়? দেখছে তো ভদ্রলোকের বাড়ির অবস্থা!

স্ত্রী হারিয়েছেন ভদ্রলোক, সদ্য-বিবাহিত জোয়ান ছেলেকে হারিয়েছেন, তারপর পক্ষাঘাত হয়ে বিছানা নিয়েছেন। বাড়িতে মানুষ বলতে একটা বয়স্থা কুমারী মেয়ে, আর একটা যৌবনবতী বিধবা পুত্রবধূ। তাও ঠিক আধুনিক মেয়েদের মতো পাস-টাস করা সর্বকমে দক্ষ মেয়ে নয় তারা।

সে দক্ষতা-অর্জনে বাধা থেকেছেন নিশিবাবুই স্বয়ং। সাধ্যপক্ষে নিজের সঙ্গে ছাড়া মেয়ে-বৌকে বাড়ি থেকে বেরোতে দিতেন না তিনি। পাড়ার সকলেই জানে সেকথা। কাজেই 'পড়শী' হিসেবেও বাইরের বাজার-দোকান, আনা-নেওয়ার কাজটা করে দেওয়া উচিত বৈ অন্যায় নয়। তা'ছাড়া ডাক্তার মাত্রেই 'সামাজিক দায়িত্বের' দায়টা নিজের ঘাড়ে বেশী নিয়ে থাকে, এটা সাধারণ নিয়ম।

বাড়িতে কারো অসুখ হলে রাত্রে প্রভাংশুর দাদা স্নেহাংশু 'স্নেহ' শব্দটাকে অর্থহীন প্রতিপন্ন করে ঘরে দরজা বন্ধ ক'র শুতে যায়, আর প্রভাংশু ঠায় বসে রাত জাগে।

আত্মীয়জনেদের স্বাস্থ্য সুস্থতার খবর নেওয়ার দায় অলিখিত নিয়মে প্রভাংশুরই। বড় স্নেহাংশু কোনো-'মুখো' হয় না, আর ছোট শুভ্রাংশু ঝাড়া জবাব দেয়, সে কাউকে চেনে না।

কাজেই চিনতে হয় প্রভাংশুকেই।

পাস করে বেরোনো পর্যন্ত চিনতে হচ্ছে।

অথবা পাঠ্যাবস্থা থেকেই চিনতে হচ্ছে। সে জায়গায় পাড়ার অন্য পড়শীদের ছেলেরা উচিতবোধ তৎপর না হলেও, প্রভাংশু যদি হয়, বারণ করা চলে না।

বারণ করা হয়ও না।

অতএব প্রভাংশু অবারণ গতিতে নিশিবাবুর বাড়িতে যাতায়াত করে। সে বাড়িতে যে শুধু একটা শয্যাগত রোগী এবং দুটো যুবতী মেয়ে, এ ছুতো ডাক্তারের সামনে তোলা পাগলামি।

আস্তে আস্তে এ সংসারের দায়িত্বটা প্রভাংশুর উপরেই এসে গেছে। প্রভাংশুই চেষ্টা-চরিত্র করে কাবেরীর জন্যে একটা সাবান কোম্পানীর ক্যানভাসারের কাজ জুটিয়ে দিয়েছে, এবং সন্ধ্যাকে এমন একটা মহিলা সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করে দিয়েছে, যারা বাড়িতে এসে 'হাতের কাজ' নিয়ে যায়।

দুই ননদ-ভাজে এই যাহোক কিছু উপার্জন করায় একটা সুবিধে হয়েছে 'প্রভাংশু ডাক্তার ওদের সংসার চালায়'—এ রটনাটা কিঞ্চিৎ কমেছে।

বাড়িটা নিশিবাবুর পৈত্রিক এইটাই যা রক্ষে।

এই ভাবেই চলছিল।

নিশিবাবুর বিছানায় শোওয়া চেহারাটা প্রায় একটা নিশ্চল প্রাকৃতিক দৃশ্যের মতো হয়ে উঠেছিল।

ছুটি মেয়ের দিনলিপি একই ছাঁচে লেখা হচ্ছিল।

এর মধ্যে যে একজনের ভবিষ্যৎ আছে, এবং অন্যজনের সেটা অন্ধকার, তা সহসা বোঝা যাচ্ছিল না।

কিন্তু এখন পরিস্থিতির বদল হলো।

এখন একটা সমস্যা দেখা দিলো।

আর এখন কোন্ উপলক্ষ্যে এ বাড়িতে আসবে প্রভাংশু?

কোন্ আলোচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাবে?

অথচ আবার একা ছুটো মেয়েকে একটা বাড়িতে ফেলেই বা রাখবে কি করে?

দায়িত্বটা যখন—যে ভাবেই হোক, এসে গেছে তার হাতে।

উপায়টা তাকেই ভাবতে হবে। কিন্তু হবেই বা কি?

প্রভাংশুর দিদি পাড়লো কথাটা।

বললো, 'তুই বা কি চোর-দায়ে ধরা পড়েছিস তাও তো বুঝি না। এতদিন মহত্ব দেখাচ্ছিলি, তবু তার একটা মানে ছিল। কিন্তু এখন কি? এখন তুমি মহত্ব দেখাতে গেলে লোকে গালে চুনকালি দেবে। বলবে 'রক্ষক কি ভক্ষক কে জানে!'

প্রভাংশু হেসে বলে, 'লোকে না বলুক, তুমি বলবে।'

'বলবোই তো'—দিদি অলজ্জিত গলায় বলে, 'আমিই তো করবো নিন্দে। কেন, ওদের তিনকুলে কেউ নেই? বৌটাও কি ভুঁইফোঁড়?'

'এযাবত তো তাই মনে হতো! দেখি নি তো কাউকে উঁকি মারতে!'

'যত কর্তব্য তোর! না না, ওসব খেয়াল ছাড়। বৌটাকে বল, খুঁজে-পেতে কোনো গার্জেন যোগাড় করে বাপের বাড়ির দিকে চলে যেতে, আর মেয়েটাকে বল একটা বিয়ে-ফিয়ে করে ফেলতে।'

'বাঃ!'—প্রভাংশু বলে, 'সমস্যার এমন সুন্দর সমাধান থাকতেও মেয়ে ছুটো কষ্ট পাচ্ছে!...যাই, এখনই বলি গিয়ে।'

'চমৎকার!' দিদি মনে মনে বলে, আমার যেন হলো মাতালকে শুঁড়ির বাড়ির রাস্তা চিনিয়ে দেওয়া।

তা হলেই বলা যায়।

ওই ঘটনা হয়ে গেছে। এখন আর ডাক্তারের ও-বাড়িতে ঘন ঘন যাবার কী ছিল?

এ তবু একটা কারণ পাওয়া গেল।

সন্ধ্যার সঙ্গে দেখা হলো প্রথমে। কৃশ সন্ধ্যার বৈধব্যের বেশের সঙ্গে যেন আরো রুক্ষতা আর কৃশতা।

তবু সন্ধ্যা হাসলো। হাসিটা বিষণ্ণ দেখালো, তবু সেই হাসি হেসেই বললো, কাবেরীকে কিন্তু পাচ্ছেন না এখুনি, এইমাত্র স্নান করতে গেল! আর জানেনই তো ওর স্নানের দেরী!'

প্রভাংশু এ বাড়িতে বাড়ির লোকের মতো যেখানে-সেখানে বসে। বসলো জানলার কিনারায়।

সন্ধ্যার রুক্ষচুলে ঘেরা শুকনো মুখটার দিকে তাকালো একবার তাকালো ওর শুধু একগাছা চুড়ি-পরা হাত দুটোর দিকে। ভাবলো, আচ্ছা কাবেরীও তো ওই রকম একটা মাত্র বালা না চুড়ি কি যেন পরে, তবু তাকে তো কই এমন বিধবা বিধবা লাগে না। কাবেরীর হাত দুটো ফর্সা বলে?

তারপর বললো, 'কাবেরীকে পাবার জন্যেই ছুটে এলাম এমন ধারণাই বা হলো কেন আপনার?'

সন্ধ্যা আবারও হাসলো।

'ধারণা বস্তুটা সত্য-নির্ভর বলে।'

'আর আমি যদি বলি সত্য-মিথ্যার জ্ঞান আপনার আদৌ নেই?'

'বললে বুঝবো সত্যগোপনে আপনি ওস্তাদ।'

হ্যাঁ, এই সুরেই কথাবার্তা হয় ওদের। যেন ধরেই নিয়েছে সন্ধ্যা, ডাক্তার তার নন্দাই, অতএব তার সঙ্গে সরস কৌতুকালাপ দোষণীয় নয়।

কাবেরীও তো তেমনি অধিকারের মাটিতে দাঁড়িয়েই যখন তখন বলে, 'ডাক্তারের কথা শুনিস না বৌদি, এখুনি তোকে রুগী বানিয়ে ছাড়বে। দেখ না কাল কখন একটু কেসেছি, আজ ওষুধ গেলাচ্ছে।'...বলে, 'ওর কথা বিশ্বাস নেই, ও-সব পারে।' বলে, 'তোদেরই বাবা মতে মেলে, কর গল্প, আমি বসলেই তো তর্ক বাধবে।'

কোনো একটি নব-বিবাহিতা মেয়ে স্বামী-সম্পর্কিত কথায় যতটা আতিশয্য আদিখ্যেতা মেশাতে পারে, তা মেশায় কাবেরী প্রভাংশু ডাক্তারের সম্পর্কে।

অশৌচ চলে গেলেই বিয়ের কথাটা উঠবে এই আর কি!

সন্ধ্যা ভাবে, হয়তো অশৌচ না যেতেই কথাটা ওঠাতে এসেছে। কথাটা কইলে আর দোষ কি। তাই নিজেই তুলবে ভাবে। তাই যখন প্রভাংশু ওর কথার উত্তরে হেসে বলে, 'তা বোধকরি ওস্তাদ। আপনার দেওয়া সার্টিফিকেটটা নিলাম', তখন সন্ধ্যা বলে ওঠে, 'দেখলেন তো? আপনাকে কেমন পড়ে ফেলেছি? এই যে এখন এসেছেন, কেন এসেছেন বলে দিতে পারি।'

'সে তো বলেই দিলেন', প্রভাংশু একটু রহস্যভরা গলায় বলে, 'আপনার ননদিনীকে পাবার জন্যে।'

'সেই তো!' সন্ধ্যা হাসে।

তবু সন্ধ্যার হাসিটা যেন বিষণ্ণই থেকে যায়। হয়তো সন্ধ্যা কাবেরীর ভবিষ্যৎ স্থিরীকৃত হওয়ার পাকা কথার পরই ভাবছে—তারপর কি? অথচ দেখতে পাচ্ছে না 'তারপরটা'। তাই ওই বিষণ্ণতার ছাপটা যাচ্ছে না ওর মুখ থেকে।

নইলে ভুগে ভুগে স্বার্থপর আর দুর্মুখ হয়ে যাওয়া শ্বশুরের মৃত্যুশোক ওর ঠোঁটের কোণায় এমন স্থায়ী বিষণ্ণতার ছাপ এঁকে দেবে, এটা যেন বাড়াবাড়ি কল্পনা।

প্রভাংশুও ভাবে সে-কথা, বাড়াবাড়ি কল্পনা। তারপর বলে, 'আচ্ছা ধরুন, এখন যদি আমি সে-কথা অস্বীকার করি?'

সন্ধ্যা অবাক হয়ে তাকায়।

বলে 'কোন্ কথা?'

'ওই যে—' প্রভাংশু হঠাৎ তার কৌতুকচঞ্চল দৃষ্টিটা স্থির করে গভীরে নিয়ে যায়, রহস্যঘন কণ্ঠে বলে, 'ওই কথাটাই। যদি বলি কস্মিনকালেও ওই কাবেরী দেবীর জন্যে ছুটে ছুটে এ-বাড়িতে আসে না প্রভাংশু ডাক্তার।'

সন্ধ্যা সহসা কেঁপে ওঠে।

সন্ধ্যা যেন ভয়ঙ্কর একটা অসহায়তা অনুভব করে। সমুদ্রে তৃণখণ্ড ধরার মতোই যেন এখান থেকে অদৃশ্য স্নানের ঘরটার দরজার দিকে তাকায়, তারপর চঞ্চল হয়ে উঠে পড়ে কোনোমতে সহজ হয়ে বলে, 'দাঁড়ান, একটু চা করে আনি, তারপর তর্ক হবে।'

'তর্ক চাইছি, এমনই ভাবছেন কেন?' প্রভাংশু তেমনি দৃষ্টিতেই তাকায়।

সন্ধ্যা ভয় পায়।

খুব ভয় পায়।

কই, এমন তো কোনোদিন দেখায় নি প্রভাংশুকে, এমন দৃষ্টি তো দেখেনি প্রভাংশুর চোখে। নিশিবাবুর দৈহিক উপস্থিতিটুকুই কি তবে ওর দুঃসাহসের উপর পাহারা দিচ্ছিল? এখন পাহারা নেই, এখন ভয় গেছে?

কাবেরীর আড়ালে সন্ধ্যার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ হতে চায় ও? কই, এমন তো স্বভাব নয় প্রভাংশুর। বরাবরই তো সন্ধ্যার সঙ্গে শ্রদ্ধেয় গুরুজনের মতো দূরত্ব আর সমীহ রেখেই কথা বলেছে। কৌতুকের কথাতেও রেখেছে সে সমীহ।

কাবেরীর সম্পর্কেই বরং মাঝে মাঝে চটুলতা করে, কড়া ঠাট্টা করে, রঙ্গরসের মধ্য দিয়ে তাকে ক্ষ্যাপায়, মজায়।

নিশিবাবুর রোগটা এমন স্থায়ীত্ব নিয়েছিল যে, নতুন করে দুর্ভাবনা বা নতুন করে বিষণ্ণতা আসত না আর ইদানীং। রোগীর ঘরের বাইরে রীতিমতো গল্প আড্ডা চা চানাচুর চলতই। দুজনে এবং তিনজনেও।

তবে মাত্রা ছাড়াবার সুযোগ পেত না।

মাঝে মাঝেই নিশিবাবুর হুঙ্কার শোনা যেত, 'ফূর্তির যে বান ডেকেছে দেখছি! এ ঘরে একটা রুগী মরছে!'

'এ ঘরের লোক আরো মরছে।' ভ্রূ-ভঙ্গী করে বলতো এমন কথা কাবেরী, 'আমাদের মরণটা কেউ দেখতে পাচ্ছে না এই যা দুঃখ।'

তারপর দুম্ দুম্ করে পা ফেলে চলে যেত ও-ঘরে। বলতো—'কী! কী চাই! জল খাবে।'

ভয় খাওয়া নিশিকান্ত তখন সেটাতেই স্বীকার পেতেন। বলতেন, 'খাবই তো সেই থেকে তেষ্টা পেয়েছে।'

কিন্তু এখন, প্রতিমুহূর্তে সেই হুঙ্কারটার আওয়াজ মনে ধাক্কা দিলেও কানে কোনোদিনই বাজবে না এটা ঠিক। কে তবে রক্ষা করবে এই মেয়ে-দুটোকে? কার শুভবুদ্ধি?

প্রভাংশুর চোখে যে ছায়া সে কি শুভবুদ্ধির?

প্রভাংশুর কথাগুলোই বা কোন্ বুদ্ধির?

'তর্কও চাইনা, চা-ও চাই না, চাই শুধু এইবেলা আপনাকে দুটো কথা বলতে।'

সন্ধ্যা মনে মনে বলে, ভয় কি? ভয় কি? মুখে বলে, 'দুটো কেন, দুশোই বলুন।'

'নাঃ, দুশোয় আমার দরকার নেই। আমি শুধু বলছিলাম—' প্রভাংশুর

গলা আগ্রহে আর ব্যাকুলতায় কাঁপে, 'কাবেরীর জন্যে বর খুঁজে দেবার ভারটা যদি আমি নিই?'

সন্ধ্যা নিশ্বাস ফেলে। ফেলে বোধকরি বাঁচে।

ওঃ, কায়দা!

সেই বিবাহ-প্রস্তাবই। শুধু ভাষাটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে।

বেঁচে গিয়ে হেসে ওঠে।

বলে, 'সে ভার তো আপনি প্রমিস্ করবার আগেই আপনার উপর চাপানো হয়ে গেছে '

'না সন্ধ্যা, না।'

সহসা 'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে নেমে যায় প্রভাংশু ডাক্তার। বলে ওঠে, 'বিশ্বাস করো, ওর প্রতি কোনো মোহ আমার নেই। আমার মন অন্য মেয়েয়—'

দপ্ করে জ্বলে ওঠে বুঝি সন্ধ্যা।

বলে ওঠে, 'আপনি কি বলতে চান স্পষ্ট করে বলুন তো।'

'স্পষ্ট করে? খুব স্পষ্ট করে?' প্রভাংশু যেন হতাশ গলায় বলে, একেবারে নীরস গদ্যে? তাহলে বলি, 'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

সন্ধ্যা ঠিকরে ওঠে।

সন্ধ্যার কালো শীর্ণ মুখটা কঠোর হয়ে ওঠে। সন্ধ্যা তীব্র স্বরে বলে, 'আপনি কি অরক্ষিত পেয়ে আমায় অপমান করতে এসেছেন?'

প্রভাংশু চুপ করে তাকায়।

প্রভাংশু আস্তে বলে, 'এতদিন ধরে দেখে শেষ পর্যন্ত এই বুঝলে আমায়?'

'কিন্তু—' সন্ধ্যা রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'একটা অদ্ভুত অবাস্তব কথা বললেই হলো?'

'আশ্চর্য!' প্রভাংশু আরো হতাশ গলায় বলে, অথচ আমার ধারণা ছিল আপনাকে কিছুই বোঝাতে হবে না।'

ধারণা ছিল!

সন্ধ্যা অবাক গলায় বলে, 'এই ধারণা ছিল আপনার?'

সবকিছু ছাপিয়ে বিস্ময়টাই বুঝি বড় হয়ে উঠেছে সন্ধ্যার? তাই প্রতিবাদ করতে ভুলে যাচ্ছে, রাগ করতে ভুলে যাচ্ছে। বলছে, 'এই ধারণা ছিল আপনার?'

'ছিল। ছিলই তো।' প্রভাংশু আবেগের গলায় বলে, 'ভেবেছিলাম যেদিন বলবার দিন আসবে, সেদিন না-বলতেই সব সহজ হয়ে যাবে।'

সন্ধ্যার স্বর তবু রুদ্ধ হয়ে থাকে।

সন্ধ্যা সেই রুদ্ধ গলাতেই বলে, 'আর কাবেরী?'

'কাবেরীর পাত্র খোঁজবার ভার তো আগেই নিয়েছি!'

সন্ধ্যা আস্তে বলে, 'শুধু পাত্র হলেই হলো? এতদিন ধরে ও আপনাকে—'

'এতদিন ধরে ও 'আমাকে' নয় সন্ধ্যা, এতদিন ধরে ও একটি 'পাত্র'কেই ভজনা করেছে। সেটা আমি না হয়ে আর কেউ হলেও ক্ষতি ছিল না। এখন যদি আমার থেকে সুপাত্র একটা জোটাতে পারি, দেখবে তাকেই ও—'

সন্ধ্যা মুখ তুলে তাকায়।

বলে, 'লোভ দেখাবেন না। আমার জীবনে আর নতুন করে কিছু হবার নেই। যা স্বাভাবিক, যা শোভন সেটাই হোক।'

'মানুষ অঙ্কশাস্ত্র নয় সন্ধ্যা।'

'কিন্তু প্রতি পদে তো জেনেছি কাবেরীকেই আপনি—'

প্রভাংশু হাসে।

বলে, 'তোমার ও জানাটায় একটু ভুল আছে, আমি কাবেরীকে নয়, কাবেরীই আমাকে—'

'তবে? সেটাও কি তার প্রতি ভয়ঙ্কর একটা নিষ্ঠুরতা হবে না? ভয়ঙ্কর একটা অবিচার?'

'হয়তো হবে—'প্রভাংশু মৃদু গভীর গলায় বলে, 'ভয়ঙ্কর না হলেও হয়তো কিছু হবে। কিন্তু সারাজীবন ওর প্রতি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা আর ভয়ঙ্কর অবিচার করার থেকে কি এটুকুই ভালো নয়?'

সন্ধ্যা শুধু চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে।

অথচ সন্ধ্যা প্রথম সুরটাই বজায় রাখতে পারতো। রেগে ওঠার পরে আরো রাগতে পারতো। প্রভাংশুকে যাচ্ছেতাই করতে পারতো। গৃহস্থ-ঘরের বিধবার কাছে এই প্রস্তাবটাকে 'কুপ্রস্তাব' বলে গণ্য করতে পারতো, কিন্তু সন্ধ্যা তা করল না। সন্ধ্যা হতাশ গলায় বললো, 'আমার সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। এ আমি কোনোদিন ভাবি নি। এ আমি কোনোদিন ভাবি নি।'

'আমার দুর্ভাগ্য! কি আর করা! এখনই ভাবো।'

'কিন্তু, কিন্তু কেন আপনার এই সৃষ্টিছাড়া নির্বাচন? ও একটা কুমারী মেয়ে সুন্দরী মেয়ে—'

প্রভাংশু বলে, 'সৌন্দর্য বস্তুটা কেবলমাত্র বাইরের ছাঁচের মধ্যেই আবদ্ধ নয়!'

'কিন্তু আমি ওকে মুখ দেখাবো কি করে?' সন্ধ্যা সেই রুদ্ধ আবেগের গলায় বলে, 'না না, এ হয় না—'

'জগতে একটি মাত্র মানুষই সত্য? ওই আপনার কাবেরী? তার কাছে মুখ দেখানোটাই শেষ কথা?'

'শুধু ওর কাছে কেন, পৃথিবীর কাছেই—'

প্রভাংশু ওর কথায় বাধা দেয়।

প্রভাংশু খুব শান্ত গলায় বলে, 'তাহলে কি এটাই ধরবো, আমিই এতদিন ভুল করে এসেছি? ভুল করেছি, ভুল দেখেছি, ভুল বুঝেছি?'

সন্ধ্যা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, এই সময় কাবেরী এসে দাঁড়ালো।

যদিও বাপ মরার অশৌচ, যদিও প্রসাধনের সময় নয়, তবু প্রভাংশুর সাড়া পেয়েই বোধকরি সামান্য একটু প্রসাধনের ছোঁয়া লাগিয়ে এসেছে স্নানের পর। আর সেইটুকুতেই জলজলে দেখাচ্ছে তাকে। সেইটুকুতেই বোঝা যাচ্ছে মেয়েটা সুন্দরী।

আর সুন্দরী বলেই তো ওই চাকরিটা পেয়েছিল অত তাড়াতাড়ি। এক কথায়, চাকরিটা হয়ে গেলে প্রভাংশু বলেছিল, 'সাধে আর বলেছে, 'সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র!'

কাবেরী কটাক্ষ করেছিল, 'কোথায় আবার সর্বত্র? ওটা আপনার ভুল কথা।'

'ওটা আমার কথা নয়, শাস্ত্রের কথা।'

'সবাই শাস্ত্র-কথা মানে না। যেমন আপনি।'

প্রভাংশু সে কথাটা বুঝতে না-পারার ভান করেছে। প্রভাংশু বলেছে, 'সে যাই বলুন, মাইনেটা খারাপ দেয় না।'

মাইনে!

হ্যাঁ, তখনও 'আপনার' গণ্ডি ভেদ হয় নি।

কাবেরী আছাড় খেয়েছিল।

কাবেরী অবাক হয়ে ভেবেছিল, ঠিক এই মুহূর্তে 'মাইনে' শব্দটা উচ্চারণ করলো লোকটা!

তা লোকটা বোধকরি ভূতই।

অন্তত এখনও একটা ভূতের মতো কথাই বললো।

ঠিক এই মুহূর্তে, এখন কাবেরী আগ্রহে আর আহ্লাদে ছলছল করতে করতে সবে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন কি না বলে বসলো, 'এই যে তোমাদের ওই হবিষ্যান্নের যোগাড় সব ঠিক আছে তো? না কি সব নেই? দেখ তো—'

কাবেরী অবশ্য দেখতে গেল না।

কাবেরী বাপের রোগের সেবার সময় যেমন সব সময় গা ভাসিয়ে দিয়ে বলতো, 'আমি ওসব জানি-টানি না। ওসব শ্রীমতী বৌদির ডিপার্টমেণ্ট, ঠিক তেমনি ভাবেই এখনো বলে উঠলো, 'আমি ওসব জানি-টানি না, ওটা হচ্ছে বৌদির ডিপার্টমেণ্ট!'

'তবে যান, আপনিই যান, দেখে আসুন।'

উদাত্ত গলায় বলে প্রভাংশু।

'কম্পিত তনু' মানুষটাকে লোকলোচনের সামনে থেকে তাড়ায়। আর সন্ধ্যা চলে যেতেই কাবেরী মনে মনে বলে, উঃ কী চালাক! কেমন সহজে ভাগালো। আমি আবার ওকে 'ভূত' ভাবছিলাম!

মনে মনে বললো।

তবে মুখে বললো, 'বেচারা!'

সন্ধ্যার ওই কেমন একরকম করে চলে যাওয়াটা দেখে ওই শব্দটাই মনে এলো তার।

প্রভাংশু যেন চমকালো।

বললো, 'কে? কার কথা বলছো?'

'বৌদির কথাই বলছি—' কাবেরী করুণায় বিগলিত হয়। 'ও বেচারীর যে কী হবে!'

প্রভাংশুর ঠোঁটের কোণায় কি এক টুকরো হাসি উঁকি দেয়?

হয়তো দেয়, হয়তো দেয় না।

প্রভাংশু বলে, 'ওঁর জন্যে আর নতুন করে ভাববার কি আছে?'

'তা বটে!' কাবেরী আরো বিগলিত হয়, 'ওর তো সব ভাবাভাবি চুকেই গেছে। মুশকিল এই, বৌদিটার বাপের বাড়িতেও তিনকুলে কেউ নেই। এরপর যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে! বিদ্যের সম্বল নেই যে, অফিসে চাকরি করবে, রূপ নেই যে আমার মতোই কিছু একটা করবে। নইলে আমার

চাকরিটাই ওকে দিয়ে দিতাম পরে।'

'সেই তো—' প্রভাংশু গম্ভীর গম্ভীর গলায় বলে, 'আমিও তো সেই কথাই ভেবেছি। আর ভেবে ভেবেই ঠিক করেছি, ও তোমার চাকরি তোমারই থাক, আমিই বরং একটা চাকরি দিই ওঁকে—'

'তুমি? তুমি আবার কী চাকরি দেবে ওকে?' কাবেরী কৌতুকে ঝলসায়। 'কম্পাউণ্ডারের চাকরি নাকি? না কি—'

'উঁহু! ভাবছি আমার হোম ডিপার্টমেণ্টের হেড অফিসারের পোস্টটা—'

'কী? কী হলো?' কাবেরীর চোখ মুখ ভুরু কপাল সব কুঁচকে ওঠে, 'কি বললে?'

'ওইতো—বলছি, ওর যখন আর কোথাও কিছু জুটবে না, বিদ্যে নেই যে অফিসে চাকরি করবে, রূপ নেই যে সাবান কোম্পানির ক্যানভাসিংও করবে অন্ততঃ, তাহলে? তাহলে গতি কি? এতদিন যা করে এসেছে, রান্নাবান্না ঘর গেরস্থালী সে কাজ ছাড়া আর কোনো গতি নেই ওর। অতএব ওটাই অফার করছি ওকে, ঘরণীর পোস্টটা—'

কাবেরী ছিটকে ওঠে।

কাবেরী চড়া গলায় বলে, 'তোমার ঠাট্টা-তামাশাগুলো ক্রমশই কেমন কড়া হয়ে যাচ্ছে। জানো ও আমার দাদার বিধবা স্ত্রী! এভাবে ঠাট্টা—'

'কী মুশকিল! ঠাট্টা করছি কে বললে? সত্যিই অফার করছি। তোমার দাদার বিধবা স্ত্রী ছিলেন, তোমার বন্ধুর সধবা স্ত্রী হবেন—'

'ওঃ! তোমার মনে এই পাপ? এতদিন ধরে তাহলে আমায় নিয়ে মজা দেখেছ?'

কাবেরীর চোখ ফেটে জল আসে।

প্রভাংশু সেদিকে তাকায়।

খুব কোমল স্নেহের গলায় বলে, 'তোমার জন্যে সমস্ত পৃথিবীটাই উন্মুক্ত রয়েছে কাবেরী, ওর জন্যে শুধু একফালি জানলা। সে জানলাটাও বন্ধ করে দেব?'

'ওঃ, তার মানে তুমি দয়া করে একটি গরীব বিধবাকে বিয়ে করে উদ্ধার করবে?'

ক্ষোভে দুঃখে ব্যঙ্গে বিকৃত দেখায় কাবেরীর সুন্দর মুখটা।

প্রভাংশু বলে ওঠে, 'আরে দূর! বরং সেই গরীব বিধবাটি আমার 'অফার'

নিলেই উদ্ধার হয়ে যাই। কিন্তু আশ্চর্য! ধারণা ছিল না এত স্পষ্ট হতে হবে আমায়। ধারণা ছিল মেয়েরা অনুভবেই সব বোঝে।'

'ও:। তার মানে তুমি ওকেই—'

'বরাবর গোড়া থেকে।'

'তার মানে আমাকে নিয়ে শুধু খেলাই করেছ।'

'চট করে অপরাধ স্বীকার করে বসবো না। ভেবে দেখতে হবে, খেলাটা তুমিই তোমাকে নিয়ে করে এসেছ কি না!'

কিন্তু প্রভাংশুর সব কথাটাই কি সত্যি? প্রতারণা কি করে নি সে? এ বাড়িতে প্রবেশাধিকার অবারিত রাখতে সে-খেলায় প্রশ্রয় কি দেয় নি প্রভাংশু?



মন্দাকিনীর প্রেমকাহিনী

লীলা মজুমদার

প্রেমের এমন একটা অবাধ্য ভাব আছে, তার জন্য বিষম আয়োজন করে প্রতীক্ষা করলে তার দর্শন মেলা দায়, কিন্তু যখন তার আগমন কেবলমাত্র অপ্রত্যাশিত নয়, অসুবিধাজনকও বটে, তখন সে ত্রিভুবন জুড়ে বসে।

মন্দাকিনীও এই ধরনের একটা ঘটনায় জড়িত হয়েছিল। যতদিন পুষ্পিত লতার মতন তার জীবনে প্রথম যৌবনের সুরভি লেগেছিল, এবং মর্মরিত বেণুকুঞ্জে কোকিল-কণ্ঠের মতন তার মনের কোণে কোণে অনাগত বনমালীর বাঁশরী বেজেছিল, ততদিন ধরে সে কল্পনানেত্রে তার প্রিয়তমের অতি প্রত্যক্ষ মূর্তি দেখতে পেত।

বেশ দীর্ঘ গৌরবর্ণ দেহখানি, ভ্রমরকৃষ্ণ কোঁকড়া চুল, হরধনুকে হার মানিয়ে দেয় ভ্রূ-যুগল, অধরোষ্ঠে কোমল কঠিনে অপূর্ব সমাবেশ, কিবা বঙ্কিম গ্রীবা, বাঁশির মতন নাসিকার ডান পাশে নিচের দিকে ভুবনভুলানো ছোট একটি কালো কুচকুচে তিল, দাড়ি-গোঁফ কামানো। কণ্ঠস্বরে কখনও বজ্র-নির্ঘোষ শোনা যায়, কখনও বা কলনাদিনী স্রোতস্বিনীর কথা মনে পড়ে। পরিধানে কখনও বা সাদা ধুতি চাদর, কখন বা সুবিন্যস্ত গ্রে-রঙের পাশ্চাত্ত্যবেশ শোভা পায়।

এই আশ্চর্য ব্যক্তি মানসলোকে হয় জ্যোৎস্নানিশীথে বিজন বেণুকুঞ্জে কিম্বা বর্ষা-সন্ধ্যায় বসবার ঘরের স্তিমিত দীপালোকে মন্দাকিনীর কানে-কানে কত যে রোমাঞ্চকর মধু-বর্ষণ করত তার লেখাজোখা নেই।

অবশেষে একদিন মন্দাকিনীর ঈষৎ কম্পমান বাঁ হাতখানা ধীরে-ধীরে নিজের করকমলে তুলে নিয়ে, নীল মখমলের ছোট বাক্স খুলে নক্ষত্রোজ্জ্বল এক হীরের

আংটি পরিয়ে দিত এবং মন্দাকিনীর রক্তিম অধরে···এর বেশী কল্পনা করবার ক্ষমতা মন্দাকিনীর ছিল না। তাছাড়া এতেই তার এমন শিহরণ লেগে যেত যে, সে রাত্রে চোখে ঘুম আর আসত না। বলা বাহুল্য এই সকল রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীর মধ্যে মন্দাকিনীর পরনে থাকত সুযোগ্য নীল শাড়ী, সোনালী তার আঁচল।

দুঃখের বিষয় এমন সুপ্রকাশ যার রূপ, সে ব্যক্তি চিরকাল মন্দাকিনীর আগ্রহাধীর নয়নযুগলকে ফাঁকি দিয়ে যেতে লাগল। কত যে বর্ষা-সন্ধ্যা, কত যে জ্যোৎস্নাময় নিশীথ বিফল হয়ে যেতে লাগল তার কোন হিসাব নেই। শেষ পর্যন্ত মন্দাকিনী তার দুর্লভ আদর্শটিকে ধরা-ছোঁয়ার গোচর করবার দুরাশায় তাকে অনেকটা খর্ব করেও এনেছিল।

তার অমন সুঠাম দেহের দৈর্ঘ্য থেকে দু-চার ইঞ্চি ছেঁটে দিয়ে, তার ওই উজ্জ্বল গৌর কান্তিতে একটুখানি শ্যামলের ছোপ ধরিয়ে তার দাড়িকে শেষ পর্যন্ত না-মঞ্জুর করে, (কারণ কে না জানে যে ভক্তির রাজ্যে যাই হোক প্রেমের রাজ্যে দাড়ি অচল) তার গোঁফ সম্বন্ধে একটু উদার হয়ে, তাকে প্রায় সাধারণত্বের কোঠায় এনে ফেলেছিল।

তবু তার দিশা পাওয়া যায়নি। একটি সুকোমল নারীহৃদয়ে তার জন্য এত সম্ভার রক্ষিত আছে, তবু যদি সে নরাধম অনুপস্থিত থাকে তবে সে কোন রকম সহানুভূতিরও অযোগ্য একথা জেনে অবশেষে একদা নির্দয়ভাবে স্বহস্তে তাকে প্রিয়তমের সিংহাসন থেকে বিদায় দিল। এমন কি মনে-মনে তাকে আহাম্মক আখ্যা দিতেও কুণ্ঠাবোধ করল না। তবু মাঝে-মাঝে নির্জন নিশীথে তার মনে সংশয়ের দোলা লাগত, আর ওই শূন্য সিংহাসনখানা অন্ধকারে হাহাকার করত।

সময় কিন্তু লঘুপদে চলে যেতে লাগল আর মন্দাকিনীর যৌবন থেকে একটু একটু করে মধু চুরি করে নিতে লাগল। মন্দাকিনী এতদিন অলস ছিল না, ধীরে-ধীরে অনেক বিদ্যাকে অনেক ললিতকলাকে আয়ত্ত করে ফেলেছিল।

তার কাঁচা-রূপের সাজ আভরণে আস্তে-আস্তে অভিজ্ঞ সুরুচির পরিচয় পাওয়া গেল। সে রূপসীও নয়, কুরূপাও নয়। দুইয়ের মাঝামাঝি এমনটি, যার মাধুর্য দেখামাত্র চোখে পড়ে না, কিন্তু মন দিয়ে খুঁজলে সুপ্রকাশ হয়ে পড়ে।

যত দিন যেতে লাগল তার কথায়, ভঙ্গিতে, সজ্জায়, এমন কি কবরী

রচনাতেও একটা তীব্রতা প্রকাশ পেল, যার মাধুর্য মধুরের চেয়ে তিক্ত বেশি। রৌদ্রবর্ণ বহুমূল্য সুরা যেমন বেশিদিন রেখে দিলে তিতিয়ে যায়। আর নিরন্ত তার কানে বাজতে লাগল কালের রথের চাকার ধ্বনি।

জীবনটাকে যখন শূন্য বোধ হবার আশঙ্কা হলো, মন্দাকিনীরও সুবুদ্ধি হলো। হৃদয়ের সমস্ত অপ্রার্থিত প্রেমরাশি একজন অনাগত মানুষের চরণ থেকে অপসারিত করে সে সহজে আয়ত্ত বস্তুর উপর ন্যস্ত করল। বস্তুর পোষমানা ভাবটা তাকে নিগূঢ়ভাবে আকর্ষণ করতে লাগল। যে-সকল বস্তুকে কামনা করলে, এবং যে-ভাবে কামনা করলে অন্তঃকরণ স্থূল ও বৈষয়িক হয়ে যায়, তারা সে ভাবে মন্দাকিনীকে লুব্ধ করল না। সে ভালবাসল প্রাচীন ও আধুনিক চিত্র, পুঁথি, বাসন, সূচিকর্ম, নক্শা-দেওয়া হাতে-বোনা পর্দা, মিনে-করা চৌকি, এমন আরও কত কী।

সৌন্দর্যের এমন একটা মোহিনী শক্তি আছে যে, যে তাকে অর্থ দিয়ে কেনে তাকেও সে নক্ষত্রালোকে নিয়ে যায়। যা কিছু সুন্দর, সৌন্দর্যই তার সার্থকতা। তার আর কোনও গুণের প্রয়োজন নেই। সে নয়নানন্দ। তার কাছে আর কিছু প্রত্যাশা করলে তার প্রাণময় পরিপূর্ণ রূপরাশি অর্থহীন বিলাসে পরিণত হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে।

যে কেউ সৌন্দর্য উপভোগ করতে জানে না। কিন্তু মন্দাকিনী জানত; তাই তার বারবার হতাশ হয়ে যাওয়া হৃদয় মরুভূমি না হয়ে গিয়ে নিত্য নূতন রসের উৎসের সন্ধান পেল।

সৌন্দর্যের উপাসকের যে অনাবিল অবসর ও অজস্র অর্থের প্রয়োজন, যে দুষ্ট-শনি মন্দাকিনীর পিছু নিয়েছিল, সে একদিন সে সকল হরণ করে নিল। মন্দাকিনী সৌন্দর্যের উপাসনা তখনকার মতন বন্ধ করে দিয়ে, সৌন্দর্যের সামগ্রীগুলোকে এবাড়ি-ওবাড়ি বাক্সবন্দী করে কেমন করে যেন এক মাস্টারী জোগাড় করে দার্জিলিং চলে গেল।

দার্জিলিংয়ে গুছিয়ে বসলে পর চারদিকে চেয়ে মন্দাকিনী দেখল হিমালয়ের কোলে-কোলে রডোডেণ্ড্রন গাছের সারি, কিন্তু তার একটিরও উদ্ধত শাখার রাঙা পুষ্পস্তবকের নাগাল পাওয়া যায় না। পাহাড়ের কানা ধরে-ধরে একটির পর একটি ঝাউ গাছের শ্রেণী, কিন্তু তাদের দীর্ঘ শীর্ণ ছায়াগুলি অগম্য রাজ্যে। নিচের উপত্যকায় সাদা মেঘ জমেছে, সেখানে পৌছনো অসম্ভব।

একদিক রোদে স্নান করেছে, সেদিকে চাইলে মন গলে জল হয়ে যায়;

অন্ত দিক কুয়াশাচ্ছন্ন, সেদিকে চাইলে মন জমে বরফ হয়ে যায়। কিন্তু এ সৌন্দর্য নৈর্ব্যক্তিক, একে মন্দাকিনীর সেই জয়পুরী চৌকির মতন কোলের কাছে টেনে নেওয়া যায় না। বরং একে বেশিক্ষণ দেখলে মনে একটা নিষ্কাম বৌদ্ধভাব জন্মায়।

ঠিক এই সময়, যখন জগতটা মন্দাকিনীর কাছে অকিঞ্চিৎকর হয়ে আসছিল তখন সে এক ম্লান গোধূলির আলোতে ডাক্তার চ্যাটার্জীর খুদে বাড়িখানা আবিষ্কার করল।

পাহাড়ের গায়ে একটুখানি অপরিসর জমির উপর, সত্যি কথা বলতে কি খানিকটা শূন্যমার্গে, লোহা ও ইঁটকাঠের উপর ধৃত হয়ে অতি বিপদজ্জনক-ভাবে, কায়ক্লেশে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে প্রবল সাক্ষ্য দিয়ে কোনও গতিকে বাড়িটি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মন্দাকিনীর হৃদয়ে তার মায়াজাল বিস্তার করল।

একমুহূর্তে তার চোখে পৃথিবীর রঙ বদলে গেল। তার যে মন দূর বনান্তরালে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পদাঙ্গুলির অগ্রভাগে নির্ভর করে, দুই পক্ষ বিস্তার করে বিহঙ্গের মতন উড়ে যাচ্ছিল, সে আবার পাখা বন্ধ করে কুলায়ে ফিরে এলো।

চর্মচক্ষে মন্দাকিনী দেখল বহুবর্ষের বৃষ্টিধারায় রঙ ওঠা, কাঁচে মোড়া, বিবর্ণ সবুজ পর্দা ঘেরা ছোট দোতলা বাড়ি। ভাঙা কাঁচের অন্তরালে দৃশ্যমান ধূলিমলিন মনোমোহিনী কাঠের সিঁড়ি। পশ্চিম দিকের ঝাউগাছ তাদের আলম্বিত ছায়াগুলিকে দেওয়ালের উপর ফেলছে। সামনের শান-বাঁধানো জমির ধারে ধারে ক্রিস্যান্থিমাম গাছ, জেরেনিয়াম গাছ, আর তাদের পদপ্রান্তে প্রিমরোজ ও ভায়োলেট। কোথাও একটি ফুল ফোটে নি এবং কখনও ফুটবে কিনা সন্দেহ। জনমানুষের সাড়া নেই।

এই শূন্য বাড়িখানা মন্দাকিনীর হৃদয়কে এক নিমেষে গ্রাস করল। সে তার মাস্টারনী-সুলভ গাম্ভীর্য ভুলে গিয়ে গেট খুলে অনধিকার প্রবেশ করল। এবং অমার্জনীয় ভাবে পায়ের আঙুলের উপর দাঁড়িয়ে ছেঁড়া পর্দার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতর দেখল গদি মোড়া প্রাচীন ও সুশ্রী আসবাবে ধুলো জমেছে।

তারপর ওই বাড়ি তাকে যাদু করল। অনেকদিন পর সে তার মিনে-করা বাসন ইত্যাদির দুঃখ ভুলে গেল। সমস্ত দিনের কর্ম-ব্যস্ততা অসহ্য মনে হতো। বিকেলবেলা ওই রঙ-ধোওয়া বাড়ির কাছে সে নিজেকে খুঁজে পেত।

দিনের পর সপ্তাহ ও সপ্তাহের পর মাস এইভাবে গড়িয়ে গেল। মন্দাকিনী

মনে মনে বাড়িখানাকে মেজে-ঘষে ফেলল, পুরানো সবুজ পর্দাগুলি ধোপার বাড়ি পাঠিয়ে নতুন ঘোর গোলাপী রঙের পর্দা লাগাল। প্রাচীন আসবাবের ধুলো মুছল, বাগানটির সংস্কার করে অনেক যত্নে সেখানে ফুল ফোটাল। এমন কি কালো চীনেমাটির চ্যাপটা ফুলদানিতে ফুল সাজাল।

হঠাৎ একদিন মন্দাকিনী মনে মনে একটা বেহিসাবী কাজ করে ফেলল। মনগড়া অপরূপ এক দাঁড় করান বিজলী বাতি কিনে ফেলল, কোথায় তাকে মানাবে ভেবে মনে বড় অশান্তি অনুভব করল। মনস্থির করবার জন্য বিকেলবেলা সেখানে গিয়ে গেট খুলে ঢুকেই পটের পুতুলের মতো থমকে দাঁড়াল।

আধ-ময়লা ছাই রঙের পেন্টালুন, গলা-খোলা নীল রঙের শার্ট আর কালো পশমের গেঞ্জি গায়ে একজন লোক ঝাঁঝরি হাতে মরা ফুল গাছে জল দিচ্ছে। তার মুখের ডান পাশে প্রাচীন পাইপ এবং দেখামাত্র বোঝা যায় যে তিনদিন ক্ষৌরকর্ম হয়নি। রান্নাঘরের খোলা জানলা দিয়ে অশুদ্ধ তেলের গন্ধ ভেসে আসছে।

সেই ব্যক্তি মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে, হাত থেকে ঝাঁঝরি নামিয়ে অবাক হয়ে দেখল গেটের উপর হাত রেখে বছর ত্রিশ বয়সের একজন শ্যামবর্ণা মহিলা বেতসলতার মতো কাঁপছে। তাকে বিপন্ন মনে করে কাছে যেতেই সে একটু অপ্রতিভ স্বরে বলল, 'আমি রোজ আসি।' ডাক্তার চ্যাটার্জী বললেন, 'বাড়ি আর বাগানের অবস্থা থেকে তার পরিচয় পেয়েছি।' তাতেই মন্দাকিনীর একটু রাগ হলো এবং রোষকষায়িত নেত্রে ঝাঁঝরিখানা নিয়ে যে গাছে ডাক্তার চ্যাটার্জী একবার জল দিয়েছেন তাতে আবার জল দিতে লাগল। আর ডাক্তার চ্যাটার্জী পাইপটা আবার মুখে দিয়ে প্রসন্নচিত্তে মস্ত এক গাছ-ছাঁটা-কাঁচি তুলে নিলেন।

এমনি করে মন্দাকিনীর মন আর মন্দাকিনীর মনোবাঞ্ছার মাঝে এক অন্তরাল রচনা হলো। ডাক্তার চ্যাটার্জীর মধ্যে নয়নলোভন কোনও গুণ প্রকাশ পেল না যা বিন্দুমাত্র চিত্তাকর্ষণ করে। এমন কি চিত্তাকর্ষণ করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা পর্যন্ত দেখা গেল না।

কোন সুদূর মহানগরীর ছায়াময় খ্যাতি তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত ছিল—তাঁর বিষয় অদম্য কৌতূহল ছাড়া মন্দাকিনীর মনে কোন ভাবান্তর ঘটল না। যৌবনের তার স্বপ্নে দেখা সেই পুরাতন প্রিয়তমের ই ভিন্মূর্ত মন্দাকিনীর জানা

ছিল না। সে ধনী কি নির্ধন, কোন কাজকর্ম করে কি ঘরে বসে থাকে, এই সকল অতি তুচ্ছ তথ্য জানবার প্রয়োজনই তার মনে আসে নি; সে দ্বিধাহীন চিত্তে দর্শনমাত্রেই তার গলায় বরমাল্য দিয়েছিল! কিন্তু ডাক্তার চ্যাটার্জী সম্বন্ধে তার জিজ্ঞাসার অন্ত ছিল না।

এক মাস কাল সময়, অশেষ ধৈর্য ধারণ এবং সমস্ত ছোট বাগানখানার আমূল সংস্কারের পর মন্দাকিনী জানল তাঁর বয়স চল্লিশ বছর, অবিবাহিত, ধর্ম-বিরোধী, কিন্তু ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটু একটু সন্দেহ আছে, দৈর্ঘ ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি, ওজনের কথা প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক।

স্ত্রীজনসুলভ নানান চাতুরী অবলম্বন করে মন্দাকিনী তাঁকে দিয়ে নতুন গোলাপী পর্দা কেনাল, দরজা-জানালায় সবুজ সাদা রঙ লাগাল, গেটের পাশে চেরী গাছের কলম বসাল।

এমনি করে মন্দাকিনীর স্বপ্ন ফুলের মতন ফুটতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ একদিন সন্ধ্যেবেলা মন্দাকিনী আবিষ্কার করল ইডেনে সর্প প্রবেশ করেছে।

কে একজন অতি তরুণী, তনুদেহে সবুজ জর্জেটের শাড়ি অপরূপ করে জড়িয়ে, কালো কোঁকড়া চুলগুলিকে মাথার ওপরে অভিনব রুচিতে চুড়ো করে বেঁধে, ডাক্তার চ্যাটার্জীর স্কন্ধ অবলম্বন করে অতি-রক্তিম ঠোঁট দুখানিকে ঈষৎ আলগা করে হিমালয় দেখছে। আর তার সর্বাঙ্গ থেকে মাধুরী ঝরে পড়ছে।

এইটুকু মাত্র। কিন্তু মন্দাকিনীর হৃদয় বিকল হলো। ত্বরিত পদে সেখান থেকে সে ফিরে গেল। তার মানসচক্ষের সম্মুখে ওই মেয়েটি তার সবুজ জর্জেটের আঁচলখানা মেলে দিয়ে এমন একটা শ্যামল অন্তরাল সৃষ্টি করল যাকে ভেদ করে মন্দাকিনীর লুব্ধ চোখ আর সেই ছোট বাড়ি কি তার মালিককে দেখতে পেল না।

মন্দাকিনীর হৃদয়ে জীবনে এই প্রথম ঈর্ষা জন্ম নিল। এবং তার সবুজ চোখের কাছে সমগ্র জগতখানা বিষময় হয়ে উঠল। যেখানে কোনও দাবি নেই সেখানে নৈরাশ্যের জ্বালা সব থেকে তীব্র, কারণ তার কোনও প্রতিকার হয় না।

মন্দাকিনী নিজেকে শত শত গঞ্জনা দিল। তার কোন অনুযোগের কারণ নেই। ডাক্তার চ্যাটার্জীর বাড়িতে তাঁর যে কোনও অতিথি আসুক না কেন মন্দাকিনীর তাতে কি? কিন্তু তবুও দার্জিলিংয়ের হিমকুজ ঝটিকা একেবারে

হৃদয়ে গিয়ে প্রবেশ করল। তার ব্যথিত দৃষ্টি হিমালয়ের পুঞ্জিত রূপরাশির মধ্যে কোনও দিন কোন কোমলতা খুঁজে পায় নি, আজও পেল না।

এক সপ্তাহকাল উত্তরবিহীন আত্মজিজ্ঞাসার পর মন্দাকিনী আবার ডাক্তার চ্যাটার্জীর সমীপে উপস্থিত হলো। আর তার কোন আশঙ্কা নেই, মন তার বর্ম পরেছে। নৈরাশ্যের গভীরতম অতলে যে ডুব দিয়েছে সে আবার চোখে আলোর রেখা দেখতে পায়। সে ঔদাসীন্যের চন্দ্রালোক, শীতল সুন্দর।

মন্দাকিনী তাই সাহসে বুক বেঁধে দৃষ্টিতে ত্যাগের মহিমা নিয়ে ডাক্তার চ্যাটার্জীর সমীপে উপস্থিত হলো।

দেখল দরজা-জানলা খোলা হয় নি, ফুলগাছে জল দেওয়া হয় নি। উদাসী মনের উপর উদ্বেগের কালো ছায়া নেমে এলো। যাকে ত্যাগ করা যায় তার মঙ্গল কামনা করতে কোন বাধা নেই।

কম্পিত পদক্ষেপে সিঁড়ি দিয়ে উপরে গিয়ে মন্দাকিনী দেখল শোবার ঘরের পর্দা ওঠানো, জানালা বন্ধ, শার্সিতে ধুলো এবং টেবিলে বই, ড্রেসিং টেবিলে বই, আরাম কেদারায় বই, আরাম কেদারার নিচে বই, পাশে বই, পিছনে বই, মোড়াতে বই, জলচৌকিতে বই এবং মেঝের গালিচাতে রাশি-রাশি দিশী ও বিলেতী বই। স্প্রিংযুক্ত লোহার খাটে বাদামী রঙের কম্বলে ঢাকা, রোগপাণ্ডুর মুখে ডাক্তার চ্যাটার্জীকেও দেখা গেল।

আবেগের আতিশয্যে মন্দাকিনীর বাক্যরোধ হলো। ডাক্তার চ্যাটার্জী হাত থেকে রিলিজিও মেডিচিখানা নামিয়ে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

মন্দাকিনী নির্বাক রইল। তার অভিজ্ঞতামতে মনে যার অভিমান নেই, তার স্নেহপ্রেমের লেশমাত্রও নেই। মন্দাকিনী তাই হতাশ হলো। কিন্তু তার উৎকর্ণ মন মুহূর্তের মধ্যে নৈরাশ্যের চেয়ে ঘরের অপরিচ্ছন্নতা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ল। সে আয়নার সামনে গিয়ে প্রথমে নিজের কেশ-বেশ সংস্কারের পরে রুমাল দিয়ে ওই আয়না সংস্কারে মনোনিবেশ করল।

শান্তকণ্ঠে ডাক্তার চ্যাটার্জী বললেন, আমার ভাগ্নী এসেছিল, তোমায় দেখাতে পারলাম না।

মন্দাকিনী এর উত্তরে কি বলবে ভেবে পেল না। ভাবল হয়তো মন্দাকিনীর মনোভাব সম্বন্ধে ডাক্তার চ্যাটার্জীর কোন কৌতূহল নেই।

হঠাৎ রুমালের আঘাতে ছোট একটা জিনিস মাটিতে পড়ল। মন্দাকিনী অপ্রতিভ হয়ে তুলে নিয়ে দেখল একটি নক্ষত্রোজ্জ্বল হীরা-বসানো মেয়েদের আংটি।

চোখ তুলতেই ডাক্তার চ্যাটার্জীর ঈষৎ ক্লান্ত চোখে দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। ডাক্তার চ্যাটার্জী স্নিগ্ধ-স্বরে বললেন, আমার মায়ের বিয়ের আংটি। মনে করেছি তোমার হাতে মানাবে। বলে পরিয়ে দেবার বিন্দুমাত্র উদ্যোগ না করে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

মন্দাকিনী শেষ পর্যন্ত আংটিটা নিজেই পরল। আর দুটি মুক্তোর মতন দুই বিন্দু অশ্রু আস্তে আস্তে গাল বেয়ে গড়িয়ে গেল।

ডাক্তার চ্যাটার্জীর নিকোটিন-রঞ্জিত ডান হাতখানি মন্দাকিনীর ক্ষীণ মণিবন্ধে নিবদ্ধ হলো আর সেই সঙ্গে মন্দাকিনী অনুভব করল তার হৃদয়ের সকল রুদ্ধ বাতায়নগুলি একে-একে খুলে গিয়ে সূর্যালোক আর দক্ষিণ-বাতাস যুগপৎ সেখানে প্রবেশ করল।



বর

আশালতা সিংহ

মাঘ মাসের শেষে যে এমন সৃষ্টিছাড়া বৃষ্টি হয়, তাহা কস্মিন্‌কালেও জানা ছিল না। বরদাসুন্দরী দেবী আজ তিন চারি দিন কোথাও বাহির হইতে পান নাই। তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিয়াছে। শেষে আর থাকিতে পারিলেন না, ড্রাইভারকে ডাকিয়া গাড়ীখানা বাহির করিতে আদেশ দিয়া ফেলিলেন। বেশী দূর না হয়, একবার মালতীর ওখান হইতে ঘুরিয়া আসিবেন। সন্ধ্যার দিকে তখন সামান্য ক্ষণের জন্য বৃষ্টিটা ধরিয়াছিল। আকাশ কিন্তু মেঘাবৃত হইয়াই ছিল, থাকিয়া থাকিয়া দমকা বাতাস দিতেছিল। দামী গাড়ী লেশমাত্র শব্দ না করিয়া নিস্তরঙ্গ অবাধগতিতে পথে যাইতেছিল, বরদাসুন্দরী উৎসুক হইয়া ভাবিতেছিলেন, আজ মালতীর কাছ হইতে কৌশলে জানিয়া লইবেন, তাহার মেয়ে অশোকার কোর্টশীপ্‌ কত দূর। পরের হাঁড়ীর খবর লইবার কল্পনামাত্রই তাঁহার অবসাদগ্রস্ত মনকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল। মালতীদের বাড়ীর গেটের সম্মুখে গাড়ী থামিল। বাগানের আইভিলতা ও রজনীগন্ধা গাছগুলির উপর বৃষ্টিবিন্দু ঝলমল করিতেছে। একটি সজল সুঘ্রাণ উঠিতেছে। গেটের কাছে খুব উজ্জ্বল একটা বিজলীবাতি জ্বলিতেছে। মোটর হইতে নামিয়া বরদাসুন্দরী ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখের হলঘরে পর্দ্দা ফেলা। নেটের পর্দ্দার স্বচ্ছ আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরের নীলাভ আলো বিচ্ছুরিত হইতেছে। এস্রাজের সুরের সহিত সুর মিলাইয়া কে গাহিতেছে—

"আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে
মেঘ-আঁচলে নিলে ঘিরে।"

বরদাসুন্দরী যদিও কোন কালে সুর-রসিক নহেন, তথাপি মেঘাবৃত আকাশ এবং সজল বাতাসের সহিত মিশ্রিত হইয়া মেঘ-মল্লারের করুণ সুর তাঁহার মন্দ লাগিল না। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে তিনি মনে মনে কহিলেন "না, অশোকা মেয়েটা গান বেশ গায়। গলাটা মিষ্টি।"

মালতী—তাঁহার সখী এবং এ বাড়ীর গৃহিণী তখন জানালার কাছে একটা চেয়ারে বসিয়া উলের সোয়েটার বুনিতেছিলেন।

পরস্পরের স্বাগত সম্ভাষণ শেষ হইবার পর বরদাসুন্দরী কহিলেন, "তোমার ভাই অধ্যবসায় খুব। আমি তো মোটে উল কাঁটা নিয়ে অতক্ষণ বসতে পারিনে। সেদিন অনাথসদন থেকে দিতে এসেছিল। তারা বলে, আপনার অবসর সময়ে সোয়েটার, জাম্পার, স্কার্ফ এই সব বুনে দিন আমরা বিক্রি করে লাভটা অনাথসদনে দিই। তা আমার ভাই অত ধৈর্য্য নেই। বসে বসে এক-মনে ঘর গুণে গুণে বুনে যাও, অত পারিনে।"

মালতী ক্ষীণ হাস্যে কহিলেন, "এগুলো অনাথসদনেরই বুনছি। কি করবো, মানুষে যখন চিন্তা করে, তখন হাতে একটা লোকদেখানো কাজ চাই। সেটার আড়ালে আত্মগোপন করা যায়।"

বরদাসুন্দরী চাপিয়া বসিলেন, "কিসের এত চিন্তা, ভাই তোমার? একটি তো মোটে মেয়ে। মেয়ে সুন্দরী, গুণবতী। অমন গলা—অমন লেখাপড়া!"

প্রত্যুত্তরে মালতী কিছু বলিলেন না। শুধু একটুখানি ম্লান হাস্যে তাঁহার নিঃশব্দ অধরোষ্ঠ রঞ্জিত হইল। আঙ্গুলগুলি নিপুণতায় উল এবং কাঁটা লইয়া যেন খেলা করিয়া গেল। খোলা জানালা দিয়া অশোকার গানের কথাগুলি সুরসহযোগে ভাসিয়া আসিতেছিল—

"আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে
মেঘ-আঁচলে নিলে ঘিরে।
সূর্য্য হারায় হারায় তারা।
আঁধারে পথ হয় যে হারা।
ঢেউ দিয়েছে নদীর নীরে"......

সহসা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মালতী কহিলেন, "না এর চেয়ে সেকেলে হিঁদু-বাড়ীর যে প্রথা—ঘটক এলো, বরের সন্ধান দিলে, সব দিক দেখে শুনে ভালো দেখে মা একটা বেছে বিয়ে দিয়ে দিলে নিশ্চিন্দি। সে ঢের ভাল।

আর আমাদের যেন হয়েছে সংশয়ের বেড়াবন্ধনের মধ্যে বাস। বুঝবার অহঙ্কার করি, অথচ কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারিনে।"

বরদাসুন্দরী জিজ্ঞাসুভাবে তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ব্যাপারটা নিজে সম্যকরূপে বুঝিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে বলিলেন, "কেন কি হয়েছে? অজিতকে কি অশোকার পছন্দ হয়নি? আমরা তো প্রতিদিন আশা করছি কবে অজিত আর অশোকার বাক্‌দান উৎসবে যোগ দেব।"

মালতীর ইচ্ছা ছিল না বরদাসুন্দরীর কাছে কোন কথা বলেন। কারণ, তাঁহার কাছে কোন কথা বলা মানেই গোটা সহরটিতে অচিরাৎ সে খবর রাষ্ট্র হওয়া। কিন্তু ঝোঁকের মাথায় একবার যখন বলিতে সুরু করিয়াছেন, থামিতে পারিলেন না। বলিলেন, "সেই তো ঠিক হয়ে আছে। কিন্তু সভ্য সমাজের অতিসভ্য বিধান—ছেলে-মেয়েরা পরস্পরের মত জানাবে। ওরা কিন্তু হাঁ বলে না, না-ও বলে না। একটা অনিশ্চিত উদ্বেগের মধ্যে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। কিছুই ধরা-ছোঁওয়া যাচ্ছে না। ভারি অশান্তিতে আছি।"

বরদাসুন্দরী একাধারে ভরসা ও আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ও ঠিক হয়ে যাবে। যত দিন যাচ্ছে, মানুষের বুদ্ধি ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হচ্ছে কি না। এই দেখ না, আমাদের সময়ে আমরা মোটামুটি যা বুঝতাম—যা ভাবতাম—যে কথার যে মানে ধরতাম, আমাদের ছেলেমেয়েরা তার চেয়ে অনেক বেশী বোঝে, অনেক ভাবে এবং অনেক রকম মানে বার করে। তা ভাবনা কিছু নেই। অশোকার যেমন সুন্দর এস্রাজে হাত আর যা মিষ্টি গলা, শীগ্‌গীর সব ঠিক হয়ে যাবে। অজিতের সামনে গান-টান করে তো?"

মালতী হাসিয়া বলিলেন, "তা করে বই কি। গান মাঝে মাঝে করে।"

অতঃপর আরও কিছুক্ষণ বসিয়া বরদাসুন্দরী বিদায় লইলেন। আজ যখন বাহির হইয়াছেন, আরও দুই-এক বাড়ী বেড়াইয়া খবরাখবর লইয়া ফিরিবেন। তিনি চলিয়া গেলেন, কিন্তু মালতী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। বরদাসুন্দরী-কথিত স্থূল ও সূক্ষ্মের উপমাটি তাঁহার ভারি মনে লাগিয়াছিল। মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন, ঐ কথাটার ভিতরেই সমস্ত সমস্যাটা নিহিত রহিয়াছে। আধুনিক ছেলেমেয়েরা একটা কথার এত রকম মানে বাহির করে এবং প্রত্যেকটি কথা চিরিয়া-চুনিয়া বিশ্লেষণ করিয়া এমন একটা ব্যাপার করিয়া তুলে যে, নিজেদের মনের ভাব নিজেদের পক্ষে সঠিক করিয়া জানাও একটা বৃহৎ কাণ্ড হইয়া দাঁড়ায়।

তার পর ঐ গানের কথা। বরদাসুন্দরী তাড়াতাড়ি করিয়া যে প্রশ্ন করিলেন, অশোকা অজিতের সামনে গান-টান গায় তো? ঐ প্রশ্নটা শুনিয়া প্রথমে হাসি পাইয়াছিল বটে, কিন্তু যখন নিজেরই অতীত জীবনের বিস্মৃত দিনগুলির কথা মনে পড়িয়া গেল, তখন হাসির পরিবর্ত্তে মুখে একটা গাঢ় তন্ময়তার ভাব ফুটিয়া উঠিল। খোলা জানালা দিয়া ঝড়ের রাতের এলোমেলো বাতাস আসিতেছে। বাতাসে আসন্ন বৃষ্টির আহ্বান-ধ্বনি। অলসশিথিল অঙ্গুলী হইতে উল এবং কাঁটাগুলি কখন স্খলিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে।

মালতীর নয়ন সম্মুখে তাঁহার অতীত দিনগুলি কত বৎসরের উজান ঠেলিয়া বাস্তব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ যেমন তাঁহার মেয়ে অশোকার মনের কথা জানিতে না পারিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়াছেন, তেমনই এক দিন তাঁহার তরুণ মনের রহস্যঘন আলো-ছায়ার খেলা বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া তাঁহার নিকটতম আত্মীয়-জনরা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল।

অশোকার বাবা কমলকৃষ্ণ চ্যাটার্জ্জি আজ যিনি রিটায়ার্ড সিভিলিয়ান, আপন লাইব্রেরীর কোণে এবং ক্লাবে বিলিয়ার্ড খেলিয়া দিনের অধিকাংশ সময় কাটান—এক দিন তিনি অভিমানী ভীরু লাজুক যুবক ছিলেন। তন্বী তরুণী মালতীকে দেখিয়া তাহার দিকে সমস্ত অস্তিত্ব তাঁহার প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু লাজুক ভীরু প্রকৃতি। মনের কথা মুখে আনিতে দেয় না। অভিমান আসিয়া বাধা দেয় প্রতি পদে। যাহাকে জানাইবেন মনের কথা—সে যদি জানিতে না চায়, যদি তাহারও মনে অনুরূপ তরঙ্গ না উঠে, তবে সে লজ্জা রাখিবার যে জায়গা হইবে না। কথা বলিতে বলিতে চোখে জল আসিয়া পড়ে, সামান্য কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইলে গলার স্বর কাঁপিয়া যায়, বিহ্বল মনের অনেক ভাষা দুটি চোখের তারা ব্যক্ত করিয়া দেয়; কিন্তু তবু মুখ ফুটিয়া কিছু বলেন না; দু'জনে দেখা হয় চায়ের নিমন্ত্রণে। দেখা হয় সন্ধ্যার স্নিগ্ধতায় বাড়ীর বাগানে—যেখানে গ্রীষ্মের দিবাবসানে পারিবারিক মজলিস বসে। দেখা হয় টেনিস খেলার সন্নিরূপে। দেখা হয় আরও ছোট-খাট নানা ছলছুতায়। কিন্তু দু'জনেই দু'জনের সম্বন্ধে সমান আশঙ্কাধর্ম্মী—সমান ভীরু। এদিকে আত্মীয়জনরা ক্রমে অধীর হইয়া উঠিতেছেন। ব্যবহারিক দিক্ দিয়া এ সম্বন্ধ তাঁহাদের কাছে একান্ত বাঞ্ছনীয় মনে হয়। তাই তাঁহারা নানা প্রকারে সুবিধা করিয়া দেন—দু'জনের একত্র নিভৃতে আলাপনের। তবু যদি তাহারা স্পষ্ট করিয়া কিছু বলে!

সে দিনটা এমনই মেঘাচ্ছন্ন দিন ছিল। মালতী একা ঘরে বসিয়া আনমনে একটা বইয়ের পাতা উল্টাইয়া যাইতেছিল, কমলকৃষ্ণ ঘরে ঢুকিলেন, ঢুকিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিলেন ;—'আপনি! আপনার দাদার সঙ্গে একটু দরকার ছিল।'

'তিনি তো নেই, বাইরে বেরিয়েছেন। বসুন না। বোধ হয় এখনই বৃষ্টি আসবে।'

কমলবাবু বসিলেন। দু'জনেই নিঃশব্দ। নিকটেই একখানা বই ছিল, কমলবাবু দ্রুত তাহার পাতা উল্টাইয়া যাইতেছিলেন। একটু লক্ষ্য করিলেই বোঝা যাইত, তাঁহার হাত কাঁপিতেছে। মনে মনে বারংবার একটা কথার পুনরাবৃত্তি করিতেছিলেন—'নিষ্ঠুর, আর কত দিন এমন অবরুদ্ধ প্রতীক্ষায় কাটান যায়। যে কথা আমার মনে রাত্রিদিন তরঙ্গ তুলিতেছে, সে কথার একটুখানি আভাস তোমার চোখের দৃষ্টিতেও ঘনাইয়া নাই?'

কিন্তু সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য! মুখে কমলবাবু বলিতেছিলেন, 'আপনি আজকের কাগজটা দেখেন নি? ইউরোপের রাজনীতি আজ প্রকাণ্ড একটা-ধাপ্পাবাজী হয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র। স্পেনে—'

কিন্তু ইউরোপের রাজনীতির বিষয়ে সম্পূর্ণ উপেক্ষা দেখাইয়া, মালতী ছল ছল চোখে মেঘের অন্তরাল ছিন্ন করিয়া, আকাশে যে একটা উজ্জ্বল তারা ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করিতেছে, সেই দিকে চাহিয়াছিল। আজ তাহার মন এত ভারাক্রান্ত হইয়াছিল, তাহার একটা কারণ ছিল। কাল রাত্রিতে মা বলিতে-ছিলেন তাহার বাবাকে—'কমল তো পষ্টাপষ্টি কিছু ব'লছে না। আমার কেমন যেন মনে হয়, মেয়েরও এতে বেশ ইচ্ছে নেই। কমলের চেয়ে ঐ যে জিতেন ছেলেটি আজকাল খুব আসা যাওয়া করে, আমেরিকা থেকে পাশ ক'রে এসেছে—ডেণ্টাল ডাক্তার—ঐ তাকেই হয় তো…'লজ্জায় মালতী বিবর্ণ হইয়া উঠিল শুনিতে শুনিতে। সারাদিন সে যাহার কথা ভাবে, যাহাকে কল্পনার রঙে রাঙাইয়া কত ভাবে নিত্য নূতন সাজে সাজায়, তাঁহার কথা সে নিষ্করুণ বহির্জগতে কেমন করিয়া প্রকাশ করিবে? কেমন করিয়া বলিবে, তিনি ছাড়া আর কাহাকেও এ জীবনে সে আসনে বসানো যায় না। উপযাচিকা হইয়া এমন কথা তো সে প্রাণ গেলেও বলিতে পারিবে না। ইহাতে তাহার ভাগ্যে যাহাই ঘটুক!

কমলবাবু উঠিলেন, একবার বন্ধ কাচের শার্সীর নিকট গেলেন। একবার মালতীর অতি নিকটে দাঁড়াইলেন। তাঁহার সমস্ত অস্তিত্ব যেন উন্মুখ হইয়া

উঠিয়াছে, কি একটা কথা বলিবার জন্য। এমন সময় মালতীর হাত হইতে বইটা সশব্দে মাটীতে পড়িয়া গেল। ঐটুকু শব্দে একটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্ভাবনার বুদ্‌বুদ্‌ ফাটিয়া গেল।

কমলবাবু হঠাৎ চমকিত হইয়া উঠিলেন। আবার ফিরিয়া নিজের আসনে আসিয়া বসিলেন। তারপর মনে হইল, বইটা তাঁহার তুলিয়া দেওয়া উচিত। আবার আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া ভূমিতে পতিত বইখানা তুলিয়া টেবলের উপর রাখিলেন। ঝুঁকিয়া পড়িয়া বই তুলিবার সময় মালতীর চুল বাতাসে উড়িয়া হয় তো তাঁহার কপাল স্পর্শ করিয়াছিল—হয় তো কেশের মৃদু সুগন্ধের মাদকতা তাঁহার মনকে ছুঁইয়াছিল—কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না কিন্তু কমলবাবু হঠাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বাহির হইয়া বারান্দার রেলিংয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন। কতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলেন—দশ মিনিট…পনেরো মিনিট দু'ঘণ্টা কিছুই তাঁহার স্মরণ নাই।

ঘরের ভিতর হইতে গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছিল। মনে হয় মালতী বই রাখিয়া দিয়া বাজনায় আসিয়া বসিয়াছিল গানের শেষ চারি লাইন সে ঘুরাইয়া ফিরিয়া বার বার গাহিতেছিল—

'ফুল হয়ে ছিনু যবে নিলে না চয়ন করি
ও চরণ পাব বলে মলিন হইয়া ঝরি।
তোমার আকাশ মাঝে চাঁদ হতে চাহি না যে
শুকতারা হয়ে আমি দিগন্তে ঠাঁই লব।'

আজ মালতীর মনে যে কথা এবং যে ভাব ক্রমাগত আনাগোনা করিতেছিল, তাহারই সহিত গানের ঐ চারি লাইনের যেন অর্থসঙ্গতি ছিল। তাই তাহার মনের সমস্ত নিরুদ্ধ আবেগকে সে ঐ সুরের ভাষায় মুক্তি দিয়াছিল। শুধু রাত্রিতে মাতা-পিতার কথোপকথনের যে অংশটুকু সে শুনিয়াছিল সে কথা বার বার মনে পড়িয়া যাইতেছিল। বাড়ীর আত্মীয় স্বজনরা আর তো অপেক্ষা করিবে না। কিন্তু সে তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করিবে না, করিতে চায়ও না। সে শুধু এক জনকে তাহার অভিযোগের ডালি—অভিমানের ডালি উজাড় করিয়া দিয়া বারংবার বলিবে—

'ফুল হয়েছিনু যবে নিলে না চয়ন করি।'

কখন গান থামিয়া গিয়াছে। কিন্তু গানের সুর কমলকে সাহসী করিয়া তুলিয়াছে। সমস্ত সঙ্কোচ আপনা আপনি তখন শ্লথ হইয়া ঝরিয়া গিয়াছে।

মালতীর পিছনে আসিয়া তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন।

কহিলেন, 'মালতী, রবীন্দ্রনাথের 'রাত্রে ও প্রভাতে' কবিতা পড়োনি! সারা রাত্রির মিলন-পূর্ণিমার মাদকতা ভোর বেলায় স্বচ্ছ শান্ত শুকতারার পুণ্য দীপ্তিতে মিশে যায়। একটাকে বাদ দিয়ে আর একটা পাওয়া যায় কি? আমি কিন্তু...'

মালতী কম্পিত স্বরে বাধা দিয়াছিল, 'তুমি কিন্তু কি......'

'কিছু না। কিন্তু চাঁদ না উঠ্‌লে যে সমস্ত রাত্রি আকাশ অন্ধকার থাকে। আমার সারা জীবন কি তেমনই অন্ধকারে প্রতীক্ষা ক'রেই কাটবে?'

ইহার পর দু'জনে দু'জনকে নিবিড়ভাবে জানিয়াছিল। বৃথা সরম-সঙ্কোচের ব্যবধান-ছায়া ফেলে নাই। কিন্তু সেই সঙ্কোচটুকু—যাহা এত স্বচ্ছ অথচ এত অলঙ্ঘনীয়—সেটুকু ঐ গানের সুরের মধ্যবর্ত্তিতা ছাড়া কাটিত কি?

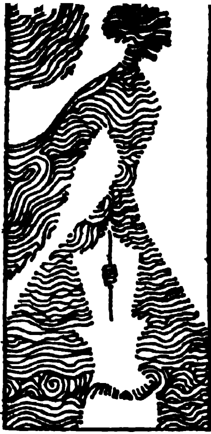
অতীত দিনের সে সমস্ত কথা মনে পড়িতে মালতীর মুখে এখনও সলজ্জ আভ ছায়া ফেলিল। ঈষৎ হাসিয়া তিনি নিজেকে অপরাধী করিয়া মনে মনে বলিলেন, "নিজেদের কথাগুলো ভুলে বসে থাকি। যখন মনে পড়ে যায়, তখন বুঝ্‌তে পারি, অশোকা ও অজিতকে তাড়া দিয়ে লাভ নেই। ওদের ব্যবহারে অধৈর্য্য দেখানোও ভুল।"

এমন সময় জানালা দিয়া দেখা গেল, অজিতের ছোট মোটরখানা গেট দিয়া ঢুকিল। ঈষৎ উদ্বিগ্ন হইয়া সেলাই রাখিয়া মালতী উঠিলেন। নীচে নামিয়া অজিতের চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। নীচের হলঘরে অশোকা তখনও গান করিতেছিল—

"সূর্য্য হারায় হারায় তারা,
আঁধারে দিক্ হয় যে হারা।"

অজিত বিশেষ শব্দ না করিয়া গায়িকার একান্ত নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। দ্বারের বাহিরে মালতী রুদ্ধনিঃশ্বাসে অল্পক্ষণের জন্য দাঁড়াইলেন। হঠাৎ গান থামিয়া গেল। অজিত রুদ্ধস্বরে কহিল, "অশোকা, অন্ধকারে আমারও যে সমস্ত একাকার হয়ে গেছে। তুমি কি আলো দেখাবে না? যে কথা কতবার মুখে এসেছে, কিন্তু ব'ল্‌তে পারিনি, আজ তাদের তোমার কাছেই নিবেদন করে দিলাম সব সঙ্কোচ ছেড়ে।"

অশোকার ভীরু কম্পিত হাতখানি তাহার হাতে আসিয়া মিলিল। মালতী একটা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া দ্বারের নিকট হইতে সরিয়া গেলেন। সুরের মায়া অশোকার জীবনের সন্ধিস্থলেও কার্য করিয়াছে।



প্রা

প্রতিভা বসু

একদিন সন্ধ্যাবেলা এক ভদ্রমহিলা বেড়াতে এলেন আমাদের বাড়ি। মাথার চুল এতো সাদা হয়ে গেছে যে, প্রথমটায় চিনতে পারিনি, একটু পরেই ও, আপনি? বলে তাড়াতাড়ি আদর-যত্ন করে বসালাম, কক্ষান্তরে গিয়ে চায়ের জল চাপাতে বলে মিষ্টি আনতে দিলাম।

মহিলাটি বললেন, প্রায় দশ বছর বাদে, না?

আমি বললাম, তা তো হবেই।

তোমার চেহারা তো ঠিক আগের মতোই আছে।

হেসে বললাম, আপনার চুল ছাড়া আপনিও প্রায় তেমনি আছেন।

ঠিক তেমনি?

পাড়-ছাড়া কাপড়ে অবশ্য এই প্রথম দেখছি।

বড়ো ছেলের বিয়ে দিয়েই এটা ধরলাম। তারপরে বুনির বিয়ে হলো, রঞ্জনের বিয়ে হলো—

সবাই কলকাতায় আছে তো?

কেউ না। আমি নিতান্তই নিঃসঙ্গ। দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, ছোট্ট একটা বাড়ি করেছি নিউ আলিপুরে, একা থাকি।

ওঁরা কে কোথায় আছেন?

বড়োটি পুণায়, ছোটটি জলপাইগুড়ি, মেয়ে দিল্লিতে।

সবাই দেখছি খুব দূরে দূরে। যান না মাঝে মাঝে?

যাই, কিন্তু থাকি না।

ঘুরে ঘুরে থাকলে পারেন, তা হলে এতো একা একা লাগে না।

একটু হাসলেন। যাদের নতুন জীবন, নতুন সংসার, পুরোনো মানুষ সব সময়েই সেখানে অবান্তর। এক গ্লাশ জল দেবে?

নিশ্চয়ই।

জল এনে দিলাম। খেয়ে গ্লাশটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, তোমার 'সঙ্গসুধা' গল্পটা আমি পড়েছি।

বলামাত্রই আমার ত্রাস হলো, জানি, এরপর তিনি কী বলবেন।

তোমার তো ঐ একটাই বিষয়—প্রেম।

আপনার জন্য চা করে নিয়ে আসি—আমি ওঠবার চেষ্টা করেছিলাম, তিনি বসিয়ে দিলেন, চা পরে হবে, কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই যে, গল্পটায় তুমি যা লিখেছ তা কি সত্যি বিশ্বাস করো?

আমি আমতা আমতা করছিলাম। আমার লেখা নিয়ে চিরকাল আমি এঁর কাছে তিরস্কৃত। অনেকবার অনেক গল্প বা উপন্যাস পড়ে উত্তেজিত হয়ে তিনি ছুটে এসেছেন, মুখ লাল করে বলেছেন, হাজার হোক, তুমি তো একজন মেয়ে, তোমার হাত দিয়ে কী করে এই সব অসংগত অন্যায় ভালোবাসার গল্প বেরিয়ে আসে, ছি! এ রীতিমতো সমাজবিরোধী কাজ, কতো মেয়ের এতে চরিত্র নষ্ট হতে পারে তা তুমি জানো?

আমার মুখটা তখন বোকা-বোকা হয়ে গেছে।

ভুরু কুঁচকে বলেছেন, মনে হয় তোমার জীবন খুব মসৃণ নয়, সত্য করে বলো দেখি কতো পুরুষের সঙ্গে প্রেম করেছ?

মিনমিন করে বলেছি, গল্প তো গল্পই, তার সঙ্গে কি নিজের জীবনের মিল থাকে কোনো?

থাকে। নিশ্চয়ই থাকে। অন্তত তোমার গল্প পড়লে নিশ্চিত বোঝা যায় সেটা। নইলে অত খুঁটিনাটি জানো কী করে? নায়ক-নায়িকার সংলাপ পড়তে পড়তে তো মনে হয় কাগজের পাতা থেকে বুঝি এখুনি উঠে আসবে। এ বয়সে আমাদেরই বুক কাঁপে।

সাহসভরে হাসি হাসি মুখ করে বলেছি, তাহলে বলুন ভালো লাগে আপনার, নইলে বুক কাঁপবে কেন?

ঐ জন্যেই তো বলছি নিজের অভিজ্ঞতা না থাকলে কেউ ও রকম লিখতে পারে!

ঠাট্টা নয়, আমার ধারণা উনি সত্যি আমাকে কখনো বোধ হয় খুব সচ্চরিত্র বলে ভাবতেন না। তবু আমি ভালোবাসতাম এই মহিলাটিকে। এক সময় আমরা প্রতিবেশী ছিলাম, বয়সে অনেকটা বড়ো হওয়া সত্ত্বেও অদ্ভুত একটা বন্ধুতার সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলাম। অল্প বয়সের বিধবা, কিছুটা যে পিউরিটান হবেনই এ তো ধরাধার্য, কিন্তু তার বাইরে—সঙ্গটা অতি লোভনীয় ছিলো। অনেক বই পড়তেন, রসিকতা করতেন, নিজের দুঃখ-বেদনা নিয়ে কখনো অন্যকে এতোটুকু বিব্রত করতেন না। থাকতেন ভায়েদের সংসারে, একমাত্র মোছামোছা পাড়ের শাড়ি পরা ছাড়া আর অন্য সব বিষয়েই বৈধব্যে নিষ্ঠাবতী ছিলেন। দেখতে সাধারণ হলেও শ্যামলা রংয়ের উপরে সুন্দর একটা সহজাত লালিত্য ছিলো।

পাড়া বদলে আসার পরও আসতেন তিনি, এবং যখনি আসতেন তখনি বুঝতাম কপালে আছে কিছু। কেননা লক্ষ্য করে দেখেছি, যতোবারই এসেছেন, কোনো লেখা পড়ে উত্তেজিত হয়েই এসেছেন। এসেই তীরন্দাজ হয়ে শেলবিদ্ধ করেছেন। আমি রাগ করিনি, ওঁর পছন্দমতো বেশি দুধ চিনি দিয়ে চা করে উত্তেজনা প্রশমিত করেছি। তারপর লেখার প্রসঙ্গ চুকে গেলেই অন্য মানুষ।

সেদিনও চা মিষ্টি দিয়ে মুখ মিষ্টি করতে তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম। দশ বছর বাদে হলেও ভয় পেলুম। প্রবল ঢেউটা সামলাবার জন্য অপেক্ষা করছিলুম। বললেন, বিলিতি স্ত্রী-পুরুষ নিয়ে তোমার আরো অনেক গল্প আমি পড়েছি, কিন্তু এদের একেবারে চরমে নিয়ে পৌঁছে দিলে? শেষে একজন ষাট বছরের মহিলা একজন পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধকে বিবাহ করলো?

কান চুলকিয়ে বললুম, মানে, ঐ আর কী, এই বয়সে বিবাহের মানে তো—

একজন সঙ্গী, এই তো?

ঠিক তাই।

আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থেকে বললেন, তোমরা কদ্দিন বিদেশে ছিলে!

বললুম, তা মন্দ কী। বছর তিন-চার তো হবেই।

অনেক সাহেব-মেমদের সঙ্গেই নিশ্চয় বন্ধুতা হয়েছে?

তা তো হয়েইছে।

এ-রকম দেখেছ বুঝি ?

দেখেছি।

তা হলে আমার বয়সী মহিলাও সেখানে বিয়ে করে ?

আপনার বয়সী একজন বন্ধুকে নিয়েই আমার ঐ গল্প।

বলেই ভয়ে-ভয়ে তাকালাম।

ভদ্রমহিলা হাসলেন, এখন আর কী করে বলি এটাও তোমার জীবনের গল্প। তোমার তো সে বয়েসে আসতে ঢের দেরি।

এই সময়ে আমার গৃহসেবিকা চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকলো। আমি নিচু হয়ে চা ঢালতে লাগলাম। তিনি বললেন, ভাখো, আমি কিন্তু তোমার একজন ভক্ত পাঠিকা।

অ্যা। হাত থেকে চা প্রায় ছলকে পড়েছিলো।

তোমাকে আমার একটা গল্প বলতে ইচ্ছে করছে।

বলুন না।

গল্পটা ব্যক্তিগত। শেষ বয়সের একটা স্বীকৃতিমাত্র। বিরক্ত লাগলে বোলো, থামিয়ে দেব।

আমি উৎসুক হলাম।

এক চুমুক চা খেলেন, থেমে থেকে - বললেন, জানো তো সারাটা জীবন কীভাবে কাটালাম। স্বামী যখন মারা যান, আমার বয়েস মাত্র তেইশ। তার মধ্যেই তিন সন্তানের জননী। ম্যাট্রিক পাশ করে বিয়ে হয়েছিলো, তারপর তো সব শিকেয় উঠেছে। স্বামী টাকাকড়ি কিছুই রেখে যেতে পারেননি, একটা লাইফ ইনসিওর করবো করবো ভাবছিলেন, ভগবান তার আগেই তুলে নিলেন। কাজেই শ্বশুর ভাসুর তৎক্ষণাৎ অলক্ষ্মী বলে বাপের বাড়ি ঠেলে দিলেন, আমিও বাপহীন বাপের বাড়িতে গিয়ে দুই দাদার গলগ্রহ হয়ে বসলাম। বলাই বাহুল্য, কেউ আমাকে আদর করে জায়গা দেয়নি, নিতান্ত ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারেনি বলেই থাকতে দিয়েছে। খাওয়া বিষয়েও ঠিক তাই। আমার আর কী ! আমি তো একটা বিধবা মানুষ, মায়ের ভাতের সঙ্গে দুটি ভাত আর কিছু সেদ্ধ, তার উপরে উপোস-কাপাস তো লেগেই আছে, কিন্তু মুশকিল হতো বাচ্চাদের নিয়ে। তারা তো আর আমার মতো খিদে হজম করে থাকতে পারতো না ? কাঁদতো। ছোটটাকে বুকের দুধেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করাতে চেষ্টা করতাম, বোঁটা টেনে ছিঁড়ে ফেলেও এতোটা খাদ্য সে পেতো না যাতে তার ঐ

ছোট্ট পেটটুকুও ভরানো যায়।

আমি কারো দোষ দিচ্ছি না, সত্যি তো আমার পরিবার নেহাৎ ছোটো নয়? তিনটে বাচ্চা, একটা মা, চারটে পেট, ওঁরাই বা পারবেন কেন? সেজন্য আমি দিনরাত খাটতাম, ভাবতাম কাজের লোকটিকে তুলে দিলে সেটুকু তো ওদের সাশ্রয় হবে? তার মাইনেটা তো বাঁচবে? আর সে একা যা খেতো, তাতে আমাদের চারজনের পেট ভরে যাবে। আমার বড়ো ছেলেটা তখন পাঁচে পা দিয়েছে, মেয়েটা তিন, আর ছোট ছেলে মাস দশেকের।

কিন্তু তাতেও খুব সুরাহা হলো না, আমি কাউকেই খুশি করতে পারলাম না। অতিষ্ঠ হয়ে শেষে কাজের চেষ্টায় বেরুলাম। আমার মতো একজন যুবতী মেয়ের বেরুনো নিয়েও আপত্তি উঠেছিলো, সেটা আমি মানিনি, কেননা মানবার কোনো উপায়ই ছিলো না। ইস্কুলে ইস্কুলেই ঘুরতাম, আমাদের সময়ে ভদ্র মেয়েদের ঐ একটা পেশাই মাত্র ছিলো। আমি সেখানে একটা আয়ার কাজের জন্যও চেষ্টা করেছিলাম, হয়নি। একদিন দৈবাৎ একজন লাইফ ইনসিওরেন্সের ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এই ভদ্রলোকই আমার স্বামীকে ইনসিওর করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

আমার দুঃখ দৈন্য দেখে, সব শুনে উনি আমাকে ওঁদের কোম্পানিতে এজেণ্ট হবার পরামর্শ দিলেন। সেই এজেন্সি নিয়ে পরিচিত, অর্ধ-পরিচিত, অপরিচিত, আত্মীয়-কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব, কোনো দরজাতেই ধরনা দিতে বাকি রাখিনি। সে যে কী কষ্ট, কী অপমান, আমি কেমন করে বোঝাবো! শেষে আমাকে দেখলে লোক আঁতকে উঠেছে। আমার গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছে করতো, কিন্তু ঐ তিনটি পেটের শত্রুই তো ছিলো আমার আসল দড়ি, আমি আর পালাবো কোথায়?

এই করে করেই দু-চার বছরে আয় হতে লাগলো কিছু। অন্তত আমাদের খোরাকিটা আমি ভালোভাবেই আমার বউদিদের হাতে তুলে দিতে পারতাম। কিন্তু তাতেও তাঁরা, সন্তুষ্ট ছিলেন না। বলতেন, জাতও গেছে পেটও ভরে না এমন কাজ করে লাভটা কী? দুঃখের সঙ্গী এক বৃদ্ধা মা, কিন্তু তাঁর আর কতোটুকু ক্ষমতা? তিনিও তো পরাধীন।

এই পাথারে ভাসতে ভাসতেই হঠাৎ একজন মানুষকে আমি একদিন ভালোবেসে ফেললাম।

আপনি ভালোবেসেছিলেন! আমি প্রায় চমকে উঠলাম এ কথা শুনে।

প্রায় ষাট বছর বয়সের মহিলাটি তাঁর চেয়ে অনেক কনিষ্ঠ আমার দিকে অপরাধী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, খুব কি অন্যায়? খুব কি অসম্ভব? তুমি তো এই, আমাদের মতো দুঃখিনীদের জীবনকেই আলোতে নিয়ে যাও। ভালোবাসার সততা নিয়েই তো তোমার কারবার, বলো, সে কি ভয়ানক একটা অবাস্তব ঘটনা আমার পক্ষে? জগৎ-সংসার থেকে আমি কতোটুকু পেয়েছি? বিয়ে হয়েছিলো ষোলো বছর বয়সে, তার পরের সাত বছরে এক দমকে তিন সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে, কোন সুখের অমরাবতীতে আমি বাস করছিলুম?

তাইতো।

মানুষটির সঙ্গে আমার খুব অদ্ভুতভাবে চেনা হয়েছিলো। বোঝোই তো যে কাজ আমি নিয়েছি তাতে কেমন তাকে থাকতে হয়? সারাদিন কেবল কাকে ধরি আর কাকে ধরি এই চিন্তা। আসন না পেয়ে একদিন ট্রামে এই ছেলেটি লেডিস সীটে আমার পাশে বসেছিলো, চেহারাটি বেশ শিক্ষিত শিক্ষিত, চোখে মুখে বুদ্ধির ছাপ। একটু তাকিয়ে কেমন মনে হলো এর সঙ্গে একটা ছুতো ধরে পরিচয় করলে হয়। বয়েস অল্প আছে—ধরাপড়া করলে একটা ইনসিওর করলেও করতে পারে। কিন্তু কীভাবে আলাপটা শুরু করা যায় ভেবে পাই না। হঠাৎ গুরুগম্ভীর আওয়াজে সে নিজেই বললো, আমার জন্য আপনার বসতে অসুবিধে হচ্ছে না তো?

আমি বিগলিত হয়ে বললাম, কী আশ্চর্য! অসুবিধে কেন হবে?

সে বললো, অন্যমনস্কভাবে আপনার অনুমতি না নিয়েই বসে পড়েছিলুম।

বলতে যাচ্ছিলুম, তাতে কী হয়েছে? তার আগেই সে আমার দিকে ফিরে তাকালো, আমিও তাকালুম, সঙ্গে সঙ্গে বুকটা কেঁপে উঠলো আর মনে হলো আমার একটা সর্বনাশ হয়ে গেল।

সর্বনাশ কেন?

সর্বনাশ নয়? আমি বিধবা না? আমার তিনটে বাচ্চা আছে না? পাপ-পুণ্য বলে একটা কথা আছে না?

পাপ-পুণ্য!

নিশ্চয়ই। আর তো কোনোদিন এরকম হয়নি? কতো তো ঘুরে ঘুরে কাজ করি। তাড়াতাড়ি রাস্তা দেখতে লাগলাম। বুকটা তখনো ধ্বকধ্বক করছিলো। সেই আমার জীবনে প্রথম প্রেম অথবা প্রথম পাপ।

আমি হেসে বললাম, পাপ তো নয়ই, প্রথম প্রেমও নয়, তার আগে নিশ্চয়ই স্বামীর সঙ্গে প্রেম ছিলো ?

তা ছিলো। তিনিও হাসলেন, তবে সে ছিলো জুটিয়ে দেয়া প্রেম। অবশ্য তাও কম খাঁটি ছিলো না। আমার স্বামীকে আমার খুব ভালো লেগেছিলো, কিন্তু তার মধ্যে তো কোনো বাধা-বিরোধ ছিলো না। আমার ধর্মই ছিলো তাঁকে ভালোবাসা। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের মিলন একটা বাধ্যতামূলক ঘটনা মাত্র। ঐ বয়সে স্ত্রী-পুরুষ মিলিত হলে শরীরে তো আগুন ধরবেই ! অন্তত কয়েকদিন পর্যন্ত সে-আগুনের তাপ ঊর্ধ্বমুখী থাকবেই। সেখানে মনের চেয়ে দেহের প্রশ্নই বেশি। আর তারপরে দুটো মানুষের স্বার্থসংঘাত, সন্তান, একত্র বসবাস সবটা মিলিয়ে এমন একটা আলাদা জগৎ তৈরি হয়ে যায় যে, সেটা প্রায় অবিচ্ছেদ্য হয়ে ওঠে। বলো ঠিক কিনা ?

আমি মনে মনে অতীতের সেই শুচিবায়ুগ্রস্তা বিধবাটির সঙ্গে এই মহিলাটিকে মেলাবার চেষ্টা করতে করতে বলি, একদিক থেকে সে তো ঠিকই।

তিনি চশমার কাচ মুছলেন। চা শেষ করলেন। বসবার ভঙ্গি বদলে নিয়ে বললেন, আসলে ভবিতব্য কেউ ঠেকাতে পারে না। মানুষের সাধ্য আর ভগবানের সাধ্য তো এক নয় ? তিনি যা করেন তা হতেই হয়। সেদিন ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ হবারই দিন ছিলো, নইলে আমি যেখানে নামলাম, সেও কেন সেখানে নামলো ?

আমি বললাম, ওটা বোধহয় উনি ইচ্ছে করেই নামলেন।

না। মোটেও না। মহিলা মাথা ঝাঁকালেন, সে আমার আগেই নেমেছিলো, ফিরেও তাকায়নি। কিন্তু খুব আশ্চর্য যে, সে যে গলিতে ঢুকলো, আমারও সেই গলিতেই কাজ ছিলো। একটু দূরে গিয়ে একটা একতলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে এই প্রথম সে আমাকে লক্ষ্য করলো। আমার রকমসকম দেখে জিজ্ঞেস করলো, কোনো বাড়ি খুঁজছেন নাকি ?

অপ্রস্তুতভাবে বললাম, হ্যাঁ।

এখানকার নম্বর বড় গোলমেলে। কার বাড়ি বলুন তো ?

চোদ্দোর-এক-মহিমারঞ্জন সেন।

ও, মহিমবাবু। কিন্তু ওঁরা তো কেউ নেই এখানে, ওঁর মৃত্যুর পরে ওঁর পরিবার তাঁর পিত্রালয়ে চলে গেছেন।

মহিমবাবু মারা গেছেন ? - আমি একেবারে থ। দিন কয়েক আগে এই

নাম-ঠিকানা আমার এক আত্মীয়া আমাকে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, মস্ত চাকরি করেন, নিজের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলে যদি তেমন ধরে পড়তে পারো, বেশ মোটারকম ইনসিওর করবেন দেখো। ছোটো ছেলেটার অসুখ ছিলো, আসতে পারিনি, এর মধ্যেই মরে গেল লোকটা! আমি একেবারে শোকের পাথারে ভেসে গেলাম।

ছেলেটি বললো, আপনার আত্মীয় ছিলেন?

বললাম, না।

বন্ধু?

তখন বললাম, দেখুন, আমি ইনসিওরেন্সের এজেন্সি করি, উনি করবেন এরকম একটা খবর পেয়ে এসেছিলাম, এই মৃত্যু আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

হার্টস্ট্রোকে মারা গেছেন। ছেলেটি বেশ ভারভারিক্কি। কোন্ কোম্পানিতে আছেন আপনি?

জেনারেল।

ও, জেনারেল, আমার এক আত্মীয় আছেন সেখানে, আমার কাছে এসেছিলেন একদিন।

আপনি করবেন? আমি আশান্বিত চোখে তাকালাম মুখের দিকে। আবার সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। আবার আমি চোখ সরিয়ে নিলাম। আবার বুকটা কাঁপলো।

ছেলেটি তার স্বভাবসুলভ গম্ভীর ভঙ্গিতে জোর দিয়ে বলল, করবো।

আমি ঢোঁক গিলে ফেললাম, তা হলে কি আমি একদিন আসবো? আপনার ঠিকানাটা—

এই তো আমার বাড়ি, আপনি ইচ্ছে করলে এখনো আসতে পারেন।

দেখলাম তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েই কথা বলছিলাম আমরা। চট করে একজন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে অপরিচিত ঘরে ঢুকতে প্রথমে আমার দ্বিধা হয়েছিলো। অল্প বয়সের বিধবা, কতো পুরুষের কতো জঘন্য লোভের হাত থেকে রক্ষা পেতে পেতে এই বয়সে এসে পৌঁচেছি। কাজেই ভয়টা অমূলক ছিলো না। সে কড়া নাড়লো না, তালা খুললো, সহজভাবে বললো, আসুন।

আমি সম্মোহিতভাবে তাকে অনুসরণ করলাম। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি ঘর, ঘরটি বড়ো, এক কোণে বসবার ব্যবস্থা, অন্য কোণে একটি খাটে ঢাকা বিছানা। মাথার কাছে লেখাপড়ার টেবিল।

বসুন, বলে ভিতরে চলে গেল। ফিরে এলো তক্ষুনি—বললো, চা খান একটু।

আমি সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম, না, না।

সে বললো, ব্যস্ত হবেন না, চা-টা আমিই খাবো, আপনি সঙ্গ দিলে খুশি হবো, এই পর্যন্ত। সিগারেট খেতে পারি?

নিশ্চয়ই।

এখন বলুন, আপনার নিয়মকানুন, আমি কিন্তু খুব বেশি করতে পারবো না।

কতো? খুশিতে আমি থর থর করছিলাম।

ধরুন হাজার দশেক। পনেরো পর্যন্তও হতে পারে।

আমি চুনোপুঁটি, সারাদিন ঘুরে ঘুরে সাধ্যসাধনা করে একটা লোককে পাঁচ হাজারে বাগাতেই নাকের জলে চোখের জলে এক হয়ে ঘরে ফিরি, আর লোকটা এক ডাকে পনেরোও হতে পারে বলে দিল! থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম। তারপরেই সামলে নিয়ে নিস্পৃহ মুখে দালালির মুখস্থ বিদ্যেটা ঝেড়ে দিলাম।

চুপ করে শুনে নিয়ে বলল, কবে আসবেন বলুন, আমি প্রস্তুত থাকবো।

আমি ভাবলাম শুভস্য শীঘ্রম্। বিচলিত গলায় বললাম, কাল আসবো?

কখন?

যখন বাড়ি থাকবেন।

তবে এই সময়েই আসুন।

গেলাম। শুধু সেদিনই নয় সমস্ত কাজটা নিষ্পত্তি করতে বেশ কয়েকদিনই আসা-যাওয়া করতে হলো। আর সেই আসা-যাওয়াই কাল হলো আমার। কখন যেন বুঝে ফেললাম আর উপায় নেই দেখা না করে।

আমি বিধবা, বয়স্ক, তিন ছেলেমেয়ের মা সবই বলেছিলাম তাকে, তাতে তার কিছুই উনিশ-বিশ হয়নি। আর সত্যি বলতে আমি তো দেখতেও ভালো না? এ-কথাও বলেছিলাম। শুনে তাকিয়ে থেকে নিঃশব্দে অনেকক্ষণ হাসলো, তারপর আস্তে আস্তে বললো, তাই নাকি?

আমি বললাম, ঠাট্টার কথা নয়।

সে বললো, আমিই কি ঠাট্টা করেছি? আমি শুধু বলছিলাম যে, আমার যা পাবার তা আমি পেয়েছি, এখন তোমার বিবেচনা।

বিবেচনা মানে কী জানো? বিবাহ। আসলে সেই সময়ে বড়ো অশান্তিতে

ছিলাম। বাড়িতে সব সময়ে ঝগড়াঝাঁটি চলছিলো। ভাইয়ে-ভাইয়ে বনছিলো না, বউয়ে বউয়ে নিত্য কলহ। আর আমি তো একটা জগদ্দল পাথর সকলের কাছে। যদিও সেই সময়ে আমার উপার্জন বেশ ভালোর দিকে যাচ্ছিলো, আমি ভালো টাকাই দিচ্ছিলাম, তবু আমার ছেলেমেয়েকে ওরা দেখতে পারতো না, আপদ-বালাই ছাড়া ভাবতো না, দুঃখের কথা কী বলবো, নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া সব কিছুতেই এতো তফাৎ করতো যে, প্রায়ই মনে হতো বস্তিতে গিয়ে থাকি, তবু এদের সঙ্গে নয়। আর মাকে তো একটা মনুষ্য হিসেবেই জ্ঞান করতো না।

এই সব শুনেছিলো বলেই বিয়ের প্রস্তাবটা দিয়েছিলো। বলেছিলো, ঐ নোংরার মধ্যে থেকো না, কষ্টের মধ্যে থেকো না, আমার কাছে, তোমার নিজের সংসারে চলে এসো, ছেলেমেয়ের সব দায়দায়িত্ব আমার। বলো তো প্রতিজ্ঞা করতে পারি যে, তাদের নিয়ে কখনোই তোমার কাছে আমি কোনো বেদনার কারণ হবো না। বরং বিনা চিন্তায় বিনা খরচে তিনটি বড়ো বড়ো সন্তানের পিতা হবো ভাবতে আমার ভালোই লাগছে। আমি ছেলেপুলে ভালোবাসি।

ততোদিনে আমাদের বয়েস আরো দু' বছর এগিয়ে এসেছে। আমি বললাম, কেন তুমি এতোদিন বিয়ে করোনি? তবে তো এই বিপদ তোমার হতো না।

সিগারেটে ধোঁয়ার রিং তুলতে তুলতে বললো, যখন দেখা হয়েছিলো তেত্রিশ পূর্ণ করেছিলাম, খুব কি বেশি দেরি করেছি? তাছাড়া যাকে চাই তাকে পাবো তবে তো বিয়ে?

আমি কেঁদে ফেললাম, শেষে কি এই তোমার পাওয়া? মাথায় হাত রেখে বলল, পরিপূর্ণ পাওয়া।

একটা কলেজে পড়াতো সে, মা-বাবা ছিলো না, কিন্তু তাঁদের রেখে যাওয়া কিছু অর্থবিত্ত ছিলো। আর ছিলো একটি পঙ্গু বোন। ছোটবেলায় পোলিও হয়ে তার পা দুটি অকেজো হয়ে যায়। সারাদিন শুয়ে থাকতে হতো তাকে। এই দাদাই লেখাপড়া শিখিয়ে, গান শিখিয়ে এক ধরনের সহনীয় করে রেখেছিলো তার জীবন। যে বাড়িটিতে থাকতো, নিজেদেরই বাড়ি। পিছনের অংশটায় এক গরিব আত্মীয় প্রায় বিনাভাড়ায় ছিলো। সামনের দু'খানা ঘরের একখানাতে সে নিজে অন্যটিতে তার বোন।

এই প্রেম আমি অতি সাবধানে লুকিয়ে রেখেছিলাম। নিজেকে সব

সময়েই কঠিন শাসনে বেঁধে রেখেছিলাম, কিন্তু বিয়ের প্রস্তাবের পরে আমার মনে হলো, লাথিঝাঁটা খেয়ে পড়ে আছি কিসের আশায়? কী আমি আর পাবো এই সমাজ থেকে? ভাইয়েরাই ব' কী দেবে যার বিনিময়ে এই সম্মান আমি প্রত্যাখ্যান করবো। কিন্তু ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে বুক হিম হয়ে যায়। ততদিনে তারা তো বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে। পাঁচ বছরের ছেলে বারোতে পা দিয়েছে, তিন বছরের শিশু দশ বছরের বালিকা, ছোটটি পর্যন্ত সাত।

এরই মধ্যে কী করে যেন উড়ে উড়ে এই খবরটা পৌঁছে গেল আত্মীয়-পরিজনদের কানে। দাদা-বউদিরাও শুনলেন, মার কানেও গেল। দপ্ করে জ্বলে উঠলো আগুন, আর সেই আগুন আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিল। দুটি বালক-বালিকাই জ্বালালো সবচেয়ে বেশি। রাত্রিবেলা একা হয়ে চোখ বড়ো-বড়ো করে বললো, মা, মামীরা বলেছে তুমি নাকি আমাদের ফেলে রেখে একটা লোকের সঙ্গে কোথায় চলে যাবে? একথা শুনে আমার আপাদমস্তক থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো। বড়ো-বড়ো নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে বললাম, মামীরা বলেছে?

ছোটো ছেলেটা শুয়েছিলো, ফট করে উঠে বসলো, কচি-কচি ঘুমগলায় বললো, বড় মামী বলেছে তার নাম নাগর।

কী বলবো তোমাকে, সারারাত আমি আর ঘুমুলাম না। পরের দিন ভোর না হতে উঠেই বেরিয়ে পড়লাম, ফিরলাম একেবারে বাড়ি ঠিক করে। বাড়ি মানে টালিগঞ্জ বস্তিপাড়ায় একটা ঘর, ভাড়া পনেরো টাকা। মাকে বললাম মা, আমি আর দাদাদের সঙ্গে থাকবো না, তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে?

মা কী খুঁজছিলেন, ভুরু কুঁচকে বললেন, কেন, এখানে থাকলে বুঝি ইচ্ছে মতো জীবনযাপন করা যায় না?

মার কাছে এই জবাব আমি আশা করিনি। চুপ করে থেকে বললাম, এখানে যে কী সুখে আছি তা তো তুমি জানো। কিন্তু নিজের জীবন যে-ভাবেই কাটুক, যাদের জন্য উদয়াস্ত রোজগারের ধান্দায় আমার জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে, যাদের মানুষ করে তোলবার আশায় আমি নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছি, তাদের জন্য সরে যাওয়া দরকার।

এবার মা যা খুঁজছিলেন তা পেয়েছেন। একটা পঞ্জিকা।

বৃদ্ধ চোখে মনোযোগ সহকারে সেই পঞ্জিকার পৃষ্ঠায় একাদশীর তারিখটা দেখতে-দেখতে, নিষ্ঠুর হয়ে বললেন, তাদের জন্যে যোরো, না কিসের জন্য

ঘোরো কে জানে। মেয়েমানুষের চরিত্রই হলো আসল, সেই চরিত্রই যার খোয়া গেছে তার আর ছেলেপুলের কথা ভাববার দরকার কী?

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের ঘরে চলে এলাম। গুছিয়ে নিলাম জিনিসপত্র, খেলাম না, স্নান করলাম না, চলে এলাম ট্যাক্সি ডেকে।

মা ভাইয়েদের সঙ্গেও ওই শেষ, রমেনের সঙ্গেও ওই শেষ।

কার সঙ্গে? আমি কুঁচকোনো চোখে তাকালাম।

তিনি শান্ত গলায় বললেন, ওঁর নাম রমেন।

সে আমি বুঝেছি, কিন্তু ওর সঙ্গেও শেষ কেন?

তা ছাড়া উপায় কী বলো? আমার ছেলেমেয়েদের জীবন নিশ্চয়ই আমার জীবনের চেয়ে অনেক বেশিই মূল্যবান। তাদের মনে এক ফোঁটা কালিও আমি ঢালতে পারি না।

কিন্তু উনি তো ওদের সব ভারই গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।

সে চাইতে পারে, কিন্তু ওরা যে ওকে কী ভাবে গ্রহণ করবে তা তো আমি জানি না! তাই অনন্যচিত্ত হয়ে ওদের মানুষ করার চেষ্টায় নিজেকে উৎসর্গ করে কঠিন শৃঙ্খলে বেঁধে ফেললাম। আমার ঠিকানা আর কে জানে? কে আমাকে খুঁজে পাবে এত বড়ো একটা শহরে?

পরিজনদের সঙ্গে এই বিদ্রোহটা করতে পেরে আমি সুখীই হয়েছিলাম। আমার ছেলেমেয়েরাও সুখী হয়েছিল। একটা নিরাপদ স্বাধীন জীবনের স্বাদ পেয়ে ভালো স্কুলে ভর্তি হয়ে, ভালো মাস্টারের শিক্ষা পেয়ে ওরা বেশ যোগ্য হয়ে উঠতে লাগলো। লেখাপড়ায় কেউ খারাপ ছিল না, সময় মতো সবাই ভালোভাবে পাশটাশ করে চাকরিতেও ঢুকলো, বিয়েও করলো, আর কাজ ফুরিয়ে আমিও একা হয়ে গেলাম। এখন শুধু ঘাটের আশায় বসে থাকা!

কথা শেষ করে আমার দিকে তাকালেন ভদ্রমহিলা। আমি বললাম, মা ভায়েদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন, সে তো উচিত কাজই করেছিলেন, ছেলে-মেয়েদের সুশিক্ষা ছাড়া আপনার নিজেরও একটা আত্মসম্মানের দায় ছিলো। কিন্তু ওই ভদ্রলোককে কেন আপনি কষ্ট দিলেন?

মহিলা ঠোঁটে জিভ বুলোলেন, ক্লেশে নিয়ে বললেন, তাকে কতোটা কষ্ট দিয়েছিলাম তাতো জানি না, নিজের হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলতে আমার যে খুব লেগেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ওই তো একজন মাত্রই ছিল যার কাছে আমি চোর-জোচ্চোরের মতো ছাপ মারা বিধবা নামের একটা দাগী

আসামী ছিলাম না। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, সে সবকিছু উড়িয়ে দিয়ে বলতো, যারা তোমাকে তোমার চরিত্র নিয়ে নির্যাতন করে তাদের তুমি বুঝিয়ে দিয়ো চরিত্রের অর্থ কেবলমাত্র ঐ একটি কিছুতেই সীমাবদ্ধ নয় এবং ভালোবাসা জিনিসটা কোনো অর্থেই পাপাচরণ হতে পারে না। তুমি তো কাউকে ঠকাচ্ছো না, বঞ্চিত করছ না, এর মধ্যে হিংসা স্বার্থপরতা কুশ্রীতা মিথ্যা কিছুই নেই। শুধু নিজের দুঃখময় জীবনে একটা ছেদ টানার চেষ্টা, অপমান অসম্মানের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া। তোমার স্বামী মারা গেছেন সেটা তো তোমার অপরাধ নয়? তোমাকে থান পরিয়ে মাথা মুড়িয়ে খেতে না দিয়ে কী লাভ হবে? উনি কি বেঁচে উঠবেন তাতে। না কি তুমি তাঁকে খুন করেছ যে এই শাস্তিবিধান? তাছাড়া যারা তোমাকে একটা বোঝা ছাড়া আর-কিছু ভাবেন না তাদের উপর নিজেকে চাপিয়েই বা রেখেছ কেন? আলাদা হয়ে যাও না, বাচ্চাদের শিক্ষার দায়িত্বও তো একটা আছে তোমার? তারা কী শিক্ষা পাচ্ছে সেখানে? কী অন্ধকারে বড়ো হচ্ছে, ভেবেছ কখনো? একটু যুক্তিবুদ্ধির দাস হও, নিজেকে মানুষ বলে ভাবতে শেখো, মেয়েদের জলের তলায় ঠেসে ধরাই যে সমাজের একমাত্র কর্তব্য তার সঙ্গে লড়াই করতে শেখো। আমি তো আছি, ভয় কী তোমার?

তবু ভয়। জন্মেছিলাম একটা গোঁড়া পরিবারে, আমার মেরুদণ্ড ছিল না, এতো কথা শুনেও আমি অবিশ্রান্ত আমার অপরাধবোধে এমন সচেতন হয়ে থাকতাম যে শেষ পর্যন্ত কেমন শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে উঠলাম। আজ আমি সত্য বলছি, তোমার লেখা পড়ে আমার ভিতরকার আসল সত্তাটা এমনভাবে জাগ্রত হয়ে উঠতে চাইতো যে আমার ক্রোধের সীমা থাকত না। রমেনের সঙ্গে অনেক সময়েই আমার যে ধরনের কথাবার্তা হতো সেই সব কথা যেন তুমি ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নিয়ে তুলে ধরতে। আমি থাকতে পারতাম না, তোমাকে ভালবাসি বলেই ছুটে এসে ওরকম ভাবে বকে যেতাম। কিন্তু এটাও খুব সত্য কথা যে সেই লেখা পড়ার জন্য আবার আমি উন্মুখ আগ্রহে অপেক্ষা করতাম।

কিন্তু যাদের জন্য নিজের জীবনের সবকিছু অপচয় করে চুল পাকালাম আজ সেই সন্তানরা আমার কোথায়? আমার কথা তারা কতটুকু ভাবে? প্রয়োজন ফুরানো মাত্রই জীর্ণ বস্ত্রের মতো মাকে ত্যাগ করে কেমন যার যার সংসার নিয়ে সে সে উধাও। আমার কি মনে হয় জানো, ওই যে ছেলে-

বেলায় তার মামীরা আমার বিরুদ্ধে তাদের মনে এক অবিশ্বাসের বীজ বুনে দিয়েছিল, সেই কণ্টক প্রত্যক্ষে না হোক, পরোক্ষে বিঁধেই ছিল শেষ পর্যন্ত। নইলে মানুষ হওয়া মাত্রই এমন পাখির মতো উড়ে গেল কেন? তারা তো দেখেছে কী ভাবে আমি তাদের খাইয়েছি, পরিয়েছি, সুখে রাখার চেষ্টায় আপ্রাণ হয়েছি? কিছু তো পিছুটান থাকা স্বাভাবিক ছিল? না কি এই-ই জগৎ সংসারের নিয়ম? এ ভাবেই চলতে থাকে চাকা। হয়তো তাই। কিন্তু আমি তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে আমার জন্য অনেক বিশ্রাম খুঁজেছিলুম, পাইনি।

সারাজীবন কাজ করেছি, খেটে খুটে অনেক উঁচুতেই উঠেছিলাম শেষ পর্যন্ত। তা বলে আমি তো কিছু ভোগ করিনি? সেই তো এক বেলা কোনো রকমে সেদ্ধ পোড়া দিয়ে দুটি আতপ চালের তণ্ডুল ভক্ষণ আর বারো মাসে তেরো পার্বণের তেত্রিশ রকমের উপোস, এই তো জীবন। শেষ বয়সে সব খুইয়ে আবার একটা বাড়িও করে বসলাম। সেও তো ওদের কথা ভেবেই? এখন যখ হয়ে নিজেই আগলে বসে আছি। উঠে দাঁড়ালেন, সজল চোখে হেসে বললেন, তোমাকে খুব জ্বালালাম আজেবাজে বকে। জানি দিদিকে তুমি ভালোবাসো, তাই বিরক্ত হবে না। চলি কেমন?

আমি সাগ্রহে বললাম, আর একটু বসুন। আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছিল, সেই রমেনের সঙ্গে আর কখনো তাঁর দেখা হয়েছিল কিনা। ইতস্তত করে বললামও সে কথা। তিনি যেতে যেতে দাঁড়ালেন, মাথা নেড়ে বললেন, মাস কয়েক আগে একদিন দেখা হয়ে গেল পথে। তেত্রিশ বছরের যুবক এখন তেষট্টি বছর পূর্ণ করেছে, কিন্তু চোখ মুখ তেমনি সতেজ, তেমনি সুন্দর। স্বভাবও তেমনি বেপরোয়া। তাকিয়েই বললো, লতিকা না? আমিও অবশ্য পলকমাত্রেই চিনতে পেরেছিলাম। ভোলবার মতো লোক তো সে ছিল না?

তারপর?

তারপর আর কী? গতানুগতিক কুশল প্রশ্নের বিনিময়। শুনলাম, আমাকে অনেক খুঁজেছিল, আমার ভ্রাতাদের কাছে গিয়ে ঘাড় ধাক্কা টাকাও হয়তো খেয়ে থাকবে, তারপর উত্তরবঙ্গে না কোথায় অন্য একটা চাকরি জোগাড় করে চলে যায়, শেষে অনেক ঘাটের জল খেয়ে বৃদ্ধ বয়সে আবার ফিরে এসেছে। কপালে আর বিয়ে করা ঘটেনি, বোনটি মারা গেছে বছর দুয়েক

আগে, এখন আমার মতোই সীমাহীন সঙ্গীহীন অন্ধকার অবসর।

তারপর?

তারপর? আমার মাথার চুল নেড়ে দিয়ে হাসলেন, তারপর আমার কথাটি ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়োলো। সোনামণি তোমার 'সঙ্গসুধা' গল্প গল্পেই ঘটে। জীবনে নয়। ষাট বছরের মহিলা কখনোই আর পঁয়ষট্টি বছরের মানুষটাকে বিয়ে করে সুখের ঘর বাঁধতে পারে না। সন্তান পরিত্যক্ত হয়ে একা ঘরে শক্ত হয়ে মরে পড়ে থাকলেও না। জানো না, মেয়েরা ঘাস মাটি? পদদলিত হয়ে বেঁচে থাকাই তাদের ধর্ম।

———



নার্সিসাস

বাণী রায়

তাহাকে আমার ভালো লাগিয়াছিল। ভালবাসা কাহাকে বলে জানি না, কাজেই এ ভালো-লাগা ভালবাসা কিনা বলিতে পারিলাম না।

আমার জীবন-পথে বহু পুরুষ আসিয়াছে। তাহারা সকলেই আমাকে ভালবাসিয়াছিল, আমি কাহাকেও বাসি নাই। এই আমার পরিচয়।

তবু নিদ্রাবিহীন রাত্রে আকুল বাতাসের ক্রন্দনে তাহাকে মনে পড়ে। বর্ষামুখর অপরাহ্নে তাহার কথা আমাকে বিমনা করে। উজ্জ্বল বসন্ত দিনে অকারণে তাহার হাসি কানে ভাসিয়া আসে। সহস্র যোজন দূর পথ হইতে সে আমাকে ডাকে—"নার্সিসাস্!"

এ ডাক ভালবাসার নহে, ঘৃণার। নারীর প্রতি পুরুষের যত ঘৃণা থাকিতে পারে, শেষদিনে সে আমাকে তাহাই দিয়াছে। তারপর—আমাদের মধ্যে আসিয়াছে ব্যবধান। সে ব্যবধান সাগর সমান। হয়তো কখনো সে ফিরিবে না, কারণ সে আমাকে ঘৃণা করে। আর আমিও ডাকিব না, আমি তাহাকে তো ভালবাসি না। কিন্তু সে এত দূরে যাইয়া আমাকে এত বিমনা করে কেন?

সহশিক্ষার কলেজে সে ছিল আমার সহপাঠী। দীর্ঘ দেহ তাহার উন্মুক্ত তরবারির মতো। বিশাল নেত্রে তাহার সহাস্য কোমলতা। আর সে ললাট

প্রতিভার লীলাভূমি! রবীন্দ্রনাথের "সন্ন্যাসী উপগুপ্তের" সহিত তাহার মিল খুঁজিয়া পাইয়াছিলাম।

"সৌম্য সহাস তরুণ বয়ান, করুণা কিরণে বিকচ নয়ান,
শুভ্র ললাটে ইন্দু সমান ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি।"

প্রশান্ত গুহ ছিল নারীচিত্তদহনকারী অগ্নি। তাহার নির্লিপ্ত সৌন্দর্য দূর হইতে আকর্ষণ করিত, তাহার প্রতিভা মুগ্ধ করিত। সে ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র, সে ছিল কবি এবং শিল্পী।

আমি কলেজ যাইতে ভালবাসিতাম না। পড়াশুনা কখনও আমার ভালো লাগে নাই। মেয়েদের সাহচর্যও তেমন লোভনীয় নয়। বেশি পড়াশোনা করিলে অনেক বাঙালী মেয়ের যেমন অনুর্বর মরুভূমির মতো মূর্তি হয়, আমার অধিকাংশ সহপাঠিনীর ছিল তাহাই। ছেলেদের দিকে তাকাইবার আমার অবসর ছিল না বাড়িতে স্তাবকদলের প্রাচুর্যে। এই কারণে সহপাঠিগণ আমার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করিয়া বিরক্তিভাজন হইয়াছিল।

দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির পর কলেজে যাইয়া দেখি সহপাঠিনীরা তুমুল আন্দোলন করিতেছে। তাহারা প্রশান্ত গুহের কাছে ইংরেজি নোট চাহিয়াছিল। প্রশান্ত ধীরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছে পড়িবার ইচ্ছা থাকিলে বই পড়াই যথেষ্ট। মণিকার আক্রোশ দেখিলাম বেশি। তাহার ভ্রাতা পরিচালিত একখানা মাসিকপত্রে লেখা দিবার অনুরোধে সে দীর্ঘ আট পৃষ্ঠা চিঠি দিয়াছিল; প্রশান্ত উত্তর দেয় নাই।

শুনিতে শুনিতে আমার অধরে কৌতুকহাস্য দেখা দিল। একজন সামান্য পুরুষ! তাহার জন্য এতগুলি নারীর ব্যাকুলতা! যাহারা রমণীর পদপ্রান্তে ভিখারী হইয়া প্রেম ভিক্ষা করে তাহাদের একজনের এত স্পর্ধা?

সহসা মণিকা আমাকে অনুরোধ করিল, "আচ্ছা ইরা, ছেলেরা তোর জন্যে পাগল। তুই তো ফিরেও দেখিস না। দে না প্রশান্ত গুহকে একটা শিক্ষা। তাহলে বুঝতাম তোর ক্ষমতা।"

অলসভাবে মণিকার জামার কাজটা পরীক্ষা করিতে করিতে বলিলাম, "কি শিক্ষা দিতে হবে?"

উত্তেজিত স্বরে মণিকা বলিল, "ওকে নাচাবি। ও তোর জন্যে যখন পাগল হবে তখন দূর করে তাড়িয়ে দিবি।" সকলে সমস্বরে সায় দিল।

চাহিয়া দেখি সকলে আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। চারিপাশে অনুরোধের

ব্যাকুল স্বর। মনে হইল দেখা যাক্‌ সময় কাটানোর সঙ্গে এতগুলি নারীকে প্রতিশোধের সুযোগ দেওয়া মন্দ কি? নিশ্চেষ্ট মনে ক্রুর প্রবৃত্তি এবং উদ্যম দেখা দিল। মনের আবেগ দমন করিয়া বাহিরে উদাস কণ্ঠে বলিলাম, "দেখি কি হয়।"

তারপর চলিল আমার হৃদয় জয়ের নিষ্ঠুর অভিযান। রূপ চিরদিনই প্রচুর, তাহাকে সজ্জিত করিবার নব প্রচেষ্টায় আরো লোভনীয় করিয়া তুলিলাম। পড়াশোনার আগ্রহে প্রতিদিন নিয়মিত ক্লাস করিতে আরম্ভ করিলাম। মিটিং, সাহিত্য-সভা সমস্ত কিছুতেই আমাকে দেখা যাইতে লাগিল। কিন্তু এত কিছুর প্রয়োজন ছিল না, আমার পূর্বেকার নির্লিপ্ত ঔদাস্য প্রশান্তেরও ঔদাস্যকে জয় করিয়াছিল। তাহার স্থির, প্রদীপ্ত দৃষ্টি আমার দেহ বন্দনা করিয়া ফিরিতে লাগিল। তারপর উভয় পক্ষের আগ্রহে আলাপ-পরিচয় গাঢ় হইতে লাগিল।

প্রশান্তকে আমি অধীর উন্মাদ কামনায় নিকটে টানিলাম। কটাক্ষে, হাস্যে, ভঙ্গিমায় যাহা বাকি ছিল, আমার ভালবাসাহীন বন্ধুত্বে তাহা সম্পূর্ণ হইল। নারীচিত্তবিজয়ী প্রশান্ত গুহ আমাকে ভালবাসিল। সে ভালবাসা! যৌবনের আকুল পিপাসা, বন্ধুত্বের স্নেহপ্রীতি, ভক্তের পূজাবন্দনায় প্রশান্ত আমাকে কাছে পাইতে চায়। একবার মনে হইল তাহাকে মুক্তি দিই। ভালো যাহাকে বাসি নাই, তাহাকে দগ্ধ করিব না; কিন্তু সহপাঠিনীদের কথা মনে পড়ে, মনে হয় নারীর অবমাননায় পুরুষের উপর প্রতিশোধ লইবার ভার আমার। তাহার উপর চিরদিনের উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি আমার, হাতের কাছে সুন্দর ক্রীড়নকটি ত্যাগ করিতে চাহিল না। আমার তাহাকে ভালো লাগে, তাহার প্রেম ভালো লাগে,—তাহাকে আরো চাই।

মেয়ের দল আমাকে স্তুতিগানে চঞ্চল করিয়া তুলিল। প্রশান্ত আমাকে চায়, এইবার আমার প্রত্যাখ্যান হইলেই নরমেধযজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়।

কিন্তু প্রশান্তকে আমার মতো লঘুচিত্তারও ভালো লাগিল, কমনীয় তাহার মূর্তি, মধুর তাহার ব্যবহার। জ্বলন্ত বহ্নির মতো তাহার প্রেম, উদ্দীপ্ত তাহার প্রতিভা। অন্য অসংখ্য পুরুষের মতো হতভাগ্য সে আমাকে ভালবাসিয়া ভুল করিয়াছিল। আমি পুরুষের দেহের মূল্য বুঝি, অন্তর আমার কাছে অজানা। নারীকে পুরুষ ভালবাসে তাহার যৌবনের জন্য, তাহার রূপের জন্য। যতদিন নারীর সে সম্পত্তি আছে, ততদিন পুরুষ তাহাকে কেবল ভালোই বাসিয়া

যাইবে আমার বিশ্বাস ছিল। তাই নিজের মনের দিকেও চাহিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

সন্ধ্যার ছায়া মদির তন্দ্রার মতো নামিয়া আসিয়াছে। খোলা জানালার সামনে ইলেকট্রিকের পিলসুজে সাদা কলাই-করা পরীমূর্তি হস্তে আলো লইয়া দণ্ডায়মান। আমার হাতে একখানা বই ছিল।

নিঃশব্দে কে যেন টেব্‌ল ল্যাম্পটির আলো নিবাইয়া দিল, সারা ঘরে অন্ধকারের বন্যা। ক্যালিফোর্নিয়া পপির মিষ্টি গন্ধে বুঝিলাম প্রশান্ত আসিয়াছে। আলো জ্বালাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কতক্ষণ এসেছ?"

সামনে চেয়ারে বসিয়া প্রশান্ত বলিল, "অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে পাঠরতা মূর্তি দেখছিলাম। এত মন দিয়ে কী পড়া হচ্ছে?"

"ওঃ, তোমাদের Elliot এর কাব্য সঞ্চয় ও 'waste land', কি এত যে ভালো দেখে' তুমি! আমার তো এর কবিতা বিশ্রী লাগে।"

প্রশান্তর পদ্মপলাশ নেত্রে আগ্রহ ও কৌতুক জ্বলিয়া উঠিল। তাহার প্রিয় কবিকে অবজ্ঞা করিবার জন্য সে আমারও সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইল, "ভালো লাগে না কেন?"

জানি প্রশান্তর সহিত তর্কে জয়ী হইবার ক্ষমতা আমার নাই; অসীম তাহার জ্ঞান, তীক্ষ্ণ তাহার বুদ্ধি। তাই এলোমেলো উত্তর দিয়া অবহেলা দেখাইলাম, "যত সব ন্যাকামির ছড়া। প্রেমের কবিতা পড়তে আমার ঘেন্না হয়। প্রেম বলেই কিছু নেই, তার আবার কবিতা!" অট্টহাস্যে টেবিলের উপর মোহন ভঙ্গিতে এলাইয়া পড়িলাম।

"এই ধরো তোমার সেই প্রিয় কবিতাটি—" আবার বলিতে আরম্ভ করিলাম, "Portrait of a Lady, অমন কি আর সত্যি হয়? এতদিন ধরে একজনকে মনে থাকে কখনও? তার ওপর মেয়েটি কোনোও প্রতিদান দেয়নি।"

প্রশান্তর দৃষ্টি ম্লান হইয়া গিয়াছিল, "কেন অমন হবে না? ও রকম মেয়েও আছে, অত ভালবাসাও দুর্লভ নয়। অতদিন? সারা জীবন মনে থাকে। তুমি ভালবাসাকে বাজে সেন্টিমেন্টালিটি বলে ভাবো, তোমার তো এ মনে হবেই।"

হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "কিন্তু ছেলেটি আচ্ছা জব্দ হল। যখন সে মনে মনে আকাশ-কুসুম তৈরি করছে, স্বাভাবিক বন্ধু ভাবে দেখছে। ইস কী মজার I shall go on serving tea to friends—মুখের ওপর বলে যাচ্ছে—।"

প্রশান্তর মুখে ব্যথার ছায়া, আমার দিকে চাহিয়া অনেকটা নিজের মনে, অস্পষ্ট কণ্ঠে সে বলিল, "এত সুন্দর অথচ এত নিষ্ঠুর!"

পরিণামরমণীয় বর্ষার বিকালে মণিকার বাড়ি চায়ের নিমন্ত্রণে গেলাম। অন্যান্য ক্লাসের মেয়েরাও আসিয়াছিল। আমার রক্তকোকনদ, হাল্কা বেনারসী শাড়িখানির কারুকার্যখচিত পাড় প্রশংসা করিতে করিতে সিপ্রা বলিল, "যত দিন যাচ্ছে ততই ইরা যেন আরো সুন্দর হচ্ছে।"

নিজের রূপ বর্ণনা আমার চিরকাল ভালো লাগে। নিপুণ প্রসাধন ও অপরিসীম যত্নে এ-রূপকে আরও উজ্জ্বল করিবার প্রয়াসে কোনোদিন বিন্দুমাত্র ত্রুটি ছিল না। সৌন্দর্যের বন্দনা শুনিবার জন্য উৎসুক কান পাতিয়া রহিলাম।

বক্রদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া কেক্ কাটিতে কাটিতে মণিকা মন্তব্য প্রকাশ করিল, "রূপ থাক্‌লে আর কি বলো? সাধারণ একটা ছেলেকেও জব্দ করতে পাচ্ছে না, এটা কি কম দুঃখের কথা?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সিপ্রা বলিল, "তার মানে?"

"মানে আর কি? শ্রীমতী প্রশান্তকে খেলাতে গিয়ে নিজেই ধরা পড়ে গেছেন। প্রশান্ত তো বন্ধুদের কাছে এ নিয়ে গল্প করে, বিদ্রূপ করে বেড়াচ্ছে।"

ভুলিয়া গেলাম প্রশান্তর কোনোও বন্ধু নাই, নির্লিপ্ত ঔদাস্যে সে চিরদিন সুদূর। ভুলিয়া গেলাম হৃদয়-ঘটিত ব্যাপার লইয়া আন্দোলন সে কখনও করে না। দিশেহারা ক্রোধে বলিলাম, "বলতে চাও তার মতো ছেলেকে আমি গ্রাহ্য করি?"

"আমি বল্‌ব কেন, সবাই বলছে। তা নইলে, আমাদের যে কথা ছিল সে-সব ভুলে তুমি প্রশান্তকে নিয়ে মেতেই রয়েছ।" তিক্ত হাসি গোপন করিতে মণিকা অধরের কাছে চায়ের চিত্রিত পেয়ালা তুলিয়া ধরিল।

অপমানে, রোষে আমার সর্বদেহ জ্বলিয়া উঠিল। নমিতার উদ্যত স্যাণ্ডউইচ প্রত্যাখ্যান করিয়া উঠিতে উঠিতে কোনোমতে আহতা সর্পীর গর্জনে বলিলাম, "আচ্ছা!"

চায়ের আসর হইতে অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম কাউচের উপর অন্ধকারে সে শুইয়া আছে। ব্যগ্র বাহুপ্রসারণ এড়াইয়া বিরক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, "কে?" বিনীত কোমল কণ্ঠে উত্তর হইল, "আমি।"

মনে মনে হাসিলাম। প্রশান্ত গুহ, আজ এখনই তোমার দূরদৃষ্ট তোমাকে ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গিনীর গহ্বরে টানিয়া আনিয়াছে। আমাকে লোকের চক্ষে হাস্যাস্পদ করিবার, বন্ধুদের কাছে গল্পের খোরাক করিবার জন্য শিক্ষা আজই তোমাকে দিব। খেলার শেষ এখনি হইবে। কিন্তু, রাগ নয়, তর্জন নয়; অবহেলা ও বিদ্রূপে তোমার হৃদয় ভাঙিতে হইবে।

রূঢ়স্বরে বলিলাম, "আমিটা কে?"

"গলা শুনেও চিনতে পারছ না?"

পরম তাচ্ছিল্যে উত্তর দিলাম, "চিনে রাখার দরকার মনে করিনি।"

আগের মতোই উত্তাপবিহীন স্বরে উত্তর হইল, "আচ্ছা। আমি প্রশান্ত।"

আলো জ্বালাইলাম। লাল আলো সে ভালবাসে বলিয়া নিজের হাতে আমার বসিবার ঘরের আলো লাল আবরণী দিয়া ঢাকিয়া দিয়াছিল। প্রলয়ের সূচনায় রক্তমেঘের মতো সেই লাল আলো হাসিয়া উঠিল।

"ওঃ, প্রশান্ত। তুমি না হলে কার এমন অজস্র সময় শুয়ে-বসে নষ্ট করার আছে।" আয়নায় কেশবেশ ঠিক করিয়া সোফায় অর্ধশায়িত ভঙ্গিতে বসিলাম।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া প্রশান্ত বলিল, "একটা বিশেষ দরকারী কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।"

"বলে ফেলো তাহলে। কিন্তু দোহাই তোমার, বাজে কবিত্ব করে সময় নষ্ট কোরো না। তোমার কাজ না থাকতে পারে, আমার আছে।"

প্রশান্ত ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "তোমার কাজ নষ্ট হবে না। ভাবছি যুদ্ধে নাম লেখাব। তুমি কি বলো?" একান্ত আগ্রহে ও প্রত্যাশায় সে আমার মুখের দিকে চাহিল।

আমার মন বুঝিবার জন্য এ প্রস্তাব বুঝিলাম। ইহার মধ্যে কতবড়ো আশা, আকাঙ্ক্ষা লুকাইয়া আছে তাহাও বুঝিলাম। কিন্তু, আজ তাহাকে আঘাত দিতে দ্বিধা হইল না অতিশয় অনাগ্রহ, উদাসীনভাবে বলিলাম, "সে আমি কি বলব? তোমার আত্মীয়-স্বজন সবাইকে বলে মত নাও। আর হায় হায় শেষে তুমিও করবে যুদ্ধ! মেয়েদের স্তবগাথায় কলম-ধরা হাতে তলোয়ার কি মানায়? বন্দুকের শব্দ শুনে শেষে মূর্ছা না যাও! কবি-কবি ভাব নিয়ে প্রেম করা চলে! যুদ্ধে যেতে দরকার হয় পৌরুষের।"

প্রশান্ত উঠিয়া বসিল, তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। "আমাকে তুমি শেষে এই মনে করো?"

"শেষে আগে কি প্রশান্ত? চিরকাল তুমি যা, তাই তোমাকে মনে করি। ন্যাকা, মেয়েলি ঢঙের কবি বা পণ্ডিত আমার দু-চোখের বিষ। আমি চাই বজ্রের মতো শক্ত পুরুষ।" একটু হাসিয়া পুনরায় বলিলাম, "যুদ্ধে যাবে, এই কথা? আমি ভাবলাম অন্য কিছু!" তাহার নত মুখের দিকে কটাক্ষ করিয়া ছুরির মতো শানিত হাস্যে বলিলাম, "ভাবলাম—বুঝি বা বিবাহ প্রস্তাব!"

তীক্ষ্ণ, অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে সে বলিল, "ধরো তাই যদি হত?"

কোনোও দিন প্রশান্ত এভাবে কথা বলে নাই। অপ্রতিভ-ভাব মুহূর্তে দমন করিয়া হাসিয়া উঠিলাম, "তুমি! তোমাকে আমি বিয়ে করব? আশ্চর্য, কোনোও দিন কি বোঝোনি তোমার ওপর আমার সামান্য করুণা ভিন্ন কিছুই নেই? কী বোকা তুমি?"

প্রশান্ত উঠিয়া আমার সামনে দাঁড়াইল, "ইরা, তোমাকে ভালবাসার বোকামি ভিন্ন জীবনে কখনো ভুল করিনি। বোকা আমি নই, একথা তুমিও জানো। আমি তোমাকে বড়ো বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু আমাকে নিয়ে খেলাবার কি দরকার ছিল? প্রেমের অভিনয় কেন করেছ তুমি?"

তাহার রক্তলেশশূন্য সাদা মুখের দিকে তাকাইয়া কেমন যেন মায়া হইতে লাগিল। ভাবিলাম, না, আর কেন? কিন্তু তাহার মুখের তীব্র ভর্ৎসনা আমাকে নিষ্করুণ করিল। উত্তর দিলাম, "শোনো প্রশান্ত, প্রেমের অভিনয় আমি স্বেচ্ছায় করিনি। মণিকা এবং ক্লাসের অন্যান্য মেয়েরা আমাকে অনুরোধ করেছিল। তাদের সঙ্গে আমার কথা ছিল তোমাকে আমার কাছে হার স্বীকার করাবো। তুমি আমাকে ভালবাসবে, তোমাকে আমি প্রত্যাখ্যান করবো। তাই, তোমার পেছনে এত সময় নষ্ট করেছি, নইলে খেলাবারও যোগ্য তুমি নও।"

প্রশান্ত আমার অতি সন্নিকটে দাঁড়াইল। কমনীয় মুখে তাহার কী অসহ ঘৃণা! যে চোখে আমার জন্য আদর-জড়ানো, পুষ্প-কোমল দৃষ্টি সঞ্চিত ছিল আজ তাহা অশনি বর্ষণ করিল—

"তুমি এই? ছিঃ। অথচ আমি তোমাকে এত ভালবেসেছিলাম। আজ কিন্তু ঘৃণা ছাড়া আমার মনে আর কিছুই নেই।" হাতের জ্বলন্ত সিগারেট

প্রশান্ত জানালা দিয়া ফেলিয়া দিল। কনিষ্ঠার হীরার আংটি দীপ্ত হইয়া উঠিল। ইতস্তত অসংলগ্ন পদচারণ করিয়া আমার সম্মুখে আবার সে দাঁড়াইয়াছে। ক্রোধে ঘৃণায় প্রদীপ্ত এই প্রশান্তকে আমি চিনি না। আমার সমবয়স্ক, ফুলের মতো কোমল তরুণ এত ঘৃণা করিবার শক্তি কোথা হইতে পাইল?

"জীবনে কিছুই তুমি ভালবাসনি নিজেকে ছাড়া। মেয়েরা চিরকাল 'একো' রূপেই দেখা দিয়েছে, আর পুরুষ 'নার্সিসাস্' রূপে। একো ভালবাসে নার্সিসাস্‌কে, নার্সিসাস্ জলের মধ্যে নিজের মুখের ছায়ার প্রেমে মত্ত। একোর দিকে সে ফিরেও চায়নি। মেয়েরাও যে নার্সিসাস্ হতে পারে তার প্রমাণ তুমি। নিজের রূপকেই ভালবেসেছ, তাই তুমি নার্সিসাস্। নার্সিসাসের অভিশাপই তোমার ওপর রইল নার্সিসাস্।" শেষ কথাটির ওপর সমস্ত বিষ ঢালিয়া বিদ্যুৎগতিতে সে বাহির হইয়া গেল।

সেই তাহার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ। তাহার পরেই সে যুদ্ধের বিমান-বহরে যোগ দিয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

আজ নিরালা রাত্রে তাহাকে মনে পড়িতেছে। আমার চারিপাশে তাহার অন্তরাত্মা যেন খুঁজিয়া মরিতেছে, যদি সভ্যতার জয়পতাকা এই দেহে কিছুমাত্র হৃদয় অবশিষ্ট থাকে! সে দূরে গিয়াছে, কিন্তু আজিকার ক্ষীণ-চন্দ্রালোকিত যামিনী তাহার আভাস স্বপ্নে এখনো বিভোর। আজও বাতাসের দ্রুত স্পর্শে অকারণে তাহাকে কেন মনে পড়ে!

মনে হয়, তাহার ভুল হইয়াছে, আমি নার্সিসাস্ নই। কেন সে আর একটু অপেক্ষা করিল না? জীবনে একমাত্র তাহাকেই ভালবাসিতে পারিতাম।

———



দ্বৈত

কনক মুখোপাধ্যায়

উঃ, আর পারি না। ঘাড় যে একেবারে ব্যথা হয়ে গেল।

কপট ঝঙ্কারে মুখ ফেরায় তপতী।

: বাঃ, ঠিক, ঠিক হয়েছে। আর এক-সে-কে-ণ্ড লক্ষীটি। ঠিক এই গ্রীবা ভঙ্গিটার জন্যেই আমার তুলি অপেক্ষা করছিল।

তরতর করে কাগজের উপর রং-এর তুলি বুলিয়ে যায় শ্যামল।

রৌদ্রদগ্ধ দুপুরের ছায়াঘন গাছের নিচে অর্ধশায়িত ভঙ্গিতে এলিয়ে রয়েছে তপতী। হাতে একখানা কী যেন বই খোলা। পরনে অতি সাধারণ শাড়ী-ব্লাউজ। নিতান্তই ঘরোয়া ভাব। এলায়িত চুলের গোছা বাতাসে লুটিয়ে লুটিয়ে খেলে বেড়াচ্ছে। ঈষৎ ঘাড় বাঁকিয়ে শ্যামলের দিকে চেয়ে আছে তপতী। শ্যামল তার ছবি আঁকছে তন্ময় হয়ে।

কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবী মিলে এক্সকারশানে এসেছে ওরা সহর থেকে অনেকটা দূরে। ওদেরই বন্ধু সুনীলদের দেশের বাড়ী। শ্যামলের অনেকদিনের মনের সাধ তপতীকে সামনে বসিয়ে মনের মত করে তার একখানা ছবি আঁকে। আজ তাই অনেক চেষ্টায় হাতব্যাগে আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে ওরা দুজন "অন্যমনস্ক" হয়ে হাঁটতে হাঁটতে দল ছেড়ে এই নিরালা আমবাগানে এসে বসেছে।

পিছনের ওরা সবাই খানিকবাদেই এসে পড়লো এদিকে; বাগানের ওধার

থেকে কাদের যেন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কে যেন ডাকলো শ্যা-ম-ল-ত-প-তী—

চমকে উঠে দাঁড়ালো তপতী ; সম্বিত ফিরে এলো তার। না, এতো সেই ছায়ামধুর আম্রকুঞ্জ নয়। তপতীদের ছোট্ট সঙ্কীর্ণ বাইরের বসবার ঘর।

এতক্ষণে তপতীর খেয়াল হল যে শ্যামল কিছুই খায়নি। খাবারের প্লেটটা দূরে ঠেলে রেখে দিয়ে টেবিলের খবরের কাগজখানার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। এ কি চেহারা শ্যামলের ! এই কি সেদিনের সেই একান্ত নিবিষ্ট শিল্পী ? দুনিয়ার বিতৃষ্ণা যেন আজ ভেঙ্গে পড়েছে শ্যামলের সারা দেহে। অশান্ত উচাটন মন।

: ওকি, খেলে না ? নরম গলায় জিজ্ঞাসা করল তপতী।

: বলেছি তো খিদে নেই। রুক্ষ সংক্ষিপ্ত জবাব।

পাশাপাশি বাড়ি। কাল রাত্রে যে শ্যামলের বাড়ি হাঁড়ি চড়েনি, সকালেও যে চা পর্যন্ত খাওয়া হয়নি ওর, তা জানে তপতী। তবুও এই দারিদ্র্যরুক্ষ যুবককে খাবারটা খেয়ে নিতে আর একবার অনুরোধ করতে পারল না তপতী। জানে, শ্যামলের দারিদ্র্যের অভিমানে আঘাত লাগলে সে যে কিভাবে ফেটে পড়বে তার ঠিক নেই। অগত্যা ক্ষুধার্ত শ্যামলের সামনে থেকে খাবারের প্লেটটা সন্তর্পণে সরিয়ে নিল তপতী

দুজনেই বসে রইল অনেকক্ষণ চুপচাপ। যেন কোনো কথা নেই ওদের। তপতী দুই একবার ঘড়ির দিকে তাকালো। অফিসের বেলা হচ্ছে তার। সরকারী অফিস, ঘড়ির কাঁটায় চলতে হয় তপতীকে। ভাল লাগে না রোজ রোজ নিয়মে বাঁধা জীবন। কিন্তু চাকরী করা মেয়ে বলেই না, আজ তপতীর এত স্বাধীনতা এ বাড়িতে ? এই যে শ্যামলের সঙ্গে মুখোমুখি বসে আছে, কেউ তো কিছু বলতে পারছে না ! আগে আগে শ্যামলের সঙ্গে মিশবার জন্য কত লুকোচুরি, কত ছল চাতুরিই না করতে হতো, বৌদি আবার নিজের হাতেই শ্যামলের জন্য চা খাবার দিয়ে যায়। মা সেদিন জিজ্ঞাসা করছিলেন, হ্যাঁরে, ঐ শ্যামল ছেলেটা কি এখন কিছু চাকরী বাকরী করে ? এ সব লক্ষণ শুভ বই কি ! একে স্বাধীনচেতা তারপর চাকরী করে সংসারের সাশ্রয় করে। তপতী এখন বাড়ীতে স্বপ্রতিষ্ঠিত।

শ্যামলই প্রথমে কথা বললো : বিকেলে আসছ তো আজ আমাদের আর্ট এগজিবিশনে ?

তপতী : নিশ্চয়ই তুমি কিন্তু থেকো ঠিক সময়ে।

শ্যামল : হ্যাঁ থাকব, ঠিক সাড়ে পাঁচটায় এসো। যাই, আবার জামা-কাপড়টা কাচতে হবে। জানো তো, আমাদের বাড়ীর নতুন ব্যবস্থায় আমরা সকাল আটটা থেকে নয়টা—এই এক ঘণ্টা মাত্র কলের জল পাব। একটি কল আর চারটি ভাড়াটে। রোজ ঝগড়া। অবশেষে কাল সব বাড়ীর কর্তারা বসে কলের জলের র‍্যাশন করেছে—আমাদের ঐ এক ঘণ্টার বরাদ্দ।—বলেই শ্যামল অহেতুক জোরে হো হো করে একটা ফাঁকা হাসি হেসে উঠল। তারপরই বলল : চলি—

দুজনেই উঠে দাঁড়ালো। তপতী একটু আমতা আমতা করে বলল—জানো, দাদা বলছিলেন কি—

শ্যামল : কি বলছিলেন ?

তপতী : বলছিলেন যে, ওদের অপিসের পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টের সেই পোষ্টটা নাকি এখনো খালি রয়েছে। যদি তুমি একটা দরখাস্ত—

তপতীকে কথা শেষ করতে দিল না শ্যামল। রুক্ষ তীক্ষ্ণ গলায় ঝাঁঝিয়ে উঠলো :—আবার তুমি সেই কথাটা বলছ ? ছিঃ! তুমি যে এত নিরেট হতে পারবে তা আমি ভাবতেই পারি না। তুমি—তুমিও শেষটায় না, দিদি, ওদের মত শুধু সংসারটাই বুঝলে ? আর—আর আর্ট আমার কাছে কিছুই নয় ? একটা ফাইন আর্টের উত্তীর্ণ শিল্পী—সে যদি টাকার জন্য কমার্শিয়াল আর্টের কাছে বিক্রীত হয়ে যায়…আমার ল্যাণ্ডস্কেপ…আমার মনের ছবি…সব ছেড়ে দিয়ে শেষটায় আমি তোমার ঐ কামিনীরমণ তেল আর চরণকমল আলতার বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকার চাকরী নেব ? ছিঃ ছিঃ তপতী, তুমি কী ! রাগে, দুঃখে, অভিমানে শ্যামলের গলা ধরে এলো। তপতীর দিকে আর ফিরে না তাকিয়েই শ্যামল দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তপতী শ্যামলের যাবার পথে শূন্য দৃষ্টি মেলে রইল। শ্যামলের সার্টের পিছনের ময়লা দাগটা শুধু তার চোখে পড়লো। শ্যামলের যে মাত্র একটাই ধুতি-সার্ট বাইরে যাবার মত এই কথাটাই এই মুহূর্তে তপতীকে সবচেয়ে পীড়া দিতে লাগলো।

সকাল থেকেই মুষড়ে গেছে তপতী। সারাদিন মনমরা হয়ে কাজ করেছে অফিসে। কারও সঙ্গে মন খুলে কথা বলতেও ইচ্ছে হয়নি। শ্যামলের তিরস্কারের জ্বালাটা যেন ভুলতে পারছে না কিছুতেই। শ্যামল কি কোনোদিনই প্র্যাকটিক্যাল

হবে না? এই টাকা-আনা-পাই-এর স্থূল জগতে ও কি করে বাঁচবে আর কি করেই বা ওরা ঘর বাঁধবে? উঃ শ্যামল! তোমাকে সহ্য করাও যায় না হারানও যায় না। চোখ দুটো জ্বালা করে তপতীর।

ছুটির পর বিষণ্ণ মনে নানা কথা ভাবতে ভাবতে তপতী এসে পৌঁছলো শ্যামলদের আর্ট এগজিবিশনে। ভাবলো, চুপচাপ ঘুরে আসবে, শ্যামলের সঙ্গে বেশি কথা বলবে না। একেই রেগে আছে, আবার লোকের সামনেই হয়তো কি বলতে কি বলে বসবে তার ঠিক নেই।

কিন্তু এগ্‌জিবিশন হলের গেটের কাছে এসে একেবারে অবাক হয়ে গেছে তপতী। ধুতি-সার্টটি ইতিমধ্যে কেচে শুকিয়ে ইস্ত্রি করে পরেছে শ্যামল। চুল আঁচড়েছে সযত্নে। ফিট্‌ফাট্ চেহারা, প্রফুল্ল মন। চঞ্চল ভঙ্গিতে ছুটে এসেই তপতীর হাত ধরে এক ঝাঁকুনি: এই জানো, জানো, কি হয়েছে?

তপতীকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে গেল শ্যামল। তপতী কিছু আড়ষ্ট হয়ে জিজ্ঞাসা করল—কি হয়েছে?

শ্যামল কাঁপা গলায় বলল: আমার একখানা ছবি আজই বিক্রি হয়েছে নব্বই টাকায়—কি ভাবছ তুমি? দুনিয়া কি ইঁট কাঠের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে? শিল্প কি মরে যাবে? না, না কক্‌খনো না—আছে, আছে অনেক সমজদার আছে ফাইন আর্টের বুঝলে? ঐ যে সেই ল্যাণ্ডস্কেপটা—তুমি রেগে গিয়েছিলে, আমি সারাদিন বসে এঁকে ছিলাম বলে—সেইখানা—

আনন্দে, উত্তেজনায় কাঁপছে শ্যামল, যেন কোন্ রাজত্ব লাভের সংবাদ দিল সে তপতীকে। শ্যামল বলেই চলল—এই টাকাটা পেলে আমি প্রথমেই ঠিক তোমার জন্যে একটা—

তপতীর হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে হঠাৎ থমকে থেমে গেল শ্যামল। তপতীর হাতখানা আল্‌গা হয়ে খসে পড়লো। শ্যামলের চোখের সামনে ভেসে উঠলো ক্ষুধার একটা সর্বগ্রাসী হাঁ। তার বুড়ো মা, পঙ্গু ভাই, বিধবা দিদি সবাই তাকিয়ে আছে শ্যামলের মুখের দিকে। তিন মাসের বাড়ী ভাড়া, মুদির দোকান—নব্বইটি মাত্র টাকা! কি সে উপহার দিতে পারে এর থেকে তপতীকে? মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠলো শ্যামলের।

আরও কিছুদিন কাটলো। শ্যামল আর পারে না। মাঝে মাঝে টুকটাক কাজের অর্ডার পায় জানাশোনা মহল থেকে, কখনো বা দুই একটা ছবি বিক্রি

হয় নামমাত্র দামে। কিন্তু এভাবে তো আর চার চারটে পেট চলে না! ছবি আঁকার সরঞ্জাম কি কম কিনতে হয়? মূলধন নাই, সহায় নাই। উপবাসী চোখে প্রকৃতির রূপ রুক্ষ, স্তিমিত হয়ে আসে। ভেঙ্গে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যায় শিল্পী হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবার সাধ। বাড়ীতে যতক্ষণ থাকে না হয় মা, না হয় দিদি ঘ্যানর ঘ্যানর করে—ওরে, এত লোকের চাকরী জোটে আর তুই পাশ করা ছেলে, যা হক একটা চাকরী কি তোর জোটে না? ওর কাছে গিয়েছিলি, তার কাছে লিখেছিলি—কি ছাই রং-তুলি নিয়ে পড়ে থাকিস, আর কদিন চলবে এমন করে? পঙ্গু ভাই বিন্টুটা ফ্যাল ফ্যাল করে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শ্যামলের ছবিগুলোর দিকে।

শ্যামল ছুটে যায় তপতীর কাছে। এতটুকু ভরসা, এতটুকু বুকের জোর চায় সে। হোক মিথ্যে, তবু একটু সান্ত্বনা যেন দেয় তপতী। তপতী একবার বলুক তাকে—না না একদিন লোক তোমার ভিতরের শিল্পীকে চিনবে, তোমার দিকে ভাগ্যলক্ষ্মী মুখ তুলে না তাকিয়ে পারবে না। কিন্তু কই, তপতী তো তা বলে না? তপতী বলে—তুমি আনপ্র্যাকটিক্যাল শ্যামল। আমাদের যে বাঁচতে হবে সেইটেই আদি অকৃত্রিম সত্য! তপতী নিজেই যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে যেখানে হোক, যে মাইনেতে হোক শ্যামলকে কোনোমতে একটা বাঁধা মাইনের চাকরী যোগাড় করে দিতে তাও তো জানে শ্যামল!

শ্যামলের মা শয্যা নিলেন। কাসতে কাসতে সারারাত ঘুম হয় না। শ্যামল পায়চারি করে বেড়ায়। চেনা ডাক্তারের কাছ থেকে কদিন ধারে ওষুধ আনে কিন্তু আর কদিন?

রং, তুলি, ছবির কাগজে ধূলো জমে যায়। শ্যামল পাগলের মত সারাদিন ঘুরে বেড়ায়—কোনোমতে, কোনোখানে যা হ'ক একটা চাকরী তাকে যোগাড় করতেই হবে। মাকে তার বাঁচাতেই হবে। কত দুঃখে, কত কষ্টে শেষ সম্বলটুকু পর্যন্ত দিয়ে মা তার কলেজে পড়ার খরচ যোগাড় করেছেন, মনে করে চোখ ভরে জল আসে শ্যামলের। বাবা মারা যাবার পর বাবার শেষ চিহ্নটুকু ছিল মায়ের হাতের একগাছি সরু সোনা-বাঁধানো লোহা। সেটিও মা বের করে দিয়েছিলেন শ্যামলের পরীক্ষার ফি দিতে। আজ মা মৃত্যুশয্যায়। শ্যামল কি পারবে না তাঁকে বাঁচাতে?

পাগলের মত ছুটে যায় শ্যামল তপতীর কাছে। বলেঃ তপতী, ডাক্তার

বলে গেল মায়ের টি বি হয়েছে। আর সময় নেই তপতী। তুমি যে চাকরীটার কথা বলেছিলে তোমার দাদার অফিসে—কিংবা আর কোথাও—কান্নায় গলা ধরে আসে শ্যামলের।

তপতী বলে: সে চাকরী তো হয়ে গেছে। তবে আমার বন্ধু লীলার বাবার ব্যবসায় নাকি একটা নতুন ডিপার্টমেন্ট খুলেছে। সেখানে খোঁজ করতে পারি।

তাই কর তপতী—যা হ'ক কর—যা হো-ক।

চাকরীটা হয়ে গেল শ্যামলের। লীলার বাবা মিঃ দত্ত 'ডাট কোম্পানীর' প্রপ্রাইটার শ্যামলের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছেন। মাস দুই সামান্য হাত খরচে এ্যাপ্রেন্টিস্ থাকার পর পুরো মাইনেতে বহাল হবে শ্যামল। কোনো মতে আর দুটো মাস।

দুটো মাস কাটলো না। মাকে শ্যামল বাঁচাতে পারলো না। বড্ড দেরীতে ধরা পড়েছিল রোগটা। মাস দেড়েকের মধ্যেই মা মারা গেলেন।

নির্মম দুনিয়ার উপর যেন প্রতিশোধ নেবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল শ্যামল। কত টাকা চাই তার? কত টাকা সে রোজগার করতে পারে তা একবার দেখিয়ে দেবে রাক্ষসী দুনিয়াকে। ক্রমে ক্রমে ব্যবসার কাজে হাত পাকলো শ্যামলের। চাকরীর উন্নতি হতে লাগলো। একদিন সে হয়ে উঠলো মিঃ দত্তের ডান হাত। সময় নেই শ্যামলের। তপতীর সঙ্গে আর দেখা হয় না বেশি। ওরা কেমন আছে কে জানে? রোজই ভাবে যাবে একবার, কিন্তু হয়ে ওঠে না কাজের চাপে।

হাল ফিরে গেলো শ্যামলদের বাড়ীর। এবার তপতীর মা, দাদা, উসখুস করছেন। বিয়েটা হয়ে গেলেই তো হয়। তপতীও যেন মহা লজ্জায় পড়েছে। আর যেন তার এ বাড়ীতে থাকা উচিত নয়। কিন্তু শ্যামল কি চিরকালই এমনি আনপ্র্যাকটিক্যাল থাকবে? বিয়ের কথাটাও কি তপতীকেই মনে করিয়ে দিতে হবে? অভিমানে মুখ ভার হয়ে আসে তপতীর।

আর না পেরে এক রবিবার দুপুরে পা টিপে টিপে তপতীই গিয়ে ঢোকে শ্যামলের ঘরে। অবাক করে দেবে শ্যামলকে। কিন্তু কই, কোথায় শ্যামল? পাশের ঘরে শ্যামলের দিদি অঘোরে দিবানিদ্রা যাচ্ছেন। বিল্টুটার চোখে

ঘুম নেই। ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে এসে শ্যামলের অনেকদিনের ধুলোপড়া অসমাপ্ত কতগুলো ছবি আর ছবি অাঁকার সরঞ্জামগুলো ঝেড়ে ঝুড়ে গুছিয়ে রাখছে। তপতীকে দেখে বিনুর ভারী আনন্দ হলো। অনেকদিন তপতী ওদের দুঃখের কথা শুনেছে, আজ কিছু সুখের কথাও শোনাতে পারবে তাকে। বলল, জানো তপতীদি, আমি হাঁটতে পারব। দাদা বলেছে যে আমাকে এমন বড ডাক্তার দেখাবে যে, আমার পা সোজা করে দেবে। অনেক টাকা লাগবে কিন্তু সে ডাক্তার দেখাতে। সব টাকা দাদা দেবে।

বিনুর দুইচোখে আনন্দ উপছে পড়ছে। তপতী খুশি হয়ে তার মাথায় আদর বুলিয়ে দিয়ে বলল: তাই নাকি? বাঃ বেশ হবে তা হলে! তা তোমার দাদা কোথায়? আজ রবিবার না?

বিনু বলল, ও, তা বুঝি জানো না তুমি? দাদা তো কদিন ধরেই বাসায় আসছে না। দিদির কাছে টাকা পয়সা সব দিয়ে যায় আর ও এখন আপিসের বডবাবুর বাডীতেই ক'দিন ধরে থাকছে। আপিসের কিনা অনেক কাজ পড়েছে তাই। টালিগঞ্জের ওদিকে একটা বাসা ঠিক করেছে দাদা। আমরা শীগ্‌গীরই উঠে যাব সেখানে।

তপতী আর দাঁড়াল না। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলো। মাথাটা কেমন গুলিয়ে গেল তপতীর। তাকে না জানিয়েই শ্যামল এত সব—

কালই শ্যামলরা এ বাড়ি ছেড়ে টালিগঞ্জের বাড়িতে উঠে যাবে। তপতীরা খবর পেল ওদের বাড়ির ঠিকে ঝি-এর মুখে। খবর শুনে তপতীর মা আর বৌদি মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। তপতী কারও দিকে না তাকিয়ে নিঃশব্দে সরে গেল সেখান থেকে।

সারাদিন দারুন অস্বস্তিতে কাটলো তপতীর। শ্যামল কি একবারও আসবে না? এও কি সম্ভব?

তপতী একলা বসে আছে ছাদের ভাঙ্গা কার্ণিশটার গা ঘেঁসে। সন্ধ্যে কখন ঘুরে গেছে। আবছা অন্ধকার ঘিরে ফেলেছে তপতীকে। শ্যামল এলো। হাতে একটা আধখোলা কাগজের মোড়ক। নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো তপতীর সামনে।

তপতী মুখ তুলে ধরা গলায় বলল : তুমি এতদিনে এলে ? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না শ্যামল ?

শ্যামল কেমন হতাশ হয়ে তপতীর পাশে বসে পড়ল। হাতের আধ-খোলা মোড়কটা নিচে রাখতেই আলগা হয়ে খুলে গেল। বহুদিন আগে আম্রকুঞ্জে বসে শ্যামল তপতীর যে ছবিখানা এঁকেছিল সেই ছবিখানা, আর শ্যামলের সেই অনেক দেখা জীর্ণ একখানি ধুতি ও একটি কলার ছেঁড়া সার্ট। ছেঁড়া কলারে তপতীর হাতের সেলাই। আশ্চর্য! এগুলো শ্যামল রেখে দিয়েছিল ? কেন ? তপতী নির্বাক বিস্ময়ে খোলা মোড়কটার দিকে তাকিয়ে রইল।

শ্যামল কাঁপা গলায় বলল : তপতী, তুমি যে শ্যামলকে ভালবেসেছিলে, এ দু'টি জিনিস সেই শিল্পী শ্যামলের শেষ অস্তিত্ব। তোমার কাছেই রেখে যাই। তোমার সে শিল্পী শ্যামল আর নেই জেনো—সে মরে গেছে, মরে গেছে—। শ্যামল যেন কেমন টলছে। কথাগুলো জড়ানো।

তপতী ভয় পেয়ে চমকে উঠল।—এ সব তুমি কি বলছ শ্যামল ? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি !

দুই হাতে শ্যামলকে শক্ত করে ধরে নাড়া দিল তপতী। বল বল কি হ'য়েছে তোমার—

শ্যামল জড়িয়ে জড়িয়ে বলল : ভেবেছিলাম তোমাকে একেবারে অ-বা-ক করে দেব। চাকরীর কত উন্নতি হয়েছে আমার। টালিগঞ্জে বড় বাড়ি ভাড়া করেছি। ভেবেছিলাম তোমাকে একেবারে গৃহলক্ষ্মী করে নিয়ে যাব আমার ঘরে—আর তুমি অবাক হয়ে যাবে—

তপতী অধৈর্য হয়ে উঠল : কি হয়েছে ? তুমি অমন করছ কেন শ্যামল ? এ কি ? তাকাও তো আমার দিকে ভাল করে—তুমি কি নেশা করেছ নাকি ? উঃ! শ্যামল! তপতী ভেঙ্গে পড়লো।

শ্যামল হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল : হ্যাঁ, নেশা করেছি। নেশা করেই এসেছি তপতী। নেশা না করলে তোমার কাছ থেকে হয়ত যেতে পারব না তাই—নেশার ঘোর থাকতে থাকতে আমায় যেতে দাও তপতী···আজ সকালে মিঃ দত্ত আমার বাড়ি-ঘরের খোঁজ নিলেন সব—টালিগঞ্জের বাড়ির ছয় মাসের অগ্রিম ভাড়া তিনি দিয়েছেন—ম্যানেজারের পোষ্ট দিয়েছেন—কেন ? কেন তা জান ?

তপতী : কি ? কি বলছ তুমি—

শ্যামল : হ্যাঁ, ঠিকই বলছি, এখনো আছে নেশার ঘোর। প্রপ্রাইটার দত্তের একমাত্র কন্যা লীলাদেবী পছন্দ করেছেন আমাকে—দত্তর ছেলে নেই। এমন প্রতিভাবান ছেলেকে তিনি নিজের ছেলের আসনটি দেবেন ঠিক করেছেন। অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা—আর তা না হলে এই—এই ছেঁড়া ধুতি আর সার্ট—হা—হা—হা—হা—বাসায় এসেই চাকরিতে ইস্তফা দেবার জন্য চিঠি লিখতে বসলাম। পঙ্গু বিনুটা ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে এলো : দাদা, কবে আমি হাঁটতে পারব? তুমি না বলেছিলে…মাকে আমি বাঁচাতে পারিনি তপতী, বিনুকে আমি কি বলব?…পারলাম না পারলাম না। তপতী, চাকরিটি ছেড়ে দিতে পারি নি তক্ষুনি—টাকা, টাকা। টাকার বড় দরকার আমার…তাই নেশা করে এসেছি। তুমি না বলেছিলে আমি আনপ্র্যাকটিক্যাল? শিল্পী শ্যামল বড় আনপ্র্যাকটিক্যাল ছিল, এখন ব্যবসাদার শ্যামল কত বেশী প্র্যাকটিক্যাল হয়েছে দেখ তপতী…এই নেশার ঘোরটা যদি কেটে যায় আবার হয়তো আনপ্র্যাকটিক্যাল হয়ে পড়ব—তখন হয়তো আবার এসে এই ছেঁড়া জামাটা আর কাপড়টার খোঁজ করব তোমারই কাছে…হা হা…ভয় হচ্ছে! ভয় হচ্ছে! নেশাটা কেটে না যায়……ওকি! তুমি অমন করে চেয়ে আছ কেন? তপতী—তপতী! ওকি! তুমি কি আমাকে ঘৃণা করছ? আমি কি দুর্বল? না, না, তুমি আমায় দয়া করে ত্যাগ কোরো তপতী, কিন্তু ঘৃণা! তোমার কাছ থেকে ঘৃণা! চোখ নামাও তপতী, চোখ ফেরাও—আমি সইতে পারছি না।

শ্যামল উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে বেরিয়ে গেল। নিশ্চল বিমূঢ় তপতীর চোখের সামনে থেকে সন্ধ্যা তারাটা কোথায় যেন ডুবে গেল।

———



নববর্ষ

মহাশ্বেতা দেবী

রামানুজ আর প্রমীলার বসে গল্প করার সময়টা সকালে মেলে না কোনোদিন। তবে পয়লা বৈশাখ বলে কথা। আজ তো একটা বিশেষ দিন। প্রতিদিনই প্রমীলা সাতসকালে রেঁধে রেখে চলে যান নিউ আলিপুর। চাকরি বলে কথা। বেহালায় ঘরের কাছেও চাকরি পেতে পারতেন, অতটা নগ্ন হতে পারলেন না, লজ্জা করলো।

রামানুজ ভাবতে পারেননি নববর্ষে প্রমীলা বাড়ি থাকবেন।

—অঘটন তবে ঘটলো?

—অরা সব নিমন্ত্রন্ন খাইতে যাইব।

—যাক, একদিনের তো ছুটি মিলছে।

—তোমাগো', যারে কয় ইউনিয়ান দরকার। বৎসরভর ছুটি নাই, অসুখে পড়লে মেডিকেল নাই—

—তাই। ইউনিয়ানই দরকার।

দুজনেই খুব হাসেন। আজ সকালেই স্নান করেছেন রামানুজ। প্রমীলা রান্নাঘর থেকে এলে তবে দু'জনে একটু গল্প করবেন। রামানুজের বয়স পঁয়ষট্টি। প্রমীলার পঞ্চান্ন। এ বয়সেও দু'জনের ভাব খুব।

দু'জনে দু'জনের বন্ধু।

প্রমীলা এসে বসলেন।

—কি, ভাব কি?

—তোমার কথাই ভাবি।

—লও, বুড়া বয়সে মশকরা!

বল দেখি, আইজকার দিনে সকালে কি করলা?

—অ! সেই কথা!

—কও না!

প্রমীলা ছোট মেয়েটি হয়ে যান। হাসিতে মুখ আলো হয়ে যায়, টিপ জলজল করে।

—তবে বলতে পারি, যদি আরেকজন কয় সে সকাল হইতে কি কি করছে।

—তারে তো আরেকজন ধরাইয়া দিছে ফর্দ। সে মানুষ ছুটছে বাজারে।

—আমি বা বইয়া আছি না কি! ঘর সারছি, উঠান নিকাইছি, পূজা পাঠাইছি মন্দিরে।

—তারপর?

—দুইটা আখায় আগুন দিয়া সুকতা, তিতা ডাল, টকের ডাল, আম ঝোল, পাঁচ পদে ভাজা, পায়েস, ভাত কুন পদটা রাঁধি নাই?

—হ, এক হাতে সকল করছ না কি?

—না গো না, দুই জায়ে করছি।

—চিনুর বউ কুন পদটা করল?

—তার হাতের সুকতা য্যান পরমান্ন…

—আবু পরমান্ন য্যান অমর্ত।

—হ, বাসন্তী শিখছে ভাল।

—শিখব না? তার মায়ে কত বড় রাঁধুনি। মানুষে সম্মান দিয়া লইয়া যায় ঠাকরেনরে, তিনি বিয়া-পূজা-সাধ-পইতায় রাঁধে। ঘর দেইখা বউ আনছি।

—আর আমারে কি দেইখা আনছ?

—নিজেরে শুধাও। আমি তো জমির মামলা লইয়া উকিল বাড়ি গিছিলাম, কে বলল, বাবা! দুপার তাতে উনি খাইয়া লইয়া ঘরে যাউক না ক্যান্? কে বইসা পাখার বাতাসে ভাত জুড়াইয়া খাওয়াই ছিল?

—লও রে মানুষ। তাতেই বিয়ার পরস্তাব?

—বিয়ার পর বলি নাই? পূর্ব জন্মের বউ, মুখ দেইখাই চিনছি?

সইত্য খোকার মা! মনে হয় কত জন্ম তোমারে লইয়া ঘর করছি, এ জন্মেও পাইছি।

—বা, নিজের কাজের কথা বিস্মরণ?

—না গো! বড চিতলের পেটি। রুই, ইচা মাছ, আর যা ভাবতে পার না, সেই বিলের কই আনছি।

—আরেকজন তবু পান কিনে নাই?

—কিনছি গো কিনছি।

—তয় এখন আমি কি রাঁধি?

—চিতলের সইরষা ঝাল!

—ইশ্! এমুন তেলুকা চিতল, জিরা-চিতল রাঁধুম। জিরা সম্বারা। জিরা-মরিচ বাটা, জল মরব, ত্যালে মশলায় মাছ মইজা রইব।

—তয় তাই!

প্রমীলা যেন স্বপ্নলোকে চলে যান।

—পাকা রুই বটে, তয় জমাইয়া আদা-লঙ্কা-জিরা দিয়া কালিয়াই ভাল।

—গরম মশলা দিবা না?

—গরম মশলা বিনা কালিয়া হয়?

—আছে তো ঘরে?

—নিচ্চয়। আমার ভানভারে বৈয়মে বৈয়মে নাই কি?

—ইচা মাছ আইনা ভুল করলাম?

—কিসের ভুল? পুই চচ্চড়ি কি ইচা ছাড়া জমে? দেখ্‌ছি। খাওয়াইছ বরাবর, আমাগো মুখও হইছে তেমুন। চচ্চড়ি কও, লাউ কও, আঁইশ ছাড়া মুখে উঠে না।

—হ! তাতেই তো সকলে কয়, মাছের বাড়ি।

—কউক গা।

—কই মাছ কিন্তু বাসন্তীর হাতে ছাইড় না।

—না না, কই হইব সইরষা মাথা, যারে কয় পাতুরি। বাসন্তী পারে আমার মত?

—হইব, অর হাতও খুলব। অর মায়ের মাইয়া…

—বয়সই বা কি!

—পোলাপান গো আগে দিবা ত!

—একদিন ধর্ম ধরুক! বৎসরকার দিন একটা। আইজকার দিন যেমুন কাটব, বৎসর তেমুন যাইব।

—দেখ! রামরূপ, রামচিত্ত, সুষমা, ধর্ম ধরে কি না!

—অরাই তো সব নয়, মোহনরাও আইব।

—বল দেখি, কি চালের ভাত পাক করছ?

—আহা হা, নিরামিষ্যে গঙ্গাজলী, আমিষ্যে কনকশালী, তুমি বইলা দিবে আমাবে? আরেকজন আমারে ভাবে কি? ঘরে আনছিল পাকশালে বন্দী রাখব বইলা। অহন আমি পাকা রান্ধনী।

—ওই কথা বইল না খোকার মা। পাক করাইতে আনি নাই। বাপ নাই, মা নাই, পাক কইরা খাইতাম, ভাইরে খাওয়াইতাম, তুমি আইলা, আন্ধার ঘরে লক্ষীব পা পড়ল।

—এমুন ঘরে আইলাম, সীতার পতি কে? বইলা সান বউ হাসে, আমি কই জানি না।

—বংশেব নিয়ম! নামের আগে "রাম" চাই। বংশ যেমুন ছড়াইতে লাগছে, অত নাম মিলব?

—নিচ্চয়।

—আইজকার ভোজে কলাপাতা।

—সকলি জোগার আছে। আরেকজন আড্ডা দেউক, আমি পাকশালে যাই।

—পাকশালে যাইবা?—যাও।

দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে থাকেন, আর চেয়ে থাকেন রামানুজ আর প্রমীলার চোখে এখন কুয়াশা। দেশ ভাগের পর আসতে আসতে আরো কত বছর কেটেছিল ওঁদের দুজনের। প্রমীলার দেওর রামদেব চলে এসেছিলেন। মুর্শিদাবাদে, জমি ও বাড়ির সঙ্গে দেশের জমি ও বাড়ির বদলাবদলি করেছিলেন।

কিন্তু তা নিজের নামে।

রামানুজ তখনি চলে আসেন বেহালা। কাজও জোগাড় করেছিলেন উকিলবাবুর কাছে।

বাবার বোকামি দেখে রামরূপের ভক্তিশ্রদ্ধা চলে গিয়েছিল। ভীষণ রাগের, ভীষণ জেদের বশে বি-টেক করেই ও কানপুরে চলে যায় টেক্সটাইল মিলে।

রামরূপের বাড়ির নাম নেই। উয়ের নাম মার্গারেট মধু, মেয়ের নাম বাপ্টি। বাবা মার সঙ্গে যোগাযোগ ক্ষীণ, খুব ক্ষীণ।

—খোকার নামে পূজা দিছিলা?

—হ, ঘরেই লক্ষ্মীর আসনে…

—কতদিন ঘ্যান্ লিখে না…

—দু'বছর আগে মানি অর্ডারের কুপনে…

দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কলোনির বাড়িটির সামনে তিনটি দোকানের ভাড়াই সম্বল। প্রমীলা, পাড়ার রজতের সাহায্যে নিউ আলিপুরে এক বাড়িতে রান্নার কাজ করেন। স্বামী স্ত্রী আপিসে যায়, ছেলে যায় স্কুলে, প্রমীলা সাড়ে আটটায় পৌঁছে যান, ভাত রাঁধেন, ফ্রিজ থেকে রান্না বের করে গরম করেন, ছেলে ফেরে একটায়। তাকে খাওয়ান। নিজে খান। সকালে রাতের রান্না করেন। বিকেলে পরদিন সকালের রান্না।

দেড়শো টাকা মাইনে। নিজে একবেলা খান।

রজত বলেছিল, মাসিমা, আমি, মানে আপনার সুবিধের জন্যেই বলেছি, মানে স্বামী সামান্য কাজ করেন, ছেলেমেয়ে নেই…মানে এসব মিথ্যে কথা না বললে ··

প্রমীলা আস্তে বলেছিলেন, ঠিকই বলছ রজত! উনি তো ঘরে বসা, হাঁপানিতে কাতর…আর পোলা তো থাইকাও নাই। বছরে দু'বছরে কিছু টাকা পাঠাইল…

—কোনো খবরই নেয় না কেন?

—সেথাই কাম। বিয়া করল কুন দেশের নার্সকে…

—থাক গে। এরা খুব চেনাজানা।

—হ। বাচাইছ তুমি।

যেতে আসতে কষ্ট। কিন্তু পাড়ায় কাজ নিতেন কেমন করে? দেশে তো জমি ছিল, বিল ছিল। রামানুজ কত বড় বংশের ছেলে।

প্রথমে কান্না পেতো। কিন্তু এখন সয়ে গেছে। দোকান থেকে তিনশো পঞ্চাশ, তাঁর দেড়শো, খোকা যদি বাপের ওষুধ কেনার টাকাটাও দিত, কিন্তু অক্ষম, নির্বোধ, সরল বাপের ওপর খোকার এত রাগ এখনো কেমন করে থাকে? তার বয়সও তো ছত্রিশ হল।

দেওর মুর্শিদাবাদে গুছিয়ে নিয়েছেন। জমির দালালি করেন। ছেলে

চাকরি করে, মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন।

—কি ভাব ?

—না, ভাবি না।

—বৎসরকার দিন। ভাইব না।

—না, ভাবি না।

—ভাব কেন ? রুই, চিতল, ইলশা, খাইয়া তো লইছি। নূতন কাপড় পরাইছি, নিজেরাও পরছি···

—হ। লও, উঠ একটু।

—ক্যান্ ?

—নতুন বছর না ?

প্রমীলা একটা প্রণাম করেন রামানুজকে। রামানুজ ওঁর মাথায় হাত রাখেন।

প্রমীলা পুরনো দিনের মতো সকৌতুক হেসে বলেন, আসেন মশয়, সাত বেন্নন তৈয়ার।

প্রমীলার সেলাই করা পাড়ের আসনে বসেন রামানুজ। প্রমীলা ভাত বেড়ে দেন।

খেতে খেতে রামানুজ বলেন, রান্ধুনির গুণে রান্না! এই যে নিম ঝোল পাক করছ, বিউলির ডাল, আঃ, সম্বরার সুবাস কি! আবার পাট শাকের বড়া ? যারে কয় ভোজ!

প্রমীলা হেসে বলেন, পাক ভাল হইছে ?

রামানুজ শীর্ণ মুখ তুলে হেসে বলেন, অমৃত।

এটুকু হাসি মুখে আনতে দুজনেরই বড় পরিশ্রম হয়। তবু প্রমীলা হাসেন। বলেন, হাসনের উপায় কি! হাসতে গেলে চক্ষে জল পরে। দুঃখে নয় গো, হাসিতে অমুন হয়।

—হ, হাসতে হাসতে—

রামানুজ কথা থামিয়ে মাথা নিচু করে বড বড় গ্রাসে ভাত খান। বলেন, দুপারে তুমি ঘরে আছ, তপ্ত ভাত খাইতেছি, এ যে কত বরো প্রাইপ্য তা ভাইও বুঝল না, পোলাও না। অরা ভাবে আমার কিছু নাই, আমার যা আছে—

—হ, সাত রাজার ধন যারে কয়···

নয়তো কি? ডাকাইতের এ ধন হরণ অসাইধ্য…দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে থাকেন। সময়টি জাদুমন্ত্রে বাঁধা পড়ে। তারপর, জোর করে ঘোর কাটাতে প্রমীলা বলেন, আ রে পুরুইযা! সম্পদের গর্ব কর! আমার কি আছে তা যদি জানতা…

দুজনে একসঙ্গেই হাসেন। আর হাসতে গেলে চোখে জল পড়বে তাও তো জানা কথা।

দুজনের শীর্ণ গালে মুক্তো ঝরে যায় অঝোরে।

———



তৃপ্তি মিত্র

—'আপনি এতদিন এখানে এসেছেন, একদিনও সাঁতার কাটতে নামলেন না তো ?' বারান্দার এক কোণে একটা বেতের চেয়ারে ম্লান ক্লান্ত চোখে সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসেছিল যে মেয়েটি কিংবা মহিলা, তাকে চমকে দিয়ে এই স্বাস্থ্যে ভরপুর আর খুশীতে উজ্জ্বল যুবকটি প্রশ্ন করে বসল।

—'ওঃ, আপনি ! সাঁতার খুব একটা ভাল জানি না।'

—'খুব একটু কম ভাল জানেন তো !'

—'তা জানি।'

—'তবে ভয়টা কিসের ?'

—'ভয় না, সঙ্কোচ।'

—'কিসের ?'

—'শাড়ী পরে ঐ একটু ডুবই দেওয়া যায়, তার বেশী—'

—'কসটিউম আনেননি ?'

—'হ্যাঁ। না মানে ভাবছিলাম—'

—'পোশাক এনেছেন অথচ—'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল যুবক।

—'ঠাট্টা করছেন নাকি ?'

—'নাঃ, একেবারেই না। ভাবছি নিজেকে কি বঞ্চিতই করছেন !'

—'একলা এসেছি—মানে তাই খুব—না একটু সঙ্কোচ।'

—'চলুন না এই দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর। বীচ একদম ফাঁকা থাকবে।'

—'আমাকে ভাল করে শিখিয়ে দেবেন তো?'

—'শেখাব।'

স্থানটা ধরা যাক পুরীর সমুদ্রপারের কোন হোটেল। আর সময় এই বেলা দশটা কিম্বা এগারটা।

—'আপনি খুব ভাল সাঁতার কাটেন। আপনি যখন ব্রেকার পার হয়ে চলে যান—সবাই আশ্চর্য হয়ে যায়।'

—'আপনি?'

—'বাঃ রে! আমিও তো সবার মধ্যেই!'

—'আপনার ব্রেকার পার হতে ইচ্ছে করে?'

—'খুব, কিন্তু—'

—'কি, কিন্তু?'

—'আমি যতটুকু সাঁতার জানি—তাতে কোনদিনই তো সম্ভব হবে না!'

—'এই যে বললেন আমার কাছে শিখবেন?'

—'এতটা কি শিখতে পারব যে এত বড় বড় ঢেউ পেরিয়ে—'

—'আমি কেমন সাঁতার কাটি?'

—'বললাম তো এখুনি।'

—'তাহলে হয়তো শেখাতেও পারব ভাল! কি, বিশ্বাস হচ্ছে না?'

—'আমি কেমন ছাত্রী তা তো জানি না!'

—'দেখা যাক! আপনার নাম?'

—'পার্বতী—পার্বতী সরকার।'

—'আমার—সতীন্দ্র সোম।'

দুপুরের রোদে সমুদ্রপারের বালি এমন তেতেছে পা ফেলা দায়। ওরা দুজনে দাঁড়াল এসে, যেন স্কুল পালিয়ে এসেছে। আকাশের ঠিক মাঝখানে সূর্য তখন। সমুদ্রের ধারে আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই।

—'আশা করি, শাড়ীর নীচে সাঁতারের পোশাকটা পরে এসেছেন?'

—'হ্যাঁ।' পার্বতী লজ্জিত হল।

—'আমি সমুদ্রে নামছি। আপনি শাড়ীটারিগুলো পুঁটুলি পাকিয়ে এই চালাটার কাছে রেখে চলে আসুন। ভয় নেই, কেউ নেবে না!'

জোয়ারের সময়। পূর্ণিমাও খুব কাছে এসে গেছে নিশ্চয়ই। তাই

ঢেউগুলো যখন প্রায় একতলা সমান উঁচু হয়ে ছুটে আসছে, পার্বতী অনেক আগে থেকেই চোখ বন্ধ করে ফেলছে। সতীন্দ্র পার্বতীর ভয় দেখে হাসছে। তারপর হাত ধরে একসঙ্গে ডুব দিচ্ছে। ঢেউ ওদের ওপর দিয়ে গিয়ে আছড়ে পড়ছে বালির ওপর।

—'ওঃ, আপনি ডগ সুইমিং ছাড়া কিছুই জানেন না!'

—'তাহলে তখন কি বললাম আপনাকে!' লজ্জিত হয়ে উত্তর দিল পার্বতী।

—'এই দেখুন আমি কেমন করে সাঁতার কাটছি। লক্ষ্য করুন ভাল করে।'

—'ঢেউ এসে গেছে যে!'

—'ডুব দিন তাহলে।'

জল থেকে মাথা তুলে পার্বতী বললে—'নাঃ আমার দ্বারা হবে না।'

—'সত্যি হবে না, এত ভয় পেলে কিছু হয়? নিন্ আমার হাত ধরে চেষ্টা করুন।'

চলল চেষ্টা। সূর্য হেলেছে পশ্চিম দিকে, আকাশের দিকে তাকিয়ে পার্বতী বলল,—'চলুন এবার। এক্ষুনি তো একে একে টুরিস্টদের ভিড় শুরু হয়ে যাবে।'

—'যান আপনি উঠুন আগে। ঐ শাড়ী-টারিগুলো জড়িয়ে নিন, আমি আসছি।'

পার্বতী যখন উঠে এল সেই চালাটার কাছে তখনও সমুদ্রতীর প্রায় তেমনি নির্জন, সমুদ্র তেমনি উদাসীন। অনেক দূরে দু-একজন নুলিয়াকে দেখা যাচ্ছে। ভাল লাগছে পার্বতীর, খুব ভাল লাগছে। অবগাহন স্নান। মুক্ত স্নান। সত্যি ভাল সাঁতার না জানলে যেন সমুদ্রকে ভালবাসা যায় না। সমুদ্রকেই তো কতদিন ধরে ভালবাসতে চেয়েছে পার্বতী।

—'চলুন!' পেছন থেকে বলে উঠল সতীন্দ্র; অবশ্য দুজনকে যে একসঙ্গেই ফিরতে হবে হোটেলে এমন কোন কথা নেই।

—'বরং না ফেরাই ভাল।' বললে পার্বতী।

—'ভয় করছে কে কি বলবে?'

—'সত্যি! এখানে কেউ আমাকে চেনে না, আমিও কাউকে চিনি না। এ আজ আসছে কাল চলে যাচ্ছে। আমিও তো আর কয়েকদিনের মধ্যেই চলে যাব। তবু দেখুন এত ভয়!'

—'বাঙালী মেয়ের বিশেষত্ব! একলা এসেছেন কেন?' একটু কি চটে উঠল সতীন্দ্র।

—'আজ বিকেলে আর সাঁতার কাটতে আসবেন না?' প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল পার্বতী।

—'আপনি হোটেলে ফিরে যান, আমি বিকেলের সাঁতারটা সেরে একেবারে ফিরব।'

ফিরে চলল সতীন্দ্র সমুদ্রে।

ডাইনিং রুমের একেবারে একটা কোণে রোজ একলাই খেতে বসে পার্বতী। আজও এসে বসল। এর আগে ওর সঙ্গে কেউ আলাপ করতে আসেনি। সাতদিন ও এসেছে এখানে, বয়স হল ত্রিশ-বত্রিশ। আর ও যে এ্যাট্রাকটিভ নয় সে কথা ওর চেয়ে বেশী আর কে জানে? তাই কেউ আলাপ করতে আসেনি বলে ও আশ্চর্যও হয়নি। আর নিজে তো পারেই না কারো সঙ্গে আলাপ করতে। ও একা এসেছে, একা ছাড়া ওর উপায় ছিল না। একা আসা ওর দরকার ছিল। ডাইনিং রুমে এসে কোন দিকে তাকায়ও না কোনদিন। আজ চারদিকে চেয়ে ও সতীন্দ্রকে খুঁজল। না, কোন টেবিলে সতীন্দ্র নেই। তবু ঢোকবার সময় বা বেরুবার সময় যেটুকু দেখেছে ঐ উল্টোদিকের কোণের টেবিলটাতেই তো দেখেছে। এখনও আসেনি বোধহয়। অনেক লোক খাওয়া শেষ করে চলে গেল। অনেক নতুন লোক এল। অনেক বিদেশীও আছে এর মধ্যে, তারা ভারতবর্ষের এই বিখ্যাত বীচ দেখতে এসেছে। আর এসেছে কোনারকের মন্দির ইত্যাদি দেখতে। আবার কিছু লোক আসে হয়তো কেবল মদ খাবার জায়গা বদলাতে। সামনের ঐ দুটো লোককে তো পার্বতী যখনই দেখেছে মদের গ্লাস ছাড়া দেখেনি। পার্বতীর খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এল। কই, সতীন্দ্র এখনও এল না তো! ক্রমে ডাইনিং রুম ফাঁকা হতে লাগল। রাত ন'টা বেজে গেছে, খাওয়া শেষ করে পার্বতী তবু বসে রইল। শেষ দু'চারজন যারা ছিল তারাও উঠল। মাতাল দুজনও। পার্বতী উঠে পড়ল।

সতীন্দ্র সারা সন্ধ্যেটা ঘরে বসে রইল, একটু মদ খেল, চিঠি লিখল দেবলীনাকে। লিখেছিল পার্বতীর কথা। কেমন একটা মেয়ে—সতীন্দ্রর চেয়ে হয়তো সামান্য বড়ই হবে বয়সে, কেমন বিষণ্ণ হয়ে বসে থাকত লাউঞ্জে। সমুদ্রের ধারে

কেমন অদ্ভুতভাবে শাড়ী জড়িয়ে জড়িয়ে পরে বিষণ্ণ হয়ে বসে অন্যের সাঁতার কাটা দেখত। তাকে আজ সতীন্দ্র জোর করে সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে কেমন বদলে দিয়েছে প্রায়। চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলল সতীন্দ্র। এমনি আবার চিঠি লিখল। সাঁতার কাটতে গিয়ে, বিছানায় শুয়ে, ডাইনিং রুমে খেতে খেতে কখন না মনে পড়ে দেবলীনাকে? আজ দেবলীনার যে চিঠিটা পেয়েছে, খুব মিষ্টি চিঠি। দেবলীনার ঠোঁটের মত। মাকেও একটা চিঠি লিখল সতীন্দ্র। মায়ের দেবলীনাকে পছন্দ নয়। বড্ড বেশী সুন্দরী, বড্ড বেশী কথা বলে আর বড্ড বেশী সিগারেট খায়। মাকে মানবে না। এখন মা যদি প্রি-হিস্টরিক যুগে পড়ে থাকতে চায় আই কাণ্ট হেল্প—ভাবল সতীন্দ্র। দেবলীনাকে কেন্দ্র করেই মা আর সতীন্দ্রর বন্ধুত্বে একটা চিড় খেয়েছে। মাকে ভালবাসে ও, বাড়িতে থাকলেই সব সময় মায়ের বিষণ্ণ মুখ দেখতে হবে। তাই অফিস ছুটি নিয়েছে। যদিও ওর পজিশনের অফিসারের ছুটি নেওয়া মুস্কিল ছিল। মাকে একটা অজুহাত দেখিয়ে এখানে চলে এসেছে সতীন্দ্র। মাকেও লিখতে গেল পার্বতীর কথা, লিখল না। লিখল—

মামণি,

'দেখ দেবলীনা খুব খারাপ বউ হবে না। মামণি, দোহাই তোমার, তুমি খুশী হও।'

তারপর বেয়ারাকে ডেকে ঘরেই খাবার দিতে বলল। আর খেতে খেতে ভাবল পার্বতীকে। এমনি কেমন জড়ভরত লাগে পার্বতীকে। সাঁতারের পোশাকে কিন্তু মোটেই সেরকম লাগছিল না। অমন বিশ্রীভাবে থাকে কেন মেয়েটা?

—'কি, কি ভাবছেন একলা বসে বসে? আরে ব্বাস! গলায় একটা মাফলার জড়িয়েছেন কেন?' আজও প্রায় পার্বতীকে চমকে দিয়েই জিজ্ঞাসা করল সতীন্দ্র। আজও বারান্দার কোণে সেই বেতের চেয়ারটায় গুটিশুটি হয়ে বসেছিল পার্বতী।

—'একটু সর্দি-সর্দি লাগছে।'

—'প্রথম দিনের পক্ষে খুব বেশীক্ষণ জলে ছিলেন তো, তাই ওরকম মনে হচ্ছে। আজ দেখবেন ঠিক হয়ে গেছে। দুপুরে আসছেন তো?'

—'আসব?'

—'বাঃ, তা নইলে যা শিখেছেন সব তো ভুলে যাবেন।'

—'কাল আপনাকে ডাইনিংরুমে দেখলাম না।'

—'ঘরে বসেই ডিনার সেরে নিলাম। তাছাড়া দুটো দরকারী চিঠি লেখবার ছিল।'

—'বাড়িতে?'

—'হ্যাঁ।'

পার্বতী আর কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। হোটেল ঝেঁটিয়ে সবাই গেছে বেলাভূমিতে। হয়তো কিছু মাতাল এখনও ঘুমিয়ে সমুদ্র-স্বাদ অনুভব করছে। কে জানে? দূরে বেয়ারারা ব্রেকফাস্টের জন্য টেবিল সাজাচ্ছে। সতীন্দ্র সমুদ্রের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

—'আপনি আজ সকালে সাঁতার কাটতে গেলেন না?' অবশেষে বলল পার্বতী।

—'নাঃ, কাল চিঠি লিখতে দেরি হল, তাই খেতে দেরি, ঘুমুতে দেরি, আর আজ উঠতে দেরী। যাকগে দুপুরে পুষিয়ে নেওয়া যাবে।'

—'ওখানে সকলে আপনাকে মিস করবে। অনেকেই আপানার ব্রেকার পার হওয়া দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে থাকে।'

—'কেন? অনেকেই তো পার হয়।'

—'কজন আর? বিশেষ করে আপনার মত রোজ রোজ?'

—'তাহলে আজ বিকেলে দুটো ব্রেকার পার হব!'

পার্বতী সতীন্দ্রর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর বললে—'আপনার পক্ষে মোটেই শক্ত নয়।'

—'কত ভোরে উঠেছেন? সূর্যোদয় দেখেছেন?'

—'না, আজ দেখিনি।'

—'এসেই গোড়ার দিকে খুব দেখে নিয়েছেন বুঝি? সকলেই তাই করে অবশ্য। প্রথমে যে উৎসাহটা থাকে—'

—'না, আরও অনেকদিন আগে, অনেকবার অন্য সমুদ্রের মাঝখান থেকে।'

—'অন্য সমুদ্র?'

—'আরব উপসাগর।'

—'কোথায়?'

—'বম্বেতে।'

—'বম্বেতে বেড়াতে গিয়েছিলেন?'

—'না ওখানে থাকি, মানে…'

—'আশ্চর্য তো, আপনি বম্বে থেকে বেড়াতে এসেছেন এখানে! অথচ আশে-পাশে যে সমস্ত দ্রষ্টব্য আছে সে-সবও তো একদিন দেখতে গেলেন না!'

পার্বতী হাসল।

—'চিঠিগুলো পোস্ট করবেন না?'

—'ওঃ হ্যাঁ, ঠিক মনে করিয়ে দিয়েছেন তো! যাই বাক্সে ফেলে দিয়ে আসি। ভুলে গেলে ওদিকে আবার…।' সতীন্দ্র দ্রুত চলে যায়।

মেঘে সূর্যটা ঢাকা পড়েছে। সমুদ্রের জল কালো মেয়ের কালো চোখের মত গহীন কালো আর অদ্ভুত হয়ে উঠেছে যেন।

—মাত্র চারদিনে এতটা উন্নতি হবে ভাবিনি কিন্তু আমি।' বললে সতীন্দ্র।

ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে সতীন্দ্র ভেজা বালির উপর। পার্বতীও ক্লান্ত, শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে ওরও। কিন্তু কেমন দেখাবে? তাই জোর করেই দুই হাত দিয়ে দুটো হাটুকে বুকের কাছে চেপে ধরে বসে আছে ও। মুখ তুলে বললে—'সবটাই আপনার কৃতিত্ব।'

—'কাল গোড়াতে এসেই আপনাকে ব্রেকার পার করাব।'

—'পারব?'

—'সব সময় এত ভয় পান কেন বলুন তো? এত ভয় পেয়ে পেয়ে এত বড়টা হলেন কি করে ভাবছি।'

—'বলুন এমন বুড়োটি হলেন কি করে—'

—'ফের যদি আপনি নিজেকে বুড় বলেন, তবে—'

হাসল পার্বতী।

—'বম্বেতে থাকেন তো জুহুতে গিয়ে সাতার শেখেননি কেন?'

—'অসুবিধে ছিল।'

—'ও! মা-বাবা পছন্দ করেন না?'

—'ঐরকম সব আর কি!'

এবার ঢেউটা এসে প্রায় ওদের গায়ের ওপর ভেঙে পড়ল।

—'আমাদের আর একটু পেছিয়ে বসতে হবে বোধহয়। নইলে এর পরের ঢেউটা এসে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে সমুদ্দুরে। বললে পার্বতী।

সতীন্দ্র উঠে বসল। মেঘ আরও কালো হয়ে এসেছে। সমুদ্রও। পার্বতী

চেয়ে আছে সমুদ্রের দিকে। সতীন্দ্র পার্বতীর দিকে। কিন্তু ভাবছে দেবলীনার কথা। দেবলীনার চিঠির কথা। অদ্ভুত মেয়ে এই দেবলীনা। লিখেছে,

'সেদিন মিসেস সোম-এর সঙ্গে একটা পার্টিতে—' আমার মাকে এখনও দেবলীনা মিসেস সোম বলে কেন? ভাবল সতীন্দ্র। 'মিসেস মল্লিকের সঙ্গেই কথা বলছিলেন অবশ্য—মেয়েদের সিগারেট খাওয়া নিয়ে ছোটখাটো একটা বক্তৃতাই দিয়ে ফেললেন। বুঝতেই পারছ, আসল লক্ষ্য ছিলাম আমি। সন্তু, আমি তোমাকে বলছি এসব আমার ভাল লাগে না। আমি স্ট্রেট ব্যবহার ভালবাসি। আর সেইজন্যই আমার মনোভাব আমি তোমাকে খুলে বললাম। ডার্লিং, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না। সিগারেট ছাড়াও। সন্তু ডার্লিং, যেদিন আমাকে তুমি তোমার ভালবাসার কথা প্রথম বলেছিলে মনে পড়ে? সেদিনও সিগারেটের ধোঁয়ার মাঝখানেই তোমার কথা শুনে আমি রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম।......'

সেদিন ছিল টুসকীর জন্মদিনের পার্টি। টুসকী দেবলীনার ছোট বোন। দেবলীনা কেমন করে একবার সতীন্দ্রর দিকে তাকিয়ে উঠে গিয়েছিল ছাতে। আর তখনই জীবনের একটা পরম প্রতিশ্রুতির কথা ঘোষণা হয়েছিল, ওপরে ছিল তারা আর এককালি চাঁদ। দেবলীনার গায়ে ছিল বিলিতি সেন্টের গন্ধ। বাতাসে দামী সিগারেটের ধোঁয়া। সব মিলিয়ে অদ্ভুত মাদকতার সৃষ্টি হয়েছিল। সত্যি তো, সেদিন একটুও খারাপ লাগেনি দেবলীনাকে। বরং···। তবে? মা, মা তোমাকে মেনে নিতে হবে। ভাবল সতীন্দ্র।

পার্বতীর মা কলকাতা থেকে চিঠি দিয়েছেন।—'পারু, তোর ডিভোর্স নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। দীপনারায়ণ একতরফা ডিগ্রী পেয়েছে। আমি বলি, এ ভালই হল। জানি এমনিতে তোর মন খারাপ হবে না। তবু যখন সব ভেঙে যায় মেয়েদের, হাজার হলেও একবার মন খারাপ হবেই হবে। একটু কাঁদবেই কাঁদবে। তুই জেদ করে চলে গেলি বেড়াতে। তাই মাঝে মাঝে একটু ভয় করছে। কাল-পরশুর মধ্যে রওনা হয়ে চলে আয় কলকাতায়। দীপনারায়ণ কি কাজে কলকাতায় আসছে লিখেছে। তোকে কিছু টাকা দিতে চায়। এখন টাকার কিরকম দরকার বুঝিস তো! গোঁয়ার্তুমি করে টাকাটা নিবি না বলিস না যেন! হ্যাঁ, তোর বড় মাসী তোর একটা চাকরি ঠিক করেছে। ওদেরই কিণ্ডারগার্টেন সেখানে পড়াতে হবে। ভাল করে খাচ্ছিস তো?'

সতীন্দ্রর মা লিখেছে…'সাঁতার তোর নেশা। কিন্তু লক্ষ্মী সমু, বেশী দূরে যাস না জানি। তুই সাবালক। নিজে রোজগার করছিস। দুদিন পরে বিয়ে করবি। তবু আমার কাছে তুই ছোট্ট সমু।'…ওঃ মাগো, দয়া করে আমাকে আর ছোট্ট করে রেখো না মা…

—'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি।' আবৃত্তির ভঙ্গীতে বলে উঠল সতীন্দ্র।

পার্বতী চমকে জিজ্ঞাসা করল—'কি হল?'

—'উচ্ছ্বাস!' হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল সতীন্দ্র।

খিলখিল করে হেসে উঠে পার্বতী বললে—'অভিনব উচ্ছ্বাস। নির্জন সমুদ্রের ধারে বসে রবীন্দ্রনাথের আর কোন কবিতার লাইন খুঁজে পেলেন না!'

—'স্কুলের কমপিটিশনে ঐ একটা কবিতাই মুখস্থ করেছিলাম যে, তাই সমুদ্রে পাহাড়ে জঙ্গলে ঐটেই সম্বল।'

একটা ঢেউ এসে ওদের ওপর ভেঙে পড়ে হিড়হিড় করে ওদের খানিক টেনে নিয়ে গেল সমুদ্রের দিকে—হেসে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল দুজনে সরে এল পারের দিকে।

—'চলুন ফেরা যাক।' বললে সতীন্দ্র।

—'আর একটু বসি না!' বললে পার্বতী।'

—'বসবেন? ঢেউগুলো কি রকম উঁচু হয়ে আসছে দেখেছেন? আজ কি পূর্ণিমা?'

—'না কাল পূর্ণিমা হয়ে গেছে।'

—'আজও তাহলে খুব চাঁদের আলো থাকবে।'

—'আসবেন ডিনারের পর?'

—'আজ চাঁদের আলোতে হোটেলসুদ্ধ লোক উপস্থিত থাকবে কিন্তু এখানে।'

—'থাকুকগে!'

—'পাছে লোকে কিছু বলে—ওটার কি হবে?'

হাসল পার্বতী।

বৃষ্টি শুরু হোল টিপটিপ করে, সমুদ্র হোল ঝাপসা।

—'রাতে চাঁদ উঠবে তো?' বলল সতীন্দ্র।

—'এ মেঘ কেটে যাবে মনে হয়।'

—'যাই, হোটেলে চিঠি লেখার পর্বটা শেষ করে ফেলিগে তাহলে বেলাবেলি।'

—'আপনি কি রোজই চিঠি লেখেন?'

—'রোজই।'

—'কাকে এত লেখেন?'

—'একজনকে কথা দিয়ে এসেছি যে রোজই চিঠি দেব।'

—'ও:।'

—'একদিন চিঠি না দিলে হয়তো এমন কাণ্ড করে বসবে!'

—'ও:।'

—'ভয় যখন কেটেছে, আসুন না ডিনারটা একসঙ্গে সারা যাক দুজনে।'

—'বেশ তো।'

—'আমি তাহলে এগোই—'

—'আসুন— আমিও উঠব এখনই—।'

—'আমি আপনাকে আপনার ঘর থেকে ডেকে নিয়ে যাব খাবার আগে—' যেতে যেতে বলল সতীন্দ্র।

আবার একবার সমুদ্রে ডুব দিতে ইচ্ছে হল পার্বতীর। আর একবার অবগাহন করি, ভাবল ও?

একটু সাজল পার্বতী। আইব্রাও পেন্সিলে চোখ আর ভুরু আঁকল। ভুরুটা বড্ড পাতলা সত্যি। লিপস্টিক লাগাল ঠোঁটে। হাল্কা নীলের ওপর লাল সুতোর এমব্রয়ডারী করা শাড়ি পরল। সঙ্গে হাতকাটা একটু গাঢ় নীল ব্লাউজ। ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে নিজেকে দেখতে লাগল পার্বতী। আসছে কেন সতীন্দ্র এখনও?

চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল সতীন্দ্র খাটের ওপর। দুই করতলের ওপর রাখল মাথা। পরেছে ক্রীম রং-এর প্যান্ট। গায়ে মেরুন রং-এর শার্ট। যদিও সমুদ্রস্নানে একটু কালো হয়েছে তবু মেরুন রং-এর পাশে ওর ফর্সা রং উজ্জ্বল হয়েই জানান দিচ্ছে। সেজেগুজে বের হবার মুখেও কি মনে করে শুয়ে পড়ল। তাকিয়ে রইল খাটের পাশে ছোট্ট টেবিলে রাখা দেবলীনার ছবিটার দিকে। আসবার সময় ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেবলীনাই ছবিটা দিয়ে দিয়েছিল সতীন্দ্রকে। সতীন্দ্র ভাবল, এ কি করছি। এতটা কি ঠিক হচ্ছে? পার্বতী যদি অন্য কোন আশা

পোষণ করে থাকে? কিন্তু কেনই বা করবে? আজ পর্যন্ত এমন কোন ব্যবহার আমি করিনি যাতে করে কোনরকম ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে! এক নং—মিঃ সরকার ছাড়া অন্য কিছু বলে ডাকিনি। দুই নং—ভুলেও তুমি বলিনি। সেদিন যখন স্ট্রোকটা কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারছিল না তখন তো মনে হয়েছিল একবার বলি, তোমার দ্বারা কিছু হবে না। তুমি কেটে পড়।—তখনও মুখে বলেছিলাম, আপনার মত মাথা মোটার দ্বারা কিস্সু হবে না, তুমি বলিনি। তিন নং—দরকার ছাড়া একবারও হাত ধরিনি বা ছুঁইনি। চার নং—এমন কথা বলিনি—চলুন না শহরে দোকানে গিয়ে কিছু কেনাকাটা করি। পাঁচ নং—দোকান থেকে কিনে এনে একটা জিনিসও উপহার দিইনি। অথচ এর মধ্যে আমি চার-পাঁচবার দোকানে গেছি, ঘুরে ঘুরে দেখেছি। মায়ের জন্য, দেবলীনার জন্য, এমন কি বাড়ির বাচ্চা চাকরটার জন্যও বেশ কয়েকটা জিনিস কিনেছি। তবে শো-কেসে এদেশী একটা তাঁতের মালটিকালার শাড়ী দেখে মনে হয়েছিল যে শাড়িটাতে পার্বতীকে মানাবে ভাল। এই মাত্র। তবে? আমার মন পরিষ্কার। অস্ফুটে বলে উঠল সতীন্দ্র। ভালই হয়েছে, ফিরে এসেই দেখা হয়েছিল ছেলেবেলার বন্ধু সমর-এর সঙ্গে। এসেছে ভুবনেশ্বরে, অফিসের কি একটা কাজে। সেখান থেকে বেড়াতে এসেছে পুরীতে। অফিসেরই কার সঙ্গে যেন, আছে টুরিস্ট লজে। জোর করে কথা আদায় করে নিয়েছে সমর, কাল সমরের সঙ্গে যাবে কোনারক দেখতে। সেইমত ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। কই, পার্বতীকে ছেড়ে যেতে হবে বলে একটুও কষ্ট হচ্ছে না তো! তবে?

মায়ের চিঠিটা আবার পড়তে বসল পার্বতী। দীপনারায়ণ আসছে কলকাতায়, দীপনারায়ণ শাঠে। পার্বতীর বাবা গিয়েছিল সপরিবারে বম্বেতে। অফিসেরই কাজ উপলক্ষ্যে। ঐ অফিসেরই এক ক্ষুদে অফিসার ছিল তখন দীপনারায়ণ, আলাপ হল। জুহুবীচে বেড়ানো, দীপনারায়ণ হল পার্বতীর দীপ। দীপ! তারপর বিয়ে। জুহুতেই ছিল ওদের বাড়ি। দীপ আর সমুদ্র, সমুদ্র আর দীপ দুই-ই হয়ে উঠল পার্বতীর নেশা, দীপ চাকরি ছেড়ে ব্যবসা শুরু করল। বাড়তে লাগল ব্যবসা। প্রায় প্রত্যেক রবিবার বম্বে থেকে দীপের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজন আসত সমুদ্রস্নানের জন্য। পার্বতীকে রাঁধতে হোত। কতরকম রান্নাই শিখেছিল পার্বতী! একদিন দীপের বন্ধুবান্ধবই জোর করেছিল ওদের সঙ্গে সাঁতার কাটতে হবে বলে। সাঁতারের পোশাক পরে গিয়েছিল সমুদ্রে। সেদিন খুব ভাল লেগেছিল ওর। ওরা সবাই সন্ধ্যেবেলা বিদেয় হবার

পর দীপ বলেছিল, 'ঐ পোশাক তুমি না পরলেই পার! ঐরকম সরু সরু পায়ে ভাল লাগে না তোমাকে।' লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল পার্বতীর। সত্যি, বসন্ত-র বউ উষা বা বিজয়ের বোন সুমিত্রার মত অত ভাল গড়ন তো পার্বতীর নয়। তাই পার্বতী বালুর ওপর বসে ওদের চান দেখত। আর দেখতো সমুদ্র। দীপনারায়ণের বিজনেস বাড়ল। সমুদ্র দেখা কমল। তাই একলাই বসে বসে সমুদ্র দেখত পার্বতী। আর ভালবাসত। ঢেউগুলোকে ভালবাসত। চিঠিটা পড়ে রয়েছে সামনে। একতরফা ডিগ্রী হয়েছে। পার্বতীর নামেই এ্যাডালটারীর কেস এনেছিল দীপনারায়ণ। হায় রে! পার্বতী কথা দিয়েছিল কোর্টে উপস্থিত হবে না। হয় নি। আজ পার্বতীর মুক্তি। মা লিখেছে, ও কাঁদবে। না, একটুও কান্না পাচ্ছে না তো! বরং ভাল লাগছে, খুব ভাল লাগছে। মুক্তির স্বাদটা চেখে চেখে দেখতে ইচ্ছে করছে। এখুনি আর একবার সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে সে। কিন্তু সতীন্দ্র আসছে না কেন? আটটা বেজে গেল। অনেক আগেই চাঁদ উঠে গেছে। ঢেউগুলো ভাঙছে আর চাঁদের আলোতে চিক চিক করছে নিশ্চয়ই। সতীন্দ্র সাঁতার কাটলে ওর চেয়ে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে, সেই প্রথম দিন থেকেই। সতীন্দ্র কাকে এত চিঠি লেখে? প্রেমিকা? হবেই বা না কেন? যাকগে! হোটেলের ম্যানেজারকে বলেছে, কাল বা পরশুর মধ্যে কলকাতা ফিরে যাবার টিকিট করে দিতে। সতীন্দ্র কি ভয় পেয়েছে? কি আশ্চর্য! কাল বা পরশু তো চলেই যাচ্ছি আমি। নাঃ, ওর ভয়টা ভেঙে দেওয়া উচিত। আমার কোন কুমতলব নেই রে বাবা!

উঠে পড়ল পার্বতী।

—'কাম ইন, শুয়ে শুয়েই বলল সতীন্দ্র। আর পার্বতীকে দেখে প্রা লাফিয়ে উঠে পড়ে বলল—'আরে আপনি!'

—'বেশ লোক তো আপনি!' বললেন আমাকে ডেকে নিয়ে ডিনার খেতে যাবেন, আর—'

—'এই তো যাচ্ছিলাম।' নিজের ছেড়ে রাখা আণ্ডারঅয়্যার ইত্যাদি তোয়ালে দিয়ে চাপা দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সতীন্দ্র।

—'কার ছবি ওটা?'

—'ওই যাকে রোজ চিঠি লিখতে হয়।'

—'খুব সুন্দর দেখতে তো?'

—'তা ঠিক।'

—'আপনি ভাগ্যবান।'

—'তা ঠিক। চলুন।'

খাওয়ার শেষে সিগারেট ধরাতে গিয়ে কি মনে করে সিগারেট কেসটা এগিয়ে দিল সতীন্দ্র পার্বতীর দিকে।

—'ধন্যবাদ, আমি সিগারেট খাই না।'

—'ওঃ! কিন্তু খান না কেন?'

—'খাইনি কোনদিন। আর মেয়েরা মানে আমাদের দেশের মেয়েরা সিগারেট খাচ্ছে আমার কেমন ভাবতে ভাল লাগে না।'

—'এটা তো একটা কুসংস্কার!'

—'ভাল কুসংস্কার।'

—'তার মানে যে সব মেয়েরা সিগারেট খায় আপনি তাদের খারাপ বলবেন!' রেগে উঠে বলে সতীন্দ্র।

'হঠাৎ এত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কেন? আমি কি তাদের খারাপ বলেছি? আপনি জিজ্ঞাসা করলেন কেন খাই না, তাই আমার ধারণার কথাটা আপনাকে বললাম। বম্বেতে অনেক মেয়েকে আমি সিগারেট খেতে দেখেছি। তাদের মধ্যে অনেকেরই গলা কেমন হোর্স হয়ে গেছে।'

—'অনেকেরই, সকলেরই যে ওরকম হবে তার কোন মানে নেই।'

—'তা অবিশ্যি নেই।'

—'আপনার বিয়ের পর আপনার স্বামী যদি চান আপনি তাঁর সঙ্গে ড্রিঙ্ক করুন, সিগারেট খান, তাহলে আপনি তা করবেন না?'

—'বড্ড মুস্কিলেই ফেললেন দেখছি, কি উত্তর দিই বলুন তো আপনাকে? মানে— আমি—মানে আর বিয়ে করব না ঠিক করেছি।'

—'আর—মানে? বয়স হয়ে গেছে ভাবছেন?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে পার্বতী বললে—'আপনার বৌকে যে আপনি সিগারেট আর মদ ধরাবেন সে বিষয়ে এ্যাটলিস্ট কোন সন্দেহ নেই।' হাসল পার্বতী।— 'দেখেছেন ডাইনিং-রুম ফাঁকা হয়ে গেছে সবাই সমুদ্র দেখতে চলে গেছে।'

—'আমাদেরও তো যাবার কথা ছিল।' বলল সতীন্দ্র।

—'তাহলে এরকম বাজে ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া না করে চলুন তাড়াতাড়ি।

—'চলুন। আপনি কিন্তু এই ক'দিনেই খুব স্মার্ট হয়ে গেছেন। তা

গোড়ার দিকে অমন দুঃখী-দুঃখী ভাব করে বসে থাকতেন কেন ?'

পার্বতী হাসল।

সমুদ্রের ধারে এল দুজনে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে কত লোকই দেখছে চাঁদ আর সমুদ্র। কত বয়সের কত রকম লোক। হাঁটতে হাঁটতে একটু দূরেই চলে এল ওরা।

—'কাল আপনাকে নিয়ে ব্রেকার পার হবার কথা ছিল। কিন্তু—' ইতস্তত: করলে সতীন্দ্র।

—'কিন্তু কি ?'

—'ফিরে দেখি আমার অনেকদিনের বন্ধু এসেছে। টুরিস্ট লজে উঠেছে। সে ধরেছে আমাকে নিয়ে কোনারক যাবেই যাবে। তাই কালকের দিনটা ছুটি চাই। ব্যাপারটা অন্যরকম ভাবে নেবেন না কিন্তু আপনি !'

—'না না, তা কেন নেব। ভালই হল, আমিও বলতে যাচ্ছিলাম আপনাকে। কাল আমিও বোধহয় আসতে পারব না। কলকাতায় ফিরতে হবে। ম্যানেজারকে বলেছি কালই যেন একটা বার্থ রিজার্ভ করে দেয়।'

—'তার মানে ? আমি ফিরে আসবার আগেই আপনি চলে যাবেন নাকি ?'

—'অগত্যা। অবশ্য যদি টিকিট পাই।'

—'তার মানে, ব্রেকার পার হওয়া আপনি শিখবেন না ?'

—'কই আর হল শেখা !'

—'না তা হয় না।'

—'কি হয় না ?'

—'কোন জিনিসই অর্ধেক শিখে ফেলে রাখা উচিত নয়।'

—'সমুদ্রের ধারে জীবনে হয়তো আর আসাই হবে না।'

—'বম্বে ? জুহু ?'

—'বম্বেতে আর যাচ্ছি না।'

—'কোথায় যাবেন ?'

—'আপাততঃ কলকাতাতেই থাকব।'

—'আর দুদিন বেশী এখানে থাকতে আপত্তি কি ?'

—'সত্যি কথা বলি আপনাকে। কেমন একটা জেদ নিয়ে এখানে এসেছিলাম। হয়তো আর মাত্র দুদিনের হোটেলভাড়াই আছে আমার কাছে।

—'আমার কাছে টাকা আছে, ধার নিন।'

—'শোধ দেব কি করে?'

—'নাই বা দিলেন?'

—'কলকাতায় আমাকে তাড়াতাড়ি যেতেই হবে। আমাকে একজন কিছু টাকা দিতে আসবে।'

—'কে? কত টাকা?' বলেই লজ্জিত হল সতীন্দ্র। বড় বেশী কৌতূহল প্রকাশ হয়ে গেল যেন।

—'আমার এক্স-হাসব্যাণ্ড। আন্দাজ করছি দশ হাজার দেবে অন্তত:।'

আর কথা নেই। চুপচাপ হাঁটছে দুজনে। হঠাৎ পার্বতীর মনে হল, মিথ্যে মামলায় জিতেছে বলে বিবেক-দংশনে দীপ টাকা দিতে চাইছে! আর সতীন্দ্রর কাছে সবটাই বেসুরো হয়ে গেল কি? কিন্তু কেন? সত্যিই তো, আলাপটা কোনদিনই এমন জায়গায় যায়নি তো যে এতখানি ব্যক্তিগত কথা উঠতে পারে? আর তাই তো দেবলীনার ছবি দেখার পর পার্বতী কোন কৌতূহলই প্রকাশ করেনি। কিন্তু তবু সতীন্দ্রর কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে কেন? হাঁটছে, কিন্তু সব ভাবনার ওপর দিয়ে বার বার একটা কথাই কানে বাজছে—'আমার এক্স-হাসব্যাণ্ড।'

—'কি হল, কথা বলছেন না যে? ডিভোর্স করা মেয়েদের কি আপনি খারাপ ভাবেন?'

—'ওঃ, তখন সেই সিগারেট খাওয়া মেয়েদের কথাটা ফিরিয়ে দিলেন বুঝি? নাঃ তা নয়, আমার কেমন মনে হত আপনার বিয়েই হয়নি! বম্বেতে বুঝি তিনি থাকেন! মানে আপনিও থাকতেন?'

—'হ্যাঁ জুহুতে। একেবারে সমুদ্রের ধারে সেই বাড়ি। চলুন হোটেলে ফেরা যাক।'

—'চলুন। তাহলে সত্যি ব্রেকার পার হওয়া হল না আপনার! এ কিরকম হল জানেন? টেস্টে এ্যালাউ হবার পর পরীক্ষা না দেওয়া আর কি!'

সহজ হতে চাইল সতীন্দ্র।

—'টেস্টে এ্যালউ হয়েছিলাম?'

—'নিশ্চয়ই। কলকাতার ঠিকানাটা কিন্তু আমাকে দিয়ে যাবেন।'

—'কেন? বিয়ের সময় নেমন্তন্ন করবেন?'

—'যদি বিয়ে করি!'

—'যদি মানে? ছবিটা?'

—'ওঃ হ্যাঁ!'

রাত অনেক হয়েছে। তবু চিঠি লিখতে বসল সতীন্দ্র।

……'লীনা, একটা ম্যাগাজিনে পড়লাম সিগারেট খাওয়া মেয়েদের পক্ষে ভাল নয়। গলা হোর্স হয়ে যায়। আমার বৌ-এর গলা ছেলেদের মত শোনাবে' —এই পর্যন্ত লিখে থামল সতীন্দ্র। তারপর ছিঁড়ে ফেলল চিঠিটা। মিথ্যে কথা কেন লিখতে হয়? আমার চাইতে দেবলীনা অনেক ফ্র্যাঙ্ক। নাঃ দরকার নেই লিখে—একদিন চিঠি না লিখলে আর কি হবে?

ভোর পাঁচটায় বেরিয়ে গেল সতীন্দ্র সমর-এর সঙ্গে।

লাউঞ্জে তন্ময় হয়ে বসে সমুদ্রের ঢেউ-এর ওঠা-পড়া দেখছিল পার্বতী। এই রকম এক সমুদ্রের ধারেই আলাপ হয়েছিল দীপনারায়ণের সঙ্গে। সে আজ কতদূরে পিছিয়ে গেছে। তবু কিছু ছবি কি স্পষ্ট হয়েই না সামনে আসে। আবার এই সমুদ্রের ধারেই আলাপ হল সতীন্দ্রর সঙ্গে। কিন্তু কত তফাত। 'এ কদিনেই কিন্তু আপনি অনেক স্মার্ট হয়ে গেছেন।' সত্যি এত মুক্ত এর আগে কোনদিন মনে হয়নি নিজেকে। দীপকে ভালবাসতাম খুবই, ভয়ও করতাম। নিজের শরীর নিজের অসাবলীলতা নিয়ে হীনমন্যতা যেন কিছুতেই কাটতে চাইত না। সতীন্দ্রর সামনে কখনও ওই হীনমন্যতা ভাবটা আসে না তো। সতীন্দ্র ওকে অনেকটা বদলে দিয়েছে একথা মানতেই হবে। আর এক জীবনসংগ্রামে নামার আগে এই বদলটাও ওর খুব দরকার ছিল।

ম্যানেজার এসে বললে—'আজ হল না, কালকের টিকিট পাওয়া গেছে। বার্থ রিজার্ভ করে দিয়েছি।'

—'ধন্যবাদ।' বলল পার্বতী। একটু হাসল। মনটা হঠাৎ বলে উঠল, 'টিকিটটা না পাওয়া গেলেই কি চলত না! সতীন্দ্র যদি আজ না আসে? এমনও তো অনেকে করে, ঐ কোনারকেই থেকে যায় রাত্তিরটা, চাঁদের আলোতে মন্দির দেখবে বলে? না, অন্য কিছু না, একটা ধন্যবাদও দেওয়া উচিত তো?' সমুদ্রের দিকে চেয়ে কত কথাই যেন ভাবতে লাগল পার্বতী। নাঃ, যাই শেষবারের মত সাঁতার কেটে আসি একবার।

সমুদ্রের ধারে এসে দেখল একটু দূরে দুটো নুলিয়া বসে বিড়ি খাচ্ছে। কি আশ্চর্য, এ সময় তো কেউই থাকে না। একটু বিরক্ত হল পার্বতী। তারপর ওদের অগ্রাহ্য আর অবজ্ঞা করেই ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রে।

সতীন্দ্র আর সমরের কোনারক দেখা চলল। এক সময় সমর বলল—কলকাতা থেকে হঠাৎ পালিয়ে এলি কেন?'

—'ওসব কথা ছাড় তো!'

একটু চুপচাপ সবার হাঁটল ওরা। সমর আবার শুরু করল—'গত রোববারে পার্থদের ডায়মণ্ডহারবার রোডের বাড়িটায় একটা পিকনিক গোছের ছিল। জানিস তো, আজকাল ড্রিংকস ছাড়া আমাদের মত উচ্চ মধ্যবিত্ত অথবা বলতে পারিস মধ্য উচ্চবিত্তদের পার্টি জমে না। দেবলীনা একটু ড্রিংক করেছিল। তারপর গাছে কে চড়তে পারে না পারে এই নিয়ে কথা হতে হতে দেবলীনা জেদ করে গাছে চড়তে গিয়ে পা মুচকে ফেলেছে। বুঝতেই পারিস, সবাই কেমন ব্যস্ত হয়ে উঠল। ঐ সময় সব দেখে মনে হল—মানে, ইয়ে—পার্থর দেবলীনাকে বড্ড বেশী ভাল লাগে।—আর—'

—'কারা করেছিল এমন মন্দির আর এমন সব মূর্তি?' সতীন্দ্র বলল।

—'এড়িয়ে যাসনে কথা, তোর এই প্রশ্নের উত্তর দু'চারখানা বই পড়লেই পাবি। আমার কথা শোন, অনেক মেয়ে থাকে তারা ঐ জলের মত আর কি। যখন যে পাত্রতে থাকে, সেই রকম রং ধারণ করে। তুই সেখানে নেই, পার্থ একটু চেষ্টা করলেই পার্থর রং ও ধারণ করতে পারে। তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেল। দেবলীনা ভাল মেয়ে, এখনও সরল। কেবল একটু ব্যক্তিত্ব কম। তবে যাই বলিস, স্ত্রীদের একটু ব্যক্তিত্ব কম থাকলে বিবাহিত জীবন সুখের হয়। মীরাকে সবাই বলে বোকা, কিন্তু মীরা আমার বউ হয়েছে বলে আমি খুব সুখে আছি। কিরে, একলা আমিই যে বকে যাচ্ছি, একটা হাঁ না দিবি তো!'

—'হ্যাঁ, বিয়ে করাটা দরকার।' ক্লান্ত কণ্ঠে বলল সতীন্দ্র।

এখন দুপুর, ঘড়ির দিকে তাকাল সতীন্দ্র। এই সময় পার্বতীকে নিয়ে ব্রেকার পার হবার কথা ছিল। একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল সতীন্দ্র। একদল বিদেশী টুরিস্টদের দিকে চোখ পড়ল। স্ত্রী-পুরুষের একটি এরটিক মূর্তির দিকে কেমন লোভীর মত তাকিয়ে আছে। অবশ্য কি এদেশী কি বিদেশী সবাই তাই করে আর এটা তো এক্সপেক্টেড। দেয়ালের একটা জায়গায় দৃষ্টি পড়ল ওর। ছোট্ট করে খোদাই করা—এক চাষা, তার বৌ, মাথায় বোঝা নিয়ে ছোট ছেলের হাত ধরে যাচ্ছে যেন।

—'দেখ সমর এইটে ভাখ, কেমন ভাল লাগছে, নারে!' এইবার ওরা এই ধরণের অনেক ছোট ছোট খোদাই করা জিনিস দেখতে শুরু করল। কোথাও

একটা লোক হাঁটুতে কনুই রেখে হাতের মুঠির ওপর চিবুক রেখে চিন্তায় মগ্ন। কোথাও শাশুড়ী বৌকে ধরে মারছে। এরকম আরও কত!

—'কত সমস্ত বই লেখে এই মন্দির নিয়ে। এই ছবিগুলোর কথা কোথাও লেখে না রে!' বলল সতীন্দ্র।

—'হয়তো লেখে। আমরা আর কটা বই পড়ি বল।' সমর বলল।

—'তা ঠিক।' চিন্তায় মগ্ন সতীন্দ্র, পার্বতী কি টিকিট পেয়েছে? কি যেন একটা কথা পার্বতীকে বলতে ইচ্ছে করছে। আমি পৌছবার আগেই কি বেরিয়ে যাবে পার্বতী? এই রে, কলকাতার ঠিকানা নেওয়া হয়নি তো!

—'এই ছাখ সতীন, এই দিকটার এই রিলিফের কাজটা ছাখ।'

—'চল ফেরা যাক।' হঠাৎই বলে উঠল সতীন্দ্র।

—'কি হল?' অবাক হল সমর

—'সেই একই রকম সব মূর্তি, একই প্যাটার্ন দেখতে আর ভাল লাগছে না।'

—'হঠাৎ হল কি?'

—'শরীরটা ভাল লাগছে না, চল।'

—'লাঞ্চটা সেরে যাবি তো, না কি?'

—খাওয়া-দাওয়া সেরে ওরা গাড়ীতে উঠল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ। সমর আর না পেরে বলে উঠল—'আমি বুঝতে পারিনি সতীন, পার্থর দেবলীনাকে ভাল লাগে শুনে তোর এতটা খারাপ লাগবে। তুই একটা ছেলেমানুষ!'

—'এক্ষুণি আমি দেবলীনার কথা ভাবছিলাম না।' উত্তর দিল সতীন্দ্র।

—'তবে কি ভাবছিস অমন মুখ গোমরা করে?'

—'মানুষের মন বড় বিচিত্র!'

—'তুই কি এখন ফিলজফি আওড়াবি নাকি?'

—'ড্রাইভারটাকে বল না, আর একটু স্পীড দিতে।'

—'মনে হচ্ছে, তুই গিয়েই কলকাতার টিকিট কাটবি? তুই যে এতটা জেলাস হতে পারিস, তোকে দেখে কিন্তু তা মনে হয় না। আমার ধারণা ছিল তুই আমাদের থেকে অন্য রকম।'

—'বাজে বকিসনি, হোটেলে আমার একটা দরকারী কাজ আছে।'

গাড়ি চলেছে। কখনো রাস্তাটা উঁচু হয়েছে, কখনও নীচু। কখনো দুপাশে

ফাঁকা মাঠ। কখনো জঙ্গল। কখনো বা গ্রাম, আর কখনো দুপাশের বড় বড় গাছের ডালগুলো মিশে গিয়ে মাথার ওপর খিলান সৃষ্টি করেছে যেন। অন্য সময় সতীন্দ্র এসব লক্ষ্য করত। এ নিয়ে দুটো কথাও বলত, কিন্তু এখন—দেবলীনা কবে চিঠি লিখেছে? সোমবার। কই, পার্থর বাগানের পিকনিকের কথা তো কিছু লেখেনি' দোষ কি? তুমিও তো পার্বতীর কথা কিছু উল্লেখ করোনি! কিন্তু দেবলীনা সবসময় বলে, সে ফ্র্যাঙ্ক। আমার কোন প্রিটেনশন নেই। যদি, যদি আজকের টিকিট পেয়ে থাকে পার্বতী তবে দেখা হবে না। নাঃ, কিছুতেই কলতাকার ট্রেন ছাড়বার আগে পৌঁছতে পারবে না ওরা। কলকাতার হাজার হাজার অট্টালিকা, শ' শ' রাস্তা গলি আর লাখ লাখ মানুষের মধ্যে ঠিকানা না জানলে কি কোন মানুষকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব! কাগজে ব্যক্তিগত কলমে বিজ্ঞাপন দেব তাহলে। একটা কথা পার্বতীকে দেখা হলে বলতেই হবে—'আপনি যা ভাবেন আপনি তা নন। আমি বলছি আপনি দেখতে খুব সুন্দর।' এটুকু বললে নিশ্চয়ই কোন অপরাধ হবে না। গাড়ি ছুটে চলেছে। অন্ধকার হয়ে গেল। আজও চাঁদ উঠবে। কিন্তু একটু দেরি হবে। পার্বতীকে বলতেই হবে, 'আপনি ডিভোর্স করা মেয়ে বলেই আপনি বাতিল হয়ে যাননি। আপনার সৌন্দর্য পবিত্র। অনেক সুন্দরী আপনার পাশে দাঁড়ালে ম্লান হয়ে যাবে।' আচ্ছা, কি সমস্ত আবোল-তাবোল ভাবছি!

—'একটা সিগারেট দে তো সমর।'

সমর সিগারেট কেসটা এগিয়ে দেয়। পুরী শহরে গাড়ি ঢুকছে, সতীন্দ্রের খেয়াল হল যেন এতক্ষণে।

—'সমর, তোকে তো ভুবনেশ্বর যেতে হবে, তাই না?'

—'ধ্যান ভেঙেছে? হ্যা, তোকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে ফিরব।'

—'না, আমাকে তুই এই বাজারের মুখটায় নামিয়ে দে।'

গাড়ি থামল। সমর বলল—'সতীন, তুই এত সেন্টিমেন্টাল ভাবিনি কখনও। তাহলে পার্থর বাগানের কথা তুলতামই না। এই সমাজে এতটুকুর জন্য কেউ এত আঘাত পায় তোকে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না। তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে বিয়েটা সেরে ফেল, অনেস্টলি বলছি'

সতীন্দ্র হাসল। সমরের গাড়ি চলে গেল। সতীন্দ্র দ্রুত এগিয়ে চলল সেই শাড়ির দোকানটির দিকে। সেই মালটি-কালার শাড়িটা কিনল সতীন্দ্র। তারপর

একটা সাইকেল-রিক্সা ভাড়া করে চলল হোটেলে।

লাউঞ্জে ভীড়। থমথম করছে যেন আবহাওয়াটা।

—'কি হয়েছে?' একটা বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করল সতীন্দ্র।

—'একশ দশ নম্বরের মেমসাহেব দুপুরে সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে ডুবে গিয়েছিল। নুলিয়ারা অনেক চেষ্টা করে এক-দেড ঘণ্টা আগে দেহটা তুলে এনেছে।'

আরও জানল সতীন্দ্র, ব্রেকার পার হতে গিয়েছিল পার্বতী। দুটো নুলিয়া দেখেছে। খানিকক্ষণ না দেখতে পেয়েই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সমুদ্রে। মিস সরকারের মাসীর বাড়িতে ট্রাঙ্ককল করা হয়েছে। কাল সকালেই ওঁর মা ইত্যাদি এসে যাবেন। পুলিশ এসেছে, মর্গে নিয়ে যাবে দেহ।

একটু আগে পর্যন্ত পার্বতীর ভীতু-ভীতু ভাব কাটিয়ে দিয়েছে বলে সতীন্দ্র গর্ববোধ করছিল মনে মনে, ভেবেছিল সম্পর্ক সহজ হলে বলবে—'ভাগ্যিস আমাদের আলাপ হল, তোমার তাই না খোলসটা ঘুচে গেল। তুমি যে কত সহজ আর স্মার্ট হতে পার তা বোধহয় তুমিও জানতে না, আমিও জানতাম না।'

আর এখন সতীন্দ্রর সারা মনটা হাহাকার করে বলতে লাগল—ভুল হয়ে গেছে, পার্বতী বড্ড ভুল হয়ে গেছে। আমার কি দরকার বা অধিকার ছিল তোমাকে এইভাবে হনন করবার। আমি দায়ী, তোমার মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী পার্বতী। মনে পড়ল,—'সব সময় এত ভয় পান কেন বলুন তো? এত ভয় পেয়ে পেয়ে এত বড়টা হলেন কি করে?' তুমি ঐ ঢেউ দেখে একটু ভয় পেলে না কেন পার্বতী? তোমার সেই ভীতু-ভীতু নিড়বিড়ে ভাবটা ভাল লেগেছিল বলেই তো তোমাকে ভালবেসেছিলাম পার্বতী। হ্যাঁ, এখন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি তখন তোমাকে ভালবেসেছিলাম। আসলে এই কথাটাই তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম। এই কথাটাই বলবার দরকার ছিল। খুব দরকার ছিল।

পুলিশের গাড়ি পার্বতীকে নিয়ে চলে গেল। শাড়িটা কোলে নিয়ে বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে রইল সতীন্দ্র। আকাশে তখন কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়ার চাঁদ আর উদাসীন সমুদ্র গর্জন করে চলেছে সমানে। ঢেউগুলো বালির ওপর আছড়ে পড়ছে—আবার পড়ছে—আবার আবার।

———



চিত

কবিতা সিংহ

পুতুল সদরে দাঁড়িয়ে তানীর ছাগল দোয়ানো দেখছিল। আর তানীদের দড়ির চারপাই-এ বসে পাড়ার উঠতি বয়সের ছেলের পাল, গুলতানি করা ছেলের পাল, পুতুলকে দেখছিল।

পুলিন ঠিক সেই সময়টাতেই গলির মুখে ঢুকল। গলি আবার কী? হাত-তিনেক, প্যাচপ্যাচে কাদাওঠা কানা একটা খোঁদল একটা বড়ো বাড়ির মাজা ভেঙে ন্থকাল করে ঢুকে গেছে। গলিটা যে দেয়ালে গিয়ে ফুরিয়ে গেছে, তার গা থেকে তানীদের ছোট চালা। তানী থাকে, তানীর ঘুঁটেওয়ালি মা থাকে আর মুটেবাবা। আর ছাগলটা। দু পাশের টালখাওয়া জানলা, ছাদ থেকে ঝুঁকে আছে দু-চার জন। চা খাচ্ছে, গল্প করছে। আকাশের ঘুড়িওড়া দেখছে। যারা এক-পো আধ-পো দুধ নেবে তারা তানীর দু উরুর মধ্যে চেপে রাখা দুধের ছোটো বালতিটায়, ফেনায় ফেনায় ফেঁপে ওঠা দুধের ফিনকি দেখছে।

আবার —ফিরে ফিরে ঠিক পুতুলকেও দেখছে।

সত্যি, কে বলবে বলো দেখি। এই পুতুল কি সেই রোগা পুতুল? হারানের বিয়ের সময়কার সেই সিড়িঙ্গে মেয়েটা? হারানের বউ-এর সঙ্গে পুতুলও ক'দিন তার দিদির সঙ্গে থাকতে এসেছিল। তখন পুলিন তাকে সেই খোলাম-কুচির খেলাটা শিখিয়ে দিয়েছিল। সত্যি এই খোলামকুচি নিয়ে, আপন মনে কী সুন্দর সব খেলা যায়। একটা কিছু ভেবে নিয়ে ওপরে ছুঁড়ে দেওয়া আর লুফে নেওয়া। চিত হলে ফলে যায় আর উপুড় হলে বি-ফল! আর খেলতে খেলতে কেমন ছোট্ট ছোট স্বপ্ন তৈরি হতে আরম্ভ করে আর গল্পের টানেল খুঁড়ে খুঁড়ে, তারা চলতে থাকে ভিতর ভিতর।

এই বাড়িটায় পৌঁছোতে হলে বড়ো রাস্তা থেকে গুনে গুনে পাঁচটা বাঁক। অথচ তাতেই কত তফাত।

বড়ো রাস্তায় কত আলো, কত শব্দ, ট্রাম বাস মিনি জামা কাপড়ের দোকান-পাট, গোলদিঘিতে সাঁতার, ট্রানজিস্টারে খেলার রিলে। আর এখানে। এগ গলিতে?

বাড়িগুলো সব খণ্ডবিখণ্ড, ছন্নছাড়া নষ্ট দাঁতের সারি হয়ে নড়বড় করে ঝুলছে সামনের বর্ষার ভার সইবে কিনা সন্দেহ।

তবু পুলিনের মন খারাপ করে দেয় ক্বচিৎ কখনো শ্রীহীন বাড়িগুলোয় লেগে থাকা একটি আধটি সাহেবি আমলের পোর্সিলিনের টালি, খানিকটা খানিকটা পঙ্খের কাজ, কখনো জানলার শার্সিতে আটকে থাকা রঙিন কাচের টুকরো—এসব বড়ো কষ্টের মতো বেঁধে পুলিনকে। যেমন বেঁধে পুতুল।

বড়ো বেশি শরীর পুতুলের শরীরে। বড়ো উগ্র। আগে যখন কাছে আসত পুতুল একটা ফিকে লেবুতেলের সুবাস লাগত পুলিনের নাকে। গা থেকে উঠতো গাঁ-দেশের ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ। এখন মনে হয় পুতুলের চাপ চাপ চুলের ভারে কেবলই বর্ষা স্যাঁতা শরীরে ঘাম আর বাসন মাজার গন্ধ। তবু কখনো, ক্বচিৎ কখনো, পুতুলের চাউনিতে, হাসিতে একটি দুটি সূক্ষ্ম পঙ্খের কাজ, কর্নিকের গড়ন—দেখতে পায় পুলিন। আজও এক ঝলক দেখল।

সদরের এজমালি দরজার সামনে খানিকটা জমা জলের ওপর পিশু পোকা উড়ছে। তার ওপর পাতা ইঁটের ওপর পা ফেলে ফেলে পুলিন পুতুলের পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকল। আর পুতুলের শাড়ি থেকে উনুন ধরানোর গন্ধ পেল।

সদরের অন্ধকার গর্তটার মধ্য দিয়ে ভিতরে ঢুকলে প্রথমটা কিছু দেখাই যায় না। ভিজে ভিজে অন্ধকার প্রায় ঝালরের মতো গায়ে লাগে। ক্রমশ চোখ সয়ে এলে, তবেই পাশের প্যাসেজ বেয়ে উঠে, উঠোন ঘুরে নিজের আস্তানায়, অর্থাৎ এই মহলের শেষপ্রান্তে যেতে পারে পুলিন।

কী ছিল আগে এ মহলটা? উঠোনের পাশের জমির সঙ্গে সমান ছোটো ছোটো খুপরিতে বোধ হয় ঘোড়ারাই থাকত। এখন এক-একটি খুপরিতে এক-একটি পরিবার। মাঝখানের উঠোনটার আর কোনো অস্তিত্বও নেই। কেটে কেটে নীচু নীচু দেওয়াল তুলে, খুপরি ঘরের সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। মানে প্রত্যেকটা ঘরের রান্নার জায়গা, আর বাসন মাজার জায়গা।

এ সময়টা বাড়ি ফিরলেই পুলিন দেখে, নিজের নিজের খোপের সামনে, বাসন মাজতে, কিংবা কাপড় কাচতে বসেছে মেয়েরা। উঠছে এঁটো বাসনের গন্ধ, কুলকুলিয়ে ওঠা যার যার আলাদা উনুনের ধোঁয়া। আড়চোখে খুপরির

ভিতরের আবছা উঁচু তক্তপোশ, বাকস প্যাটরা, বিছানার টাল, কখনো হুতভম্ভ শিশু দেখা যায়। উঠোনের এপাশের, অর্থাৎ খুপরিগুলোর উল্টোদিকের প্যাসেজ দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা এত বাইরের লোক যাতায়াত করে যে মেয়েরা কেউ মুখ তুলে চেয়েও দেখে না। কিংবা হয়তো তাদের আর কিছু দেখবারই ইচ্ছে বাকি নেই।

পুলিনের তো সবাইকেই এক রকম মনে হয়। হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তোলা। বেরঙা শাড়ি পরা ভাঙা চোরা কতকগুলো মেয়ে-মানুষ। এদের মধ্যে পুতুলের দিদি নির্মলাও আছে।

এদের প্রত্যেকের মধ্যেই পুলিন তার মায়ের কিছু কিছু অংশ দেখতে পায়। এমন কি পুতুলের মধ্যেও পায়।

কোন্ অংশটা? কে জানে, এখনো ঠিক পরিষ্কার করে ধরতে পারেনি পুলিন।

পুলিন প্যাসেজ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে উঠোনের দৈর্ঘ্যটা পেরিয়ে গেল। তারপর মস্ত একটা ঘর। বোধ হয় একসার ঘরের মাঝের দেওয়াল ভেঙে নেওয়া হয়েছে। এখানে সারাদিন ধরে চলে ঘটাং ঘটাং! একটা ছোট প্রেস। একদিকে কম্পোজিটারদের খোপ। একদিকে মেসিন। আর পিছনে টালকরা কাগজ আর গ্যালির উঁচু দেওয়াল দেয়া, সরু গলির মতো জায়গাটা, ফুট চারেক মতো হবে হয়তো। সেই লম্বা ফালিটা পুলিনের। লম্বায় অনেকখানি হলেও চওড়ায় সরু। পুলিনের এই ফালির একপাশে কাগজের দেওয়াল, আর এক পাশে নোনা-ধরা এবড়ো খেবড়ো দেওয়াল। দেওয়ালটা এত নড়বড়ে যে কখন খসে পড়ে, এই ভয়ে কেউ থাকতে চায় না। ভয় করার কারণও আছে। এই তো গত বর্ষাতেই সেই কাণ্ডটা ঘটেছিল। বাড়িটার সিলিঙ্ এত উঁচু যে ওপরে তাকাতে ঘাড় ভেঙে যায়। ওপরটা ঝুলকালো। নোনা-ধরা দেওয়ালের গা দিয়ে একটা সঙ্কীর্ণ ইঁটের সিঁড়ি ধাপে ধাপে উঠে গিয়ে একটা বন্ধ দেওয়ালের কাছে গিয়ে হঠাৎ শেষ হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ একটা অদ্ভুত খাঁজকাটা খাঁজকাটা সিঁড়ি একটা দেওয়ালের গায়ে হঠাৎ হারিয়েই বা গেল কেন? পুলিন মাঝে মাঝে কথাটা ভাবত। হঠাৎ একদিন, ঘোর বর্ষায় সেই বন্ধ দেওয়াল থেকে ঠিক একটা দরজার মাপে খানিকটা অংশ খসে পড়েছিল নীচে। ভাগ্যিস পুলিন তখন পাশের প্রেসে বসে চা খাচ্ছিল! না হলে অক্কা পেয়ে যেত সেদিনই।

তা যাই হোক গে, পুলিনের আস্তানার ওপর দিকের অনেকটাই এখন

উদোম। তাতে পুলিনের কিছুই তরবিশেষ হয়নি। বৃষ্টি পড়লে একটা পর্দার মতো গুটোনো তেরপল ফেলে দেয়। বরং খাঁজকাটা সিঁড়ি দিয়ে ভাঙা খোঁদলটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে দারুণ মজা। প্রেসের লোকেরা বলেছিল, সেকেলে বাড়ি তো, হয়তো তখন ওই দেওয়ালের ওপারে কোনো গুপ্তঘর বা গুমঘরের চোরাই জায়গা ছিল। কিন্তু এখন?—পুলিন উঠে গিয়ে দেখেছে শুধু খানিকটা এবড়ো-খেবড়ো চাতাল দেওয়াল কামড়ে পড়ে আছে। সেইখানে—নাঃ থাক! ওটা পুলিনের একার ব্যাপার। ওখানে পুলিনের সঙ্গে কেবল পুলিন-ই।

পুলিনকে আসতে দেখে হারান ছাপাখানা থেকে গলা বাড়িয়ে ডেকে বলল—বাজারে যাবে নাকি?

পুলিন তার আস্তানার দিকে এগোতে এগোতে বলল, যাবো, তুমি তৈরী হও, আমি এক্ষুনি আসছি। প্রেসের আলোকিত ঘরটা পেরিয়ে নিজের আস্তানার মুখের কাছে এসে পুলিন নর্দমার ধারে বালতির তোলা জলে ঘষে ঘষে পা ধুয়ে নিল। তারপর চটের পাট করা থলিতে পা মুছে তার নিজের আড়ালটিতে ঢুকল পুলিন। সারা জায়গাটা জুড়ে মাদুর পাতা। পায়ের তলায় মাদুর কাঠির চিকন চিকন স্পর্শ। আরশোলা ইঁদুর মশাকে মেরে মেরে তাড়িয়েছে। ধুনো দেয়। ফ্লিট দেয়। তাড়াতে পারেনি শুধু নোনা ইঁট আর পুরোনো কাগজের গন্ধ।...এখানে এলেই তার মন তৃপ্তিতে ভরপুর হয়ে যায়। পুলিন পরিচ্ছন্ন। দড়িতে তার জামা কাপড় গুছানো। তার ছোট টিনের বাক্স। গোটানো বিছানা। আর দপ্তরির কাজের জিনিস। এ ছাড়া রান্নাবান্নার স্টোভ আর বাসনপত্র। নিজের সরু ফালির সেই অন্ধকার কুয়ো থেকে ওপরের আলোময় খোঁদলটার দিকে তাকাল পুলিন। এখন তার সামনে সেই গুপ্ত দরজায় ভাঙা আয়ত-ক্ষেত্রটায় অপরাহ্ণের বেগুনফুল-রঙা আকাশ উঠে দাঁড়িয়েছে। আহা!

পুলিনের চোখ দুটি যেন ভরে গেল।

ছোট্ট একটা ঘটিতে করে জল নিয়ে পুলিন আস্তে আস্তে সেই বিপজ্জনক সিঁড়ির খাঁজে খাঁজে পা ফেলে উঠতে লাগল। যেন সে মন্দির যাচ্ছে!

মানুষের সংসারের-গন্ধ, বক্তৃতা, মেশিনের ঘটাং ঘটাং পেরিয়ে অনীর ছাগলের গলার ঘণ্টাধ্বনি তার দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল। আর সে যত ওপরে উঠতে লাগল ততই তার চোখে-মুখে হাওয়ার ঝাপটা এসে ঝাপটাতে আরম্ভ করল।

ছোটবেলায় পুলিনদের বস্তির পাশের খোপে থাকত ধোপানিদের দাদিবুড়ি। দাদিবুড়ি ফোলা ফোলা দুপা ছড়িয়ে কেবল দেহাতের গল্প করত। তাদের দেহাতের পার্বতী মন্দির। সাদা, চুনকাম করা। নদীর ধারে যে যায় সে বড়ো ঘণ্টাটা একবার করে বাজিয়ে চলে যায়। চারপাশের গেঁহুর ক্ষেত। সোনালি হলুদ। খয়েরি কাঁচ ডানার ফড়িং উড়তে থাকে।

বেগুন ফুলে রঙের পশ্চাদপটে একটা রাঙা টবে দুলছে গাছটা। কী সুন্দর নধর শরীর। পুলিনের গুণে রাখা। সব মুখস্থ। চারপাশে উঁচু উঁচু বাড়ি। গাছটার বড়ো একলা লাগে হয়তো। এবার বাজারে গেলে, গাছওয়ালা বুড়োটাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, কোথায় কোন্ বনে? কোন্ বাগানে? গাছটাকে পেয়েছিল সে? পুলিন পরম মমতায় ঘটির জলে এক একটি পাতা আলাদা করে মুছে মুছে দিল। তারপর মনে মনে বলল—নাও, তোমার মাথায় আলাদা করে বৃষ্টি ঝরিয়ে দিচ্ছি। স্নান করতে করতে পিছল আর ঝলমলে হয়ে উঠতে লাগল গাছটা। পুলিনকে সে দুলে দুলে নিজের দু'ডালের ফাঁকে ফাঁকে গজিয়ে ওঠা সুকুমার পত্রমুকুল দেখাতে লাগল। নতুন ডাল হবে, তারই লজ্জা কুঁড়ি। ডালে ডালে থোপায় থোপায় মুঠিয়ে উঠছে ফুল্ল কুসুম গুচ্ছ। কুঁড়ির মধ্যে ঠেলে ঠেলে উঠছে গন্ধমধু।

আজ রাতে যখন ফুটে উঠবে তখন গন্ধে গন্ধে পুলিন পাগল হয়ে উঠবে।

সেই কথা ভাবতে ভাবতে পুলিনের সারাগায়ে কাঁটা উঠতে থাকে। আকাশের বেগুন ফুল-রঙ তখন আরও আরক্ত।—কই তুমি কোথায়?

নীচ থেকে পুতুলের কণ্ঠস্বর ঘুরে ঘুরে উঠে আসতে থাকে। পুলিন চমকে ওঠে। আর তখনই তার হাত লেগে কয়েকটা পাতা খসে পড়ে। পুলিন নীচু হয়ে তুলতে গিয়ে দেখে পাতাগুলো ঈষৎ বিবর্ণ হলদে। পুলিন থমকে দাঁড়ায় তার মুখও বিবর্ণ হয়ে যায়। এখন তো বর্ষাকাল। এখন তো পাতা খসে না।

কই তুমি বাজারে যাবে না? জামাইবাবু ডাকছে! নীচেটা অন্ধকারে একাকার। ওপর থেকে পুতুলকে ঠাহর করা যায় না। পুলিন সেই অলক্ষ্য শব্দটা লক্ষ্য করে বলল,—বল, যাচ্ছি—

দেয়াল ধরে ধরে অভ্যস্ত পায়ে নেবে এল পুলিন। সুইচ টিপে আলো জ্বালল।

পুতুল তখনও দাঁড়িয়ে আছে। একবার পুলিনকে আর একবার খাঁজকাটা

সিঁড়িটা দেখে সে বলল,—খুব সাহস তো? তুমি ওই অত সরু সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলে?

সত্যি অদ্ভুত সরু, আর বিপজ্জনক সিঁড়িটা। দেওয়ালের সঙ্গে প্রায় মিশে আছে। সহজে বোঝা যায় না। পুলিনের সারা ঘরে চোখের দৃষ্টিটা ঘোরাতে ঘোরাতে পুতুল এবার তাকাল সেই উঁচুতে, খোলা আয়তক্ষেত্র। তখনই ওপর থেকে একটা শক্তিহীন পাতা ঘুরতে ঘুরতে নেমে এল।

—ওটা হাসনুহানা না?

পাতাটা হাতে তুলে নিল পুতুল। তারপর দুঃখিত স্বরে বলল— বাঁচবে না।

পুলিন হত্যাকারীর মতো তাকাল পুতুলের দিকে। তারপর বাজারের থলিটা তুলে নিল।

বাজারের মুখে এসে পুলিন বলল—পুতুলের কী ব্যবস্থা হল?

—কাল হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি।

পুলিন বলল—যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো!

—নিজের বউ বলে পরিচয় দিতে হল! তিনটে, ছেলেপুলে আছে বলতে হল।

—চুকে বুকে গেলে তাড়াতাড় বিদেয় করে দিয়ো!

হারান মাথা নাড়ল। কথাটা পুলিন কেন বলছে হারান জানে। এমন কী পুতুলের রি রি যৌবন নিয়ে হারানের বউ পর্যন্ত ব্যতিব্যস্ত। পুতুল আসার পর থেকেই যেন এই গলিতে, এই পাড়ায় সারাক্ষণ যেন মাংস রান্না হচ্ছে। অথচ পুতুল যাবেই বা কোথায়? হারান পুলিনকে সব কথা বলে। সব কথা বললে যদি কেউ বন্ধু হয় তাহলে অবশ্যই হারান পুলিনের বন্ধু। কলকাতার কাছে মফঃস্বলে হারানের বউ পুষির বাপের বাড়ি। মাসতিনেক আগে পুতুলকে হাট করে ফেরবার পথে তুলে নিয়ে গিয়েছিল কারা! তারপর রেল-লাইনের ধারে ফেলে দিয়ে যায়। এখন আর তাকে কলকাতায় না এনে উপায় নেই। হারান পুলিন আর পুষি ভেবেছিল কেউ জানবে না। বুদ্ধি করে কাজ হাসিল করতে পারলে পুতুল দিব্যি কুমারী বনে ফিরে আসবে। কিন্তু পুতুল আসবার পর থেকেই যেন চারপাশের আবহাওয়ায় বিদ্যুৎ খেলছে। সকলের মন চোখ, চিন্তা সব যেন দৌড়োচ্ছে নাভির দিকে। এমন কি পুতুলেরও।

এমন কী হারানেরও।

বাজারের কাছ বরাবর এলেই পুলিনের মনে হয় সে যেন যাত্রার কনসার্ট

শুনছে। কত মানুষ। কত জিনিস। জিনিস সাজানোর মধ্যে কত কারিকুরি। বাজারের কাছে এলে তার মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। শীতের দিনে শাড়ির দোলাই বেঁধে মায়ের কড়ে আঙুলটি ধরে, সে বাজার কুড়োতে আসত। ফেলা কপিপাতা, পচা টমেটো, ধসা আলু।

—কী ভাবছ পুলিন ?

—ভাবছি এসব কায়দা যদি তখনকারকালে থাকত, তাহলে আমার মা হয়তো আমাকে আনত না !…

কিন্তু মনে মনে নিজেকে আসল কথাটা বলল পুলিন।

—আমার মাঝে মাঝে কেমন সন্দেহ হয়। আমার মা হয়তো কোনো উঁচু ঘরের মেয়ে ছিল। মায়ের একটি দুটি কথা, টুকরো টুকরো আচরণ এখন বুঝি যেন !

হারান বলল ভালোই হ'ত। আমরা তাহলে জন্মাতাম না। এত কষ্টও পেতাম না।

—না, না, এই জন্ম বড় ভালো। এই জন্মে বড় পরিতোষ। না, না, মা তাকে চেয়েছিল। মা তাকে জন্মাতে দিয়েছিল। পুলিন এ কথাটা রক্তে রক্তে বোঝে। নাহলে তার জীবন এত আনন্দের হত না। এত আনন্দ।

বাজারের মুখে পুলিন দেখল সেই গাছওয়ালা বুড়োটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে তুরীয় হয়ে বসে আছে। পাশে কটা মাটির মুঠোয় ভরা গাছ।

পুলিনের একবার ইচ্ছে হল সে মাথা নীচু করে বুড়োকে বলে—ও বুড়ো ! তোমার হাসনুহানা মেয়ে ভালো আছে !

কিন্তু ততক্ষণে হারান খানিকটা এগিয়ে গেছে আর পুলিনেরও পুতুলের কথা মনে পড়েছে—বাঁচবে না।

পুলিন হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে বুড়োকে জিজ্ঞেস করল,—ও বুড়ো, তুমি কোথা থেকে গাছ আনো ?

—হেই কাকদ্বীপ !

কথাটা কোনো মতে বলেই ঘুমিয়ে পড়ল সে। পুলিন মনে করতে চেষ্টা করল তার বন্ধু রঘুনাথ কাকদ্বীপ সাইডের কত নম্বর বাসের ক্লীনার ?

বাজার পুলিনের বড্ড ভালো লাগে। মাটির বুক ফাটিয়ে বেরোনো এইসব ফলপাকুড়। ফসল দেখলেই পুলিনের ভালো লাগে। কোনো কিছু হয়ে ওঠা দেখলেই। ডালায় সাজানো পুরুষ্টু বেগুনগুলো। আহা গা দিয়ে যেন লাবণ্য

ঝরে ঝরে পড়ছে। যেন পাম্প্ করে কেউ যৌবন ঠেসে দিয়েছে শরীরে। সবুজ লেসের মত গোছা গোছা সরষে শাক। এবড়ো-খেবড়ো গা—করলা, হালকা বাসন্তী পাতিলেবু। এত সব তরি তরকারি দেখার পর, মা রাঙা আলুর সঙ্গে মাষকলাই সেদ্ধ করে দিত। কখনো কপিপাতা কুচোনোর সঙ্গে ভাত।

বস্তির সেই সেই ছোট্ট খুপরি। উনুন জালিয়ে রুটি সেঁকত মা। মায়ের টানা ছাঁদের মুখখানি জলজল করত আগুনের আভায়। চোখের কোলে গভীর গর্ত। এখন পুলিন বোঝে কত অল্প বয়স ছিল মার। কত সুন্দর ছিল মা। ওই অতটুকু ঘরে নানা রকমের মানুষের সঙ্গে উঁচু তক্তপোশে শুয়ে থাকত মা। তলায় লুকিয়ে রাখত পুলিনকে। তাদের মা ও ছেলের অদ্ভুত গোপন খেলা ছিল একটা। অন্য লোককে লুকিয়ে কখনো কখনো মা নিজের হাতটা নামিয়ে দিত পুলিনের কাছে, পুলিন সেই হাতটি নিজের চোখে গালে বোলাত। লোকটা বুঝতেই পারত না যে, পুরো দাম দিয়েও সে একটা হাত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

আর তখনই পুলিন বুঝতে পারত তার মা তার হাতের মধ্যে দিয়ে নেমে এসে গুটিগুটি হয়েছে পুলিনের কাছে। পুলিন জানত তার মা নিজেকে আলাদা করে নিয়েছে মড়ার মত দেহটার থেকে। সেই থেকেই সে ক্রমে ক্রমে শিখে নিয়েছিল কী করে মনকে দেহ থেকে আলাদা করে নিতে হয়। তাই পুলিন কখনো তার মাকে ঘেন্না করতে পারেনি। কারণ সে জানত তার মা এ সব কিছুতেই জড়িত নেই। ওই বস্তি পচা জল-জমা পায়খানা, পুরুষের বাসনা কামনা ঘাম মশামাছি, কাটা কাপড়, ফুটো চাল—সব তার মা ইচ্ছে করলে সারিয়ে দিতে পারে।

কী করে?

এই যেমন তারা মায়েপোয়ে, ঠিক শোবার আগে হাত পা ধুয়ে—গরম কাল হলে রাস্তার কল থেকে জল এনে পরিষ্কার করে গা হাত পা মুছে বিছানায় শুত। তারপর গল্পের জগৎ। অনেককাল আগের সব গল্প। পুরোনো দিনের। সুখের দিনের। পুলিন তাই রাস্তায় গলিতে, আর পাঁচটা ছেলের মতো খেলেধুলে বেড়াতে পারেনি। কর্পোরেশন ইস্কুলে পড়ত সে। চুল আঁচড়ানো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি ছেলে। সে যে অন্যরকম তা সবাই বুঝত। তাই একবার সকলে তার ঘোর জ্বরবিকার হলে মাস্টারমশাইরা নিজেরাই তাকে কোলে করে বস্তিতে পৌঁছে দিতে এসেছিলেন। মার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তাঁরা মাকে আপনি আপনি করছিলেন। এটা পুলিন তখনই লক্ষ করেছিল।

একজন মাস্টারমশাই বলেছিলেন—সন্ধ্যার সময় ওকে নাইট স্কুলে পাঠান না কেন? ও সময়টা আপনি তো…

মা বলেছিল,—এটা তো আমার পেশা। এতে তো কোনো লজ্জা নেই বাবু! ও সব জানুক। তাতে কী?

মাস্টারমশাইদের একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন—আপনি কি এখানকার? মানে এখানেই জন্মটন্ম?

মা বলেছিল—না, আমি অনেক দূরের মানুষ! রংপুরের।

সেই পুলিন জেনেছিল। তার মা রংপুরের।

হারান বলল—কী হে? তুমি কিছু কিনবে না?

পুলিন বলল,—অ্যাঁ? হ্যাঁ, কিনব। বাইরে থেকে কম দামে কিছু তরি-তরকারি কিনব। আচ্ছা, হারান তুমি আলুর ডাল খেয়েছ?

—আলুর আবার ডাল কী?

—মা রাঁধত! আলুসেদ্ধ করে গলিয়ে জলের সঙ্গে মিশিয়ে—প্রচুর মটরশুঁটি, আমাদের নিজস্ব রংপুরের রান্না।

'আমাদের রংপুর' কথাটা খুব জোর দিয়ে বলল পুলিন।

হারান বলল, বাঃ বেশ ত!

আসলে পুলিন কোনোদিন রংপুরে যায়নি। আসলে পুলিনের মা কোনোদিন আলুর ডাল রাঁধেনি।

এসব তার আর তার মায়ের কিছু নিজস্ব খেলা। মা যখন শেষের দিকে, লোকের বাড়ি বাড়ি—বাসন মাজত, তখন ফিরে এসে স্নান করতে যেত। পুলিন ততক্ষণে ঘর ঝেড়ে মুছে বিছানা পেতে রাখত। মা পাশের ধোবানির উনুনে কিছু কয়লা ফেলে দিয়ে গরম গরম খিচুড়ি করে নিত। কিংবা মুড়ি কিনে আনত। তাই খেয়ে ওরা ঝাঁপ ফেলে দিত। তারপর মা বলত,—এবার পুলিন?

পুলিন বলত—হ্যাঁ মা!

—কী বাজার করলি বল?

বাজার কুড়োতে যেত রোজ পুলিন। বাজারের সেরা তরিতরকারি মাছ মাংস সে দূর থেকে দেখত। সেই সব তরিতরকারি মাছ মাংসর নাম সে তোতাপাখির মত আউড়ে যেত।

মা বলত—বেশ—বেশ বাজার হয়েছে। বাঁধাকপিটা কী সরেস।

টমেটোগুলো কী নিটোল! আহা, বাজারের সেরা কড়াইশুঁটি এনেছিস বাবা! কী ভালো—কটা উনুন জ্বালব বলতো? তিনটেই জ্বালি··হ্যাঁ রে সরবতি লেবু এনেছিস? এই ছাখো সরবতি লেবুই আনিস নি?—যা যা শিগগির রাজার বাগান থেকে ছিঁড়ে আন। অঢেল আছে।

তারপর শুয়ে শুয়ে তুজনের মিছি-মিছি রান্না হত। খেয়ে দেয়ে রেলে চাপা হত। খুপরিটা হত রেলের কামরা, আর ওদের তক্তপোশটা হত বাঙ্ক্। স্টেশনে স্টেশনে গরম চা খাওয়া হত। পুলিনের জন্যে বাড়তি গরম হুধ। বেশির ভাগ দিনই ওরা পুরী যেত। একটা না-দেখা সমুদ্রের বালিয়াড়িতে অজস্র না-দেখা ঝিনুক কুড়োত।

ঝুপঝুপ করে খানিকটা বৃষ্টি হয়ে গেল। হারান ছাতাটা খুলে বলল, মনে পড়ছে—আমার বিয়ের দিনে এমনি বৃষ্টি হয়েছিল। তুমি আর আমি বিয়ের বাজার করতে বাজারে এসেছিলাম।

—ও হ্যাঁ, তাই তো!

মনে পড়ে গেল পুলিনের। বছর তুই আগেই তো হারানের বিয়ে হয়েছিল। এমনি বৃষ্টি বাদলার দিনে। হঠাৎ সেদিন সেই বুড়ো গাছওয়ালাটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে সাহস করে একটা হাসনুহানার ছোট্ট চারা কিনে ফেলেছিল।

হারান হাঁ হাঁ করে উঠেছিল,—গাছ! কোথায় রাখবে? গাছের জায়গা কোথায়? মরে যাবে!

পুলিন মনে মনে বলেছিল, তুমি একটা আস্ত বউ পুষতে পারো আর আমি একটা গাছ পুষতে পারব না। এখন তাই হারানের বউ আর গাছটাকে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে পুলিন।

মুখে কিছু বলে না।

বিয়ের সময় ওই পুতুলের মতই ঝকঝকে চেহারা ছিল পুষির। প্রথম দিকে স্যাঁতস্যাঁতে রোদহীন দালানে থেকে সত্যিই হাসনুহানা গাছটা নেতিয়ে পড়েছিল। যদি না হঠাৎ দেওয়াল খসে গিয়ে চাতালটা বেরিয়ে পড়ত—তা হলে গাছটা হয়তো সত্যিই মরে যেত।

কিন্তু পুতুল যে আজ তার বুকের মাঝখানে একদম গজাল গেড়ে দিল। বলল, আর বাঁচবে না গাছটা!

হঠাৎ পুলিনের মনে পড়ল। তার বন্ধু ক্লিনার রঘুনাথ কাকদ্বীপগামী কোন্

বাসে কাজ করে।

রাতে শোবার আগে সদরে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছিল হারান আর পুলিন। হারান যেন কেমন অযথা ছটফট করছিল। ঘরে ঘরে সবাই ঘুমিয়ে গেছে। প্রেস এখনই বন্ধ হল। কেবল পুষি খামোখা কাজ বাড়াচ্ছে। আর উঠোনের পাশের প্যাসেজে বসে পুতুল একমনে খোলামকুচি নিয়ে খেলা করছিল।

পুলিন ভিতরে ঢুকতেই পুতুল বলল—তোমার গাছটা কাছ থেকে দেখে এলাম।

পুলিন বলল—ওই সিঁড়ির খাঁজ বেয়ে তুমি ওপরে উঠেছিলে ?

—হ্যাঁ, এখন জোছ্‌নায় ভাসছে, কিন্তু বাঁচবে না। সব শেকড়। সব শেকড়। আজ মরলেও মরবে। কাল মরলেও মরবে।

পুষির ছেলেটা কেঁদে উঠতেই উনুন সাজানো ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। কম পাওয়ারের বাল্বের হলদে আলোয় পুলিন এক ঝলকে যা দেখলো তা কেবল শেকড় শেকড় আর শেকড়। হাতে গলায় বুকে কণ্ঠায় নিম্নমুখী স্তনে কেবলই শেকড়।

পুষিও ছেলেকে দুধ দিতে দিতে বলল—হ্যাঁ, মাটির চেয়ে সত্যিই শেকড় বেশি হয়ে গেলে গাছ বাঁচে না।

পুলিন পুতুলকে পেরিয়ে গুটি গুটি নিজের আস্তানায় গেল হাত মুখ ধুয়ে। খালি গায়ে, পরিষ্কার একটা ধুতি দু পাট করে পরে সে ঠিক ওপরের সেই ফাঁকা আয়তক্ষেত্রটার রুজুরাজি তার বিছানাটা পাতল। এখনো মায়ের তৈরি কাঁথাটা সবার ওপরে পাতে। যদিও কাঁথার ওপরের নরম কাপড়টা ছেঁড়াছেঁড়া হয়ে গেছে। একটু বাদেই—চাঁদের চৌকোণা আলোটা সরে সরে এসে পড়ল বিছানায়। পুলিন হাতটা লম্বা করে দিল। তার হাতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল হাস্নুহানার ছায়াটা। ফুটন্ত হাস্নুহানার গন্ধে মাত হয়ে যাচ্ছিল পুলিনের ছোট্ট খোঁদলটা। একটি সুগন্ধি সুন্দরী সবুজ মেয়ের ছায়া বুকে মেখে নিয়ে শোয়ার তৃপ্তিতে দু চোখ বুজে এলো তার।

মাঝ রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল পুলিনের ; হাস্নুহানার ছায়াটা তখন তার পায়ের কাছে উপুড় হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। পুলিন ঘুম চোখেই উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

চাতালের ওপর গিয়ে দাঁড়ালো একা।

তখন চাঁদ একেবারে মাথার ওপর। নিঝুম, নিশুতি। ঝলমলে সবুজ

রাংতার মতো ঝলমল করছে হাস্নুহানা গাছটা। সারা গায়ে যেন জরির কল্কা দেওয়া সবুজ বেনারসী। কপালে চাঁদের সোনার সিঁথি মৌর। একটা ষোল বছরের যুবতীর সব সুগন্ধ আর সরলতা নিয়ে নিজের ভবিষ্যত না জেনে খিলখিল করে হাসছে।

চাপা গলায় পুলিন বলল—আমি তোমায় কিছুতেই মরতে দেব না। তুমি থাকবে। বেঁচে থাকবে!

কিন্তু কদিন বাদে?

শিউরে উঠলো পুলিন। সে দেখতে পেলো নুয়ে পড়া হলদেটে একটা মনমরা গাছের ছবি। কেবল শিকড়! কেবল শিকড়! পুলিন দ্রুত নীচে নেমে এসে প্যাসেজে বেরিয়ে চোখে মুখে জল দিতে গিয়ে দেখে পুতুল প্যাসেজের ময়লাটে চাঁদের আলোয় একা একা বসে খোলাম কুচি নিয়ে খেলছে। পুলিন কাছে এসে দাঁড়াতেই একটু সিঁটিয়ে গিয়ে বলল,—তুমিও কি জামাইবাবুর মতো আমাকে বিরক্ত করবে? কালই তো চলে যাব। আর কেন?

পুলিন বুঝতে পারল হারান নিশ্চয়ই পুতুলকে…থাকগে…পুলিন কথা ঘোরাবার জন্য বলে,—তুমি কি বেশি খোলামকুচি নিয়ে খেল পুতুল?

—হ্যাঁ বেশি! সেই যে তুমি যেমন ভাবতে শিখিয়েছিলে?

—ঠিক তেমন করে! যেমন এই যে

চিৎ হলে রাজপত্তুর
উপুড় হলে খাঁ খাঁ
চিৎ হলে সোনার সংসার
উপুড় হলে খাঁ খাঁ
চিৎ হলে রাঙা খোকা
উপুড় হলে…

হঠাৎ হু হু করে কেঁদে উঠল পুতুল—উপুড় হলে সব শেষ!

কিন্তু পুলিন অন্ধকারে হেসে উঠল। তার মায়ের কথা মনে পড়ল। তার মা যে বেঁচে গিয়েছিল শুধু—

মা জগৎ বানাতে পারত।

পুতুলও জগৎ বানাতে শিখেছে।

পুলিন আস্তে আস্তে পুতুলকে তুলে নিল। পুলিনের ধরার ভঙ্গি দেখে পুতুল কোনোরকম ভয় পেলো না। পুলিনের কাঁধে ভর দিয়ে পুতুল পুলিনের খোপে

গেল। চাঁদের ঢল নামা বিছানায় পুতুলকে শুইয়ে দিয়ে পুলিন বলল,—কাল আমরা কোথায় যাবো বলো তো?

—হাসপাতালে।

—না। আমরা যাবো কাকদ্বীপ! বাসে চেপে। তুমি, আমি, আর ও'—হাস্নুহানার দিকে আঙুল দিয়ে দেখালো পুলিন!

—তারপর? সানন্দে বলল পুতুল।

পুলিন বুঝলো পুতুল সব ভুলে গিয়ে একমনে তার গল্প শুনছে।

—তারপর কাকদ্বীপে গিয়ে একটা ভালো জায়গায় ভালো মাটি যেখানে, খুঁজে নিয়ে ওকে রেখে আসব—কেমন?

পুতুল ঝিলমিলে চোখে বলল,—আমি খুঁজে দেবো। আমি ভালো মাটি চিনি! তারপর?

—তারপর আমরা একটা চিহ্ন দিয়ে আসবো!

—হ্যাঁ, সে বেশ হবে। আমরা মাঝে মাঝে ওকে দেখতে যাবো। ও অনেক মাটি পাবে। শেকড় ছড়িয়ে বাড়বে। নতুন নতুন গাছ দেবে!

পুলিন চাঁদের আলোমাখা পুতুলের ছোট্ট কপালটি ছুঁয়ে বলল,—এবার সত্যি করে বলো তো খোলামকুচি চিত্ হয়েছিল?—না উপুড়?

—কখন?

—যখন রাঙা খোকা চেয়েছিলে।

পুতুল পুলিনের বুকে মুখ রেখে বলল,—সত্যি কথা বলবে?

—হ্যাঁ!

—চিত্।

———



গোত্রবদল

মীরা বালসুব্রমনিয়ন

পকেট থেকে টাকা বার করে দিতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল বারীন। এতক্ষণ শুধু ব্যাগের দিকেই চেয়ে দেখেছে—এবার দোকানের মেয়েটির দিকে চোখ পড়ল ওর। অবাক হয়ে বলে উঠল, আরে ছায়া না?'

বারীনের পছন্দ করা জুটের ব্যাগটা কাগজে মুড়তে মুড়তে অল্প একটু হাসল ছায়া। বলল, 'তা হলে এতক্ষণ পর চিনতে পারলে বারীনদা—'

আমতা আমতা করে বারীন বলল, 'মানে ক' বছর দেখিনি তো। বেশ রোগা হয়ে গেছ তুমি—অনেক বদলে গেছ। তা ছাড়া ঠিক এ জায়গায় তোমাকে দেখবো ভাবিনি তো।'

'এবার মুখ তুলে ভালো করে হাসলো ছায়া। বলল, 'অনেকেই একথা ব'ল। ও'দিকের বড় শাড়ীর দোকানের সেলস্ গার্ল হলে অবাক হতে না নিশ্চয়। কিন্তু ফুটপাথের এ পাশে নিজে দোকান করেছি বলে খারাপ লাগছে তোমার—না?'

'কিন্তু এভাবে এখানে দোকান চালানো মানে—'

বারীনের কথা শেষ হবার আগেই এক মোটা মতন ভদ্রমহিলা এসে বললো 'মেয়েদের স্কুলে নেবার মত জুট ব্যাগ আছে? কম দামের মধ্যে?'

'আছে। কী ধরনের চাই? নার্সারী না হাইস্কুল?'

'নার্সারী। একটু দেখে রঙচঙে দেবেন।'

ওপরের তাক থেকে ব্যাগের বাণ্ডিলটা নামিয়ে ছায়া বারীনের দিকে ফিরে বলল, 'এবার তুমি এসো বারীনদা। তোমারও দেরী হয়ে যাবে—আমিও

ব্যস্ত থাকবো। এখন আমার খদ্দের আসার সময়।

একটু ইতস্তত করে বারীন বলল, 'আবার দেখা হবে তো?'

'এপথ দিয়ে গেলেই দেখা হবে—' বলে কয়েকটা রঙচঙে ব্যাগ ভদ্রমহিলার দিকে এগিয়ে দিল।

ছায়া বারীনকে বলল বটে খদ্দেরের আসার সময় এটা। কিন্তু ঐ ভদ্রমহিলা চলে যাবার পর অনেকক্ষণ কোন খদ্দেরই এলো না। গড়িয়াহাট মোড়ের ওপর এদিককার এই ফুটপাথে চেনা বেশ কয়েকটা ব্যাগের দোকান আছে। সব দোকানেই প্লাষ্টিক ফোম, ক্যানভাস আর জুট ব্যাগের ছড়াছড়ি। খদ্দের এলে যে ওর দোকানেই শুধু আসবে, এমন নয়। অবশ্য এই ফুটপাথের দোকানীদের মধ্যে ছায়াই একমাত্র মেয়ে, তাই প্রথম প্রথম কিছু বেশী লোকের ভিড় হতো ঠিকই। কিন্তু বছরখানেক কেটে গেছে, মেয়ে হকারে আর কোন নূতনত্ব নেই। তা ছাড়া যখন ভিড় বেশি হতো তখনও মজা দেখার লোকই ছিল বেশি—ক্রেতা কম।

পথচারীদের দিকে তাকিয়ে বারীনের কথাই ভাবছিল ছায়া। হঠাৎ বারীনের সঙ্গে এভাবে দেখা হয়ে যাবে ও নিজেও ভাবেনি। ছায়ারা ঢাকুরিয়ার ঝিল রোডে ছোট্ট একখানা বাড়িতে ভাড়া থাকে। একতলায়। সেই বাড়িরই দোতলা ভাড়া নিয়ে এসেছিলেন বারীনের বাবা। ছায়া তখন ক্লাস নাইনে। কানপুরে কাজ করতেন বারীনের বাবা। রিটায়ার করে এলেন এই ঢাকুরিয়ায়। কিন্তু সরকারী কাজে রিটায়ার করলেও বেশ শক্তসমর্থ ছিলেন বারীনের বাবা। জানাশোনাও ছিল। তাই এসেই বিজনেস করার চেষ্টায় লেগে গেলেন। বারীন কানপুর কলেজে পড়তো। কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সীতে ইকনমিকস অনার্স নিয়ে ভর্তি হলো। বারীনের বাড়ির সবাই বেশ মিশুকে, তাই দুই পরিবারের মধ্যে সহজেই একটা হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল—যদিও সাধারণ স্কুল-মাস্টার ছায়ার বাবার আর্থিক অবস্থা ছিল বারীনের বাবার চেয়ে অনেক খারাপ।

দুই পরিবারের মধ্যে যেটা গড়ে উঠেছিল সেটা সাধারণ হৃদ্যতা ও বন্ধুত্ব—কিন্তু বারীন ও ছায়ার বন্ধুত্বে ক্রমশ একটি বিশেষ রঙ ধরতে লাগলো। কিশোরী ছায়ার চোখে ছিল রোমান্সের স্বপ্ন। বারীনের মুগ্ধ দৃষ্টির অর্থ বুঝে নিতে দেরী হোলো না ছায়ার। কিন্তু বারীন ছিল মুখচোরা···কিছুতেই মনের কথাটা ছায়াকে বলে উঠতে পারতো না...যদিও ছায়ার অজানা ছিল না

কিছুই। শেষ পর্যন্ত বারীন হঠাৎ ছায়াকে একটা চিঠি লিখে মনের কথা জানিয়ে বসলো। তারপর সন্ধ্যায় লেকের ধারে বসে হাতে হাত দিয়ে দু'জনে অঙ্গীকার করলো কখনো একজন আরেকজনকে ছেড়ে যাবে না।

কিন্তু ক' মাস পরেই হঠাৎ পাড়া ছেড়ে দিলেন বারীনের বাবা। ইদানীং ওঁর বিজনেস বেশ বড় হয়ে উঠেছিল। শোনা গেল একটা বড় অর্ডারে অনেক লাভ করেছেন তা ছাড়া পুরোনো চাকরির প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডটাও হাতে এলো এতদিনে। নিউ আলিপুরে বেশ বড় একখানা বাড়ি কিনে বসলেন উনি। ওঁরা নিউ আলিপুরে চলে গেলেও কিছুদিন পর্যন্ত দুই পরিবারই যাওয়া-আসা বজায় রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ঝিল রোডের বাসিন্দারা নিউ আলিপুরে গিয়ে স্বচ্ছন্দ হতে পারলেন না...আবার নিউ আলিপুরের বাসিন্দাদেরও কিছু দিন বাদেই মনে হতে লাগলো ঝিল রোডের আশপাশ আর কাঁচা নর্দমায় বড্ড নোংরা...বাসিন্দারা সবাই দীনহীন, ছেলেগুলোর লোফারের মত চেহারা, আর সবচেয়ে বড় কথা, সরু ঝিল রোডে ওদের নতুন কেনা বড় গাড়ীটা ঘোরানো যাবে না।

দুই পরিবারের মধ্যে দূরত্ব গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ছায়া আর বারীনের সম্পর্কেও চিড় ধরতে শুরু হয়েছিল। নতুন পাড়ায় নতুন বন্ধু জুটলো বারীনের—নতুন ক্লাবের মেম্বার হলো। ছায়ার সঙ্গে দেখা করার সময়ের অভাব হতে লাগলো। ছায়া অনুযোগ করলে বারীন একদিন বলে বসলো 'নিউ আলিপুর থেকে এই ধ্যাদ্ধেড়ে গোবিন্দপুরে আসতে কত সময় লাগে জানো, মেসোমশাইকে বলে বাসাটা বদলাও না কেন? টালিগঞ্জের ওদিকে...'

সেই কাঁচা বয়সেও ছায়ার আত্মসম্মান জ্ঞানটুকু টনটনে ছিল। তীক্ষ্ণ গলায় বলেছিল, 'এতদিন তো সেই ধ্যাদ্ধেড়ে গোবিন্দপুরেই থাকতে। এখন বড়লোক হয়েছ, এখানে আসতে মানে লাগছে বুঝি?'

'না,—না,—তা নয়।' বারীনকে অপ্রস্তুত দেখিয়েছিল। 'দূর অনেকটা তাই। তা ছাড়া বাবা বলেছেন আই, এ, এস, দিতে। পড়াশোনা'র চাপও আছে।'

'তুমি আই, এ, এস, দিচ্ছ বুঝি?'

'হ্যা। তাই বলছিলাম, এত দূরে ঘন ঘন আসা অসুবিধে—'

বাড়ি ফেরার পথে ছায়া ভেবেছিল বারীনের এতদূরে আসতে অসুবিধে হয়। ছায়াকেও তো ও বলতে পারতো নিউ আলিপুরে যেতে?...বারীন বললে ছায়া

রোজ যেতো, যত দূরেই হোক। আসল কথাটা কী এই নয় যে বারীন চায় না ওদের সম্পর্কটা বজায় থাকুক।

ছায়া আরও ভাবলো, বারীন আই, এ, এস দেবে—পাশও করবে নিশ্চয়। বড চাকরী করবে। ছায়ার নাগালের বাইরে চলে যাবে। আজ নয় তো কাল। ছায়ার বাবা সব সময় বলেন—নাগালের বাইরে কিছু চাইতে নেই। দুঃখ পেতে হয়। ছায়াও সে কথা বিশ্বাস করে।

ছায়া এরপর বারীনের সঙ্গে আর দেখা করেনি। বারীন দু-একখানা চিঠি দিয়েছিল, কিন্তু তা পড়ে এমন মনে হয়নি যে ছায়ার অদর্শনে ওর বুক ফেটে যাচ্ছে। সম্পর্কটা শেষ পর্যন্ত ছায়াই কাটালো। তাতে হয়তো বারীন স্বস্তিই পেয়েছিল।

তারপর এই আজ দেখা। কাগজে পড়েছে ছায়া বারীন আই, এ, এস-এ খুব ভাল রেজাল্ট করেছে। হয়তো এতদিনে জেলায় জেলায় ঘোরা শেষ করে রাইটার্স বিল্ডিং-এ পোস্ট বাগিয়ে বসেছে! ছায়াকে সে চিনতে পেরেছে এই ভাগ্যি। তার ওপর আবার দেখা করতে চেয়েছে। আপন মনেই একটু হাসে ছায়া। কাটা কাটা কথা শোনালেও বারীনের জন্য মনটা কেমন করে ওঠে। পুরোনো কথা মনে হয়ে যায়। বারীনের মন অন্য কোথাও নোঙর গেড়েছে কিনা জানে না ছায়া। কিন্তু ওর নিজের জীবনে এখনও আর কেউ আসেনি। এমনও তো হতে পারে আজকের দেখায় পুরনো কথা মনে হয়ে যাবে বারীনের, ছায়া নিজে যেচে দেখা করতে যাবে না নিশ্চয়ই। তবে বারীন যদি আসে, সম্ভাবনাটা সুদূর হলেও ছায়ার মনে একটুখানি আশা জেগে ওঠে, সব রকম যুক্তিকে অগ্রাহ্য করেই।

রাত্রে খেতে বসে ছায়া মাকে বলে, 'মা, আজ কার সঙ্গে দেখা হলো জানো? বারীনদার সঙ্গে।'

'কোন বারীন? ও, সেই যে আমাদের ওপরতলায় থাকতো, অনেক বড় অফিসার হয়েছে না? বিয়ে থাওয়া করেছে? কোথায় দেখা হলো?'

ছায়া হেসে বলে, 'এক সঙ্গে অতগুলো প্রশ্ন করলে কোনটার জবাব দেবো বলো তো? হ্যা, সেই বারীনদাই। বড় চাকরী করে নিশ্চয়ই। তবে বিয়ে করেছে কিনা জিজ্ঞেস করিনি।'

'ওমা। তা চিনলো তো থানকয়েক?'

'খানকয়েক কিনতে যাবে কেন? যা দরকার তাই কিনেছে।'

মা বিরক্ত স্বরে বলেন, 'তোর আর বুদ্ধি কবে হবে ছায়া। এই বজিস বিক্রি নেই। চেনা লোক পেয়েও খানকয়েক গছাতে পারলি না? ওরা বড়লোক, একটার জায়গায় পাঁচটা ব্যাগ কিনলেও গায়ে ফোস্কা পড়বে না।'

মাকে বোঝানো যাবে না যে আর যার কাছেই জোর করে জিনিষ গছাতে পারুক ছায়া, বারীনের কাছে পারবে না। আলোচনার ছেদ টানে ও। কিন্তু রাতে শুতে যাবার সময় রাস্তাব দিকের জানালাটা বন্ধ করার আগে তারা ভরা আকাশের দিকে চেয়ে ভাবে ছায়া বারীন কি আসবে?

বারীন আসে। দু' দিন পর। রাত আটটা বেজে গেছে। ছায়া তখন দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে ব্যস্ত। দোকানের মাল দুটো ট্রাঙ্কে বন্ধ করে সামনের বড় দোকানে উঠিয়ে রাখে ছায়া। মাসিক ভাড়ার বিনিময়ে।

বারীনকে আসতে দেখে ছায়ার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আগের দিনে একটু রূঢ়ভাবেই বিদায় দিয়েছিল তাকে। আজ হেসে বলে, 'কী আবার ব্যাগ চাই নাকি?'

'কিছু কিনতে আসিনি। কথা বলতে এলাম। কদ্দিন পরে দেখা বলো তো?'

'তা অনেক দিন হবে। কিন্তু ইচ্ছে করলেই তো দেখা করতে পারতে বারীনদা। ঠিকানা তো জানাই ছিল।'

বারীন মুখ নামিয়ে বলে, 'জীবনে অনেক সময় ভুল হয়ে যায় ছায়া।' তারপর ছায়ার চোখে চোখ রেখে বলে, 'চল না, কোথাও একটু কফি খাওয়া যাক। তোমার দোকান তো বন্ধ করেই ফেলেছ।'

'বড় অফিসার হয়ে তোমার সাহস বেড়ে গেছে বারীনদা—' ছায়া হাসে। নিজেকে ওর খুব হালকা মনে হয়, 'চলো, কোথায় যাবে—'

'ও পাশের রাস্তায় গাড়ি রেখেছি।'

'গাড়ি থাক।' কাছাকাছি কোথাও চলো।'

রাসবিহারীর ওপর একটা রেস্তোরাঁর দোতলার একটা কেবিনে এসে বসে ওরা। কফি আর কাটলেটের অর্ডার দেয় বারীন। সারা দিনের ক্লান্তির পর গরম কফিতে চুমুক দিয়ে ভালোই লাগে ছায়ার। বারীনের দিকে চেয়ে বলে, 'বলো, তোমার সব শুনি।' কী একটা বলতে গিয়েও ইতস্তত করতে থাকে বারীন। বড় অফিসার হয়েও ওর মুখচোরা ভাবটা যায়নি—সকৌতুকে লক্ষ্য

করে ছায়া।

খানিকক্ষণ ইতস্তত করে কথাটা বলেই ফেলে বারীন, 'ছায়া, আমাদের ভেঙে যাওয়া সম্পর্কটা আবার জোড়া লাগানো যায় না, আবার বন্ধু হতে পারি না আমরা?'

ছায়া হেসে বলে, 'কেন, তোমাদের সমাজে সম্পর্ক গড়ে তোলার মতো কাউকে খুঁজে পাওনি?'

বারীন এবার মুখ তুলে বলে, 'পাবো না কেন? কিন্তু তারা তো ছায়া নয়।'

হেসে বারীনের কথাটা উড়িয়ে দিতে গিয়েও থেমে যায় ছায়া। অকারণেই মুখটা লাল হয়ে ওঠে, বুকের ধুকধুকুনি বেড়ে যায়। আস্তে আস্তে বলে, 'ছায়াকে যে তোমার এত দরকার সে কথা কী এতদিনে বুঝতে পারলে? যখন অনেক দেরী হয়ে গেছে?'

'কে বলল, দেরী হয়ে গেছে? আমি তো আজো একা। দেখে মনে হচ্ছে তুমিও। অবশ্য যদি অন্য কেউ তোমার জীবনে এসে থাকে—'

ছায়ার ইচ্ছে হয় অনেক দিন আগেকার মত বারীনের হাতের ওপর হাত রেখে বলে, 'না, কেউ আমার জীবনে আসেনি। এক তুমি ছাড়া।' কিন্তু জীবন যুদ্ধে পোড়খাওয়া ছায়া আর চট করে নিজেকে মেলে ধরতে পারে না। তাই হালকা সুরে বলে, 'কেউ এসে থাকলে তো বুঝতেই পারতে।'

বারীন এতক্ষণ শিরদাঁড়া সোজা করে বসেছিল। এবার চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসে। সিগারেট ধরায়। আরেক প্রস্থ কফির অর্ডার দেয়। ওর মুখ দেখে মনে হয় যেন আগেকার দিনে ফিরে গেছে। ছায়াদের বাড়ির সবার কুশল জিজ্ঞেস করে। ছায়ার প্রশ্নের জবাবে নিজেদের সবার খবরাখবর দেয়। বারীনের বাবা মারা গেছেন গত বছর। বোনের বিয়ে হয়েছে এক চার্টার্ড অ্যাকাউট্যান্টের সঙ্গে, ছোট ভাই এম, এস, সি দেবে এবার।

তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করে, 'হায়ার সেকেণ্ডারীর পর তুমি আর পড়নি—না?'

'পাশ তো করলাম টেনেটুনে। মিছিমিছি কলেজে ঢুকে পয়সা নষ্ট করে কী হবে? তা ছাড়া বাবা রিটায়ার করলেন—আমিই বড় সে কথা মনে আছে তো?'

'অন্য কোন ট্রেনিং নিলে না কেন? শর্টহ্যাণ্ড, টাইপিং, কিংবা

সেক্রেটারীসিপ? আজকাল তো কতরকম কোর্স'ই চালু হয়েছে।'

হঠাৎ যেন সুর কেটে যায়। বারীনের দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে ছায়া বলে, 'অর্থাৎ অন্য কিছু না করে ফুটপাথে দোকান করেছি কেন, এই তো?'

'না, না, তা বলছি না—' বারীনকে আবার অপ্রস্তুত দেখায়।

'জবাবটা তোমাকে সংক্ষেপে দিচ্ছি, বারীনদা। টাইপিং শিখেছিলাম, চাকরি পাইনি। মুরুব্বির জোর ছাড়া আজকাল চাকরি হয় না। আমার জন্য সুপারিশ কে করবে? জানো তো, বাবা উপোস থাকবেন তবু কারুর কাছে মাথা নোয়াবেন না। আমি তাঁরই মেয়ে। এর চেয়ে স্বাধীন ব্যবসা করছি, মন্দ কী?'

'আমাকে জানালে না কেন? কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারতাম নিশ্চয়ই।'

ছায়া একটু অবাক চোখে তাকায় বারীনের দিকে। বারীন কি ভেবেছে পুরোনো সম্পর্কের জের টেনে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দাঁড়াতে পারত ছায়া? একটা রূঢ় উত্তর মুখে এসে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সামলে নেয়। কী হবে বলে? বারীন বুঝতে পারবে না। নানাভাবে নিজেকে ছোট করার চেয়ে মাথা উঁচু করে এই যে ব্যবসা করছে ছায়া···এর মূল্য বুঝতে পারবে না বারীন। আর বারীনকেই শুধু দোষ দেয় কেন। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনরাই কী বুঝতে পেরেছে? বরং এটাকে ছায়ার গোঁয়ার্তুমি বলেই ধরে নিয়েছে। কিন্তু ছায়া তো নিজে জানে মাঝের ক'টা বছর কী কষ্ট গেছে ওর। বাবা রিটায়ার করার পর সংসারের আয় ঝপ করে অর্ধেক হয়ে গেছে। মা বাবা কখনো কিছু বলেন নি, তবে কিছু করতে না পারার গ্লানিতে ছায়া প্রতিদিন দগ্ধ হয়েছে। তা ছাড়া নিজের টুকিটাকি খরচও তো আছে। দু' একখানা বাইরে যাবার মত শাড়ী ব্লাউজ···অল্পস্বল্প প্রসাধনী, মাসে দু' এক দিন সিনেমা। নিজের চোখে দেখেছে ছায়া আশেপাশের কত মেয়ে একখানা ভালো শাড়ী, দামী স্নো পাউডার আর রেস্তোর'ায় খাবার বিনিময়ে নিজেদের কত নিচে নামিয়েছে। কিন্তু ছায়া এমন হতে চায় নি। তাই অন্য উপায় না দেখে হাতের চুড়ি বালা বিক্রি করে এই ছোট্ট দোকান দিয়েছে ফুটপাথে।

বারীন বুঝবে না এত কথা। তাই হালকা গলায় ছায়া বলে, 'তা দাও না একটা ভালো চাকরি। পেলে দোকান তুলে দেবো। তা হলে—'

টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বারীন বলে, 'হ্যাঁ, আমিও তাই বলছি ছায়া।

দোকানটা তুলে দাও, এখনই। মানে, আমার মা ব্যাপারটাকে ঠিক কী চোখে দেখবেন জানি না। আর চাকরী দিয়ে কি হবে? আমি যা রোজগার করি তাতে কুলোবে না তোমার?'

ছায়া কফির পেয়ালার দিকে তাকিয়ে ভাবে এমন দিন যে তার জীবনে আসবে কে ভেবেছিল। বারীন শুধু ফিরেই আসেনি, তাকে জীবনের সঙ্গী করে নিতে চাইছে, দিতে চাইছে সম্মান স্বাচ্ছন্দ্য। এর বেশী একজন মেয়ে আর কী চাইতে পারে জীবনে, বিনিময়ে বারীন চাইছে ছায়ার জীবনের গত একটা বছরকে মুছে ফেলতে। কিন্তু পারবে কি? বিগত সময়কে কী ইচ্ছে করলেই মুছে ফেলা যায়? তা যদি না যায় তবে ছায়ার জীবনের এই একটা বছর কী বারীনের সুখী সম্মানিত জীবনে বিষ ফোঁড়ার মত হয়ে দাঁড়াবে না, যে বছরটা নিয়ে ছায়ার গর্বের অন্ত নেই, সেই বছরটাকেই জগতের চোখ থেকে প্রাণপণে লুকিয়ে রাখতে চাইবে বারীন। একজন আই, এ, এস অফিসারের স্ত্রী একদা মেয়ে হকার ছিল একথা তো ভাবাই যায় না। অন্তত বারীনদের সমাজে।

বারীন তখনো ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে জবাবের আশায়। মুখটা তুলে বেশ মিষ্টি করে হাসে ছায়া। বলে, 'মেয়ে হকার হলে কি হবে, নাকটা আমার এখনো উঁচুই আছে, বারীনদা। জোড়াতালি একদম পছন্দ নয় আমার। এর চেয়ে এই ভালো। মাঝে মাঝে দেখা হবে—কফি খাওয়াবে··· আমার দোকান থেকে জিনিস কিনবে। আমি সবাইকে জাঁক করে বলে বেড়াবো, এত বড় অফিসার হয়েও একজন মেয়ে হকারকে ভোলে নি আমাদের বারীনদা, আচ্ছা, এবার আমি উঠবো, রাত হলো।'

বারীনকে আর কথা বলার অবকাশ না দিয়েই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো ছায়া।

———



ঊর্মি

কণা বসু মিশ্র

ঊর্মি বসে বসে খাতা দেখছিল। ওর ভুরু দুটো ধনুকের মতন বেঁকে উঠছে মাঝে মাঝে যখন লাল পেন্সিলের কড়া দাগে খাতার প্রায় প্রতিটি পাতাই ভরে যাচ্ছে। এত ভুল লেখে মেয়েরা! আলেকজাণ্ডার কালিন্দী পর্বত অতিক্রম করে ভারত আক্রমণ করেছিলেন! হিন্দুকুশ লিখতে লিখেছে কালিন্দী। আর ওদিকে আকবরের সভার নবরত্নের মধ্যে একজন ছিলেন যদুভট্ট। কোথায় তানসেন লিখবে, তা না, লিখেছে যদুভট্ট; এসব কথা পড়ে ঊর্মি হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না। স্কুলে আর পড়াতে ভাল লাগে না। দু দিন পর পর শুধু উইক্লি টেস্ট আর মান্থলি টেস্টের ঘটা: গাদা গাদা খাতা ছাখো। আর তারপর যদি একটাও ভাল খাতা হয়। অথচ ক্লাসে পড়ানোর সময় ওরা এমনভাবে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে যেন মিস্ যা বলছেন, সব বেদবাক্যের মতন শুনে যাচ্ছে। ঊর্মির মনে হয়, প্রেম করে করেই মেয়েগুলোর এই অবস্থা হয়েছে। অল্প বয়েসে পাকামী করলে যা হয়। আজকাল সেভেন এইটের মেয়েরাও যা পাকা! এই তো সেদিন সুগতর সঙ্গে বাঁধ দেখতে গিয়ে ঊর্মি কয়েক ডজন ছাত্রীর মুখোমুখি হয়েছিল, যাদের সঙ্গে রয়েছে অতিআধুনিক হিপিমার্কা যুবকেরা। ঊর্মিকে দেখেও ওদের কোনরকম সঙ্কোচ হয়নি। বরং অজস্র গুড ইভনিং শুনিয়ে শুনিয়ে ওরা মিসকে পাগল করে তুলেছিল। হলের অন্ধকারে ওদের চাপা হাসি আর ফিস্‌ফিসানির জ্বালায় ঊর্মি অস্থির হয়ে উঠেছিল। সুগতকে নিয়ে পালিয়ে আসতে পারলে যেন বাঁচে।

সকাল থেকে একটানা বৃষ্টির পর এখন একটু রোদ উঠেছে। অবশ্য বাতাসে

বাদলার ছোঁয়া এখনও রয়েছে। তবুও ঘরে ফ্যান চলছে। উর্মির গরম বোধটা একটু বেশী। তারপর আবার এই খাতার বোঝা ওকে রীতিমত কাহিল করে ফেলেছে। মনে মনে ছটফট করছে, কখন এই দায় থেকে সে উদ্ধার পাবে। কলেজে একটা কাজ পেলে হত। প্যানেলে ইন্টারভিউ দিয়েছে কিন্তু কোন লাভই হয়নি। সুগতরও কোন একটা হিল্লে হল না। সমানে ইন্টারভিউ দিয়েই চলেছে। চাকরি আর হচ্ছে না। এখন দিল্লিতে গেছে ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়াতে একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিতে। কাজটা ওর হবে বলে মনে হয় না। একটা পাকাপাকি কাজ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে করতে পারছে না সে উর্মিকে। এদিকে বিয়ের অজস্র সম্বন্ধ আসছে ওর। বাবা-মার কথার অবাধ্য না হয়ে পাত্রপক্ষের কাছে দু-একটা ইন্টারভিউও দিয়েছে উর্মি। তার মধ্যে একজন সিভিল এঞ্জিনিয়ারও আছেন। তিনি এখন মাইথনে। আর সব সম্বন্ধগুলো নাকচ হয়ে গেছে। শুধু এইটেই ঝুলছে। কেননা, পাত্রের বড় বেশী ভাল লেগে গেছে উর্মিকে। মা বাবারও ইচ্ছে এখানেই হোক। বেকার এঞ্জিনিয়ার সুগতর হাত থেকে তাঁদের মেয়েটা অন্তত রেহাই পাক। অথচ উর্মির পছন্দ নয় সেই পাত্রকে সুগতকে তার জীবনের কোন একটা সমস্যা বলেই মনে করে না উর্মি। ওকে যে বিয়ে করতেই হবে, এমন কোন দাসখতও লিখে দেয়নি সে। আসলে ভদ্রলোককে ওর খুব উন্নাসিক মনে হয়েছিল। খাবার প্লেট সামনে রেখে মা যখন তাকে বললেন, খাও বাবা, লোকটা তখন চাবির রিঙ দোলাতে দোলাতে বলেছিল, অন্‌লি এ কাপ অব টি। —ব্যাপারটা খুব বিসদৃশ লেগেছিল উর্মির। সাধারণ এক বাঙালী বয়স্কা মহিলার এই আন্তরিকতাটুকু প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে আর যাই হোক, বাহাদুরী কিছু নেই। টেলিফোন বেজে উঠল হঠাৎ।

উর্মির ইচ্ছে করছিল না। হলঘরে গিয়ে ফোন ধরতে হবে। সিম্‌কুটা করছে কি? ফোনটা ধরতে পারছে না? কিছুক্ষণ আগে তো ওর কলরব শোনা যাচ্ছিল, ডায়ভুকে নিয়ে পিংপং বল খেলছিল সিম্‌কু। এখন বেলা দুটো। এই অসময়ে ফোন করলই বা কে? সুগত সাধারণত এই সময় ফোনটোন করে। কিন্তু সে তো এখন কলকাতার বাইরে। ফোনটা বেজেই চলেছে। বেজে বেজে থেমে গেল ফোন। আবার নতুন করে রিঙ হতে থাকল। উর্মি ততক্ষণে আরেকখানা খাতা টেনে নিয়েছে। ও জোরে চেঁচিয়ে ডাকল, সিম্‌কু, সিম্‌কু!

সিম্‌কু বাইরে গাড়িবারান্দা থেকে চেঁচিয়ে বলল, অত চেঁচাচ্ছিস কেন পিসি,

ষাঁড়ের মতন?—ঊর্মি থমকে গেল। অতটুকু ছেলের মুখে কী কথা! ও বলল, এই, খুব পেকেছিস তো। যা, ফোনটা ধর।

সিম্কু তবুও ফোন ধরল না, দরজার কাছে এসে বুড়ো আঙুল দেখালো। তারপর ডায়ভুর চোখের সামনে পিংপং বলটা নাচাতেই থাকল। ডায়ভুর ঘেউ ঘেউ বাড়ছে। প্রচণ্ড জোরে লাফালাফি করছে। ওদিকে টেলিফোনের আর্তনাদ। ঊর্মির মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। ও দ্রুত গিয়ে ফোনটা ধরল। ঊর্মি বললো. হ্যালো।

—ও-পাশের পুরুষ কণ্ঠ বলল, আপনি মানে ঊর্মি, ঊর্মি তো?

—চিনতে পারল না ঊর্মি। তবু বলল, হ্যাঁ, কিন্তু আপনি?

—আমি। আমায় চিনতে পারছেন না? আমি মানে…। ততক্ষণে চিনে ফেলেছে ঊর্মি।

কিন্তু চিনতে পেরেও ও না-চেনার ভাবই করলো। ওর বুকের মধ্যে আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে তখন। ওর পায়ের তলা ঘামছে। হাত কাঁপছে। ও খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছে। রিসিভার কানে চেপে ও তাকিয়ে আছে। ঘরের সিলিং দেখছে। ফ্যানটা বন বন করে ঘুরছে। ফ্যানের ব্লেডের সঙ্গে ফরফর করে উড়ছে সিম্কুর ছেঁড়া ঘুড়িটা। দেওয়ালঘড়ির কাঁটা দশটার ঘরে থমকে আছে। বন্ধ হয়ে গেছে ঘড়িটা অনেকক্ষণ। আজ চাবি দেওয়া হয়নি। জয়ন্তানুজ সেন এতদিন পর কি মনে করে ফোন করছে? ঊর্মি ভাবছে। সেই লাজুক মুখচোরা যুবক, পাপড়ির দাদা। ঊর্মি যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। সে এতদিন পর শেষ পর্যন্ত ফোন করল! এই সাহসটুকু সঞ্চয় করতে ভদ্রলোকের পাঁচ বছর লেগে গেল! মনে হয় যেন একটা যুগ। আশ্চর্য!

ডায়ভু অসম্ভব গোলমাল করছে। এই মুহূর্তে সিম্কুটা কি একটু চুপচাপ থাকতে পারছে না?—আমি জয়ন্তানুজ সেন।—ও পাশের ভরাট গলায় বেজে উঠল নামটা। ঊর্মি বলল, কি ব্যাপার? (ঊর্মি ঠিক বুঝতে পারল না ওর গলার স্বরটা একটু কেঁপে উঠল কিনা) জয়ন্তানুজ বলল, আপনাকে বড় প্রয়োজন।

—সেকি! কেন?

—সব কথা কি ফোনে বলা যায়?—একটু যেন বাধো বাধো গলায় জয়ন্তানুজ বলল।

—বুঝতে পারছি না, এতদিন পর আমার সঙ্গে এমন কি কথা থাকতে পারে ?

ওদিকের কথা থেমে গেল। তারপর দু পক্ষেরই কয়েক সেকেণ্ড নীরবতা। একটা চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস কানে বাজলো উর্মির। ওর বলতে ইচ্ছে হল, কাপুরুষ। কিন্তু ও বলতে পারল না। জয়ন্তানুজ বলল, আসুন না বিকেলে গড়িয়াহাটের মোড়ে ? আপনাকে খুব দরকার।

—দরকারটা কি হঠাৎ আজই হয়ে পড়ল ?—কৃত্রিম কাঠিন্যের স্বর ঝরে পড়ল উর্মির গলায়। ও তরফের কোন জবাব নেই। উর্মি বলল, হ্যালো ! হ্যাল্লো !

—শুনছি, বলুন।

—আমার সময় বড় কম। স্কুলের মেয়েদের খাতা নিয়ে ব্যস্ত আছি।

—বিরক্ত না করে উপায় নেই। আসবেন ঠিক ছটায় ? ট্রেডার্স অ্যাসেমব্লির নাচে—

কথা শেষ হল না। লাইনটা কেটে গেল। রিসিভার নামিয়ে রাখলো উর্মি ! টেলিফোন বিভ্রাটটা যেন আজকাল একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কি ভাবল জয়ন্তানুজ কে জানে ! হয়তো ভাবতে পারে উর্মি ইচ্ছে করেই লাইন কেটে দিয়েছে। ছি, এতখানি অভদ্র সে নয়। ওর বুকের মধ্যে যেন ভারী একটা বোলার চলে যাচ্ছে। অসহ্য এ টা চাপা যন্ত্রণা টের পাচ্ছে উর্মি। উর্মি ভাবছে, এতদিন পর ও কেন এলো ? বেশ তো কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো। এতদিন যে লোক তার কোন : খবর রাখেনি, তার নরম মনটা নিয়ে খেলা করেছিল পাঁচ বছর আগে, সেই লোকটার আজ দুম্ করে টেলিফোন না করলেই কি চলত না ? ওর ঘাড়ে এই যন্ত্রণার বোঝা চাপিয়ে দেবার কি অধিকার ছিল ? লোকটা জানতে পারল না, সে ওর কতখানি ক্ষতি করেছিল। ওর সমস্যাহীন জীবনে সে যে নতুন করে সমস্যা তৈরি করল।

বাইরে বৃষ্টির আকাশ। আকাশে এখন স্লেটের মতন মেঘ। উর্মি ভাবছে, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়াব অফিসটা কি খুব বেশী দূরে ? বাড়ির সামনে সদব রাস্তা। অসংখ্য বাস ছুটছে এসপ্ল্যানেড পাড়ায়। এ সময় বেরুনো খুব কষ্টকর হবে ? আজ ট্রাম স্ট্রাইক। একটু না হয় ভিড়ই হবে বাসে। মিনি বাসও তো রয়েছে কিংবা ট্যাকসি। ছটার আগেই যদি ওর

কাছে পৌঁছে যাওয়া যায়? একেবারে ওর অফিসের চেম্বারে? তারপর ওখান থেকে যদি বেরিয়ে পড়া যায়! ইডেনের নির্জন ছায়ায়, বার্মিজ প্যাগোডার কাছে বেশ নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়লে বেশ হয়। কিন্তু কি কথা বলবে প্রথমে? কি কথা দিয়ে শুরু করবে? ঠিক তেমনি মুহূর্তে কি কোন কথা বলা যায়! সিগারেটের আগুনের মত যে লোকটা একটু একটু করে পুড়িয়েছে তার অষ্টাদশী মনটাকে, সেই মানুষটাকে কি ক্ষমা করা যায়? ও হয়ত খুব রূঢ়ও হতে পারবে না। অভিমান যন্ত্রণা, আবেশ সব মিলে ও যেন কেমন স্তব্ধ হয়ে যাবে। যাকে এক সময় প্রত্যেক সকালে, প্রত্যেক সুন্দর সন্ধ্যায় মনে মনে আরতি করেছে, কামনা করেছে, সেই দুর্লভ মানুষকে হঠাৎ এভাবে পাওয়াটাকে ওর লটারীতে জেতা ভাগ্যফলের মতন মনে হচ্ছে। ঠোঁট কেটে কেটে হাসল উর্মি। নিজেকে এখন ওর খুব দামী মনে হচ্ছে, কোন একজনের কাছে নিজেকে দুর্লভ ভেবে। হয়ত সেও তাকে অমনি করেই চেয়েছিল, এত বছরেও ভুলতে পারেনি। আশ্চর্য। আমরা যদি একে অন্যের মন দেখতে পেতাম! উর্মি ভাবছে, যদি কোনও ক্যামেরায় সেই মনের ছবি তোলা যেত! কি বলতে চায় ও এতদিন পর? আবেগ, সেন্টিমেন্টের কথা, নাকি রোমান্টিক মনের কয়েক টুকরো ফুলঝুরি? যে জিনিসটা ছেলেদের কাছে দারুণ একচেটিয়া। বড় অসময়ে কেটে গেল লাইনটা। উর্মির আফশোস হচ্ছে ওকে দুটো কথা শোনাতে পারল না বলে। ও মনে মনে আওড়ালো জয়ন্তামুজের সংলাপগুলো, এমন কি তাঁর অসমাপ্ত কথাটাও। ওর খুব ব্যঙ্গ করতে ইচ্ছে হচ্ছে ওকে। ওকে অপমান করতে ইচ্ছে হচ্ছে। মুখের ওপরে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, আমি আরেকজনকে ভালবেসেছি। আমরা শিগগিরই বিয়ে করছি। অথবা সব থেকে সুন্দর অপমান হয়, যদি ওর সঙ্গে আজ দেখা না করা যায়।

সিমকুটা সমানে ক্ষেপাচ্ছে ডায়ভুকে। তার চেঁচামেচি ক্রমেই বাড়ছে। বেড়ালের মতন লেজ ফুলিয়ে ও ঘরর্ ঘরর্ আওয়াজ তুলছে। খুব অসহ্য লাগছে উর্মির। অন্যদিন হ'লে সেও হয়ত ভিড়ে যেত সিমকুর দলে। কুকুরটাকে উত্তেজিত করত। কিন্তু আজ আর পারল না ওদের সুরে সুর মেলাতে। ও ঠাস করে একটা চড় মারলো সিমকুর গালে। ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল সিমকু। কাঁদতে কাঁদতে বলল—দাঁড়া, আমি দাদুকে বলে দেব। যা না, বলে দে। উর্মি কেমন ছেলেমানুষ হয়ে উঠল। ও যেন সিমকুর বয়েসী হয়ে

গেছে। এখন এই মুহূর্তে। সিমকুকে আরেকটা চড় মেরে ডায়ভুর গলায় চেন পরিয়ে বেঁধে দিল উর্মি রেলিঙের সঙ্গে। সিমকু চেঁচালো কাঁদলো। অভিমানী চোখে তাকাল। তারপর কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল দাদুর কাছে। উর্মি অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, ওর অভিমানী জলভরা চোখ দুটো। অন্যদিন হলে ওর বুক টন টন করত। ও কিছুতেই পারত না সিমকুকে এভাবে কাঁদাতে। কিন্তু আজ যেন ওর পক্ষে সবই সম্ভব। এই তো কিছুক্ষণ আগেও ছিল অন্য জগতে। সিমকু কত বায়না করেছিল, তাকে সব থেকে বেশী প্রশ্রয় দেয় পিসি। কিন্তু টেলিফোনটা আসার পর থেকেই উর্মি কেমন বদলে গেল। ও বার বার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে। খাতা দেখায় মন দিতে পারছে না। ওদিকে স্প্যানিয়াল কুকুরটার চেঁচানি বাড়ছে। তার কান্না, সিমকুর কান্না, বাসের শব্দ মিশে ওর কানের মধ্যে বিচিত্র এক অর্কেস্ট্রা বেজে চলল। নিজেকে এত গোলমালের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেও একটা মুখ ও ভুলতে পারল না। সে মুখ জয়ন্তানুজ সেনের। কেমন দেখতে হয়েছে? উর্মি ভাবছে, ওর স্বাস্থ্যটা কি আরেকটু ভাল হয়েছে? না, তেমনি রোগাই রয়েছে? চশমার পাওয়ারটা নিশ্চয় আরেকটু বেড়েছে! চোখ দুটো কী দারুণ উদাসীন ছিল। ওই চোখ দুটোই তো তাকে প্রতারণা করেছিল, উর্মির মনে হয়। ওই দু চোখের এমন ভাষা ছিল, যা উর্মিকে দুর্বল করে ফেলেছিল। ওর দিকে অপলক চেয়ে থেকে থেকে নীরবে ভালবাসা জানিয়েছিল। অথচ সেই চোখের মানুষ কোনদিনও কাছে আসেনি।

তখন কলেজ জীবনের প্রথম দিনগুলো। পাপড়ি প্রায়ই টানতে টানতে নিয়ে যেতে থাকে। পাপড়ির পাশের ঘরটাই ছিল তার দাদার পড়ার ঘর। দু ঘরের মাঝখানে একটা খোলা দরজা। হাওয়ায় উড়ে উড়ে যেত ছিটের পর্দা। উর্মির সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে যেত কতবার। প্যাকিং বাক্স কেটে কোনরকম একটা টেবিল করা হয়েছিল। তার পড়ার টেবিল। সে বসত একটা সস্তা কাঠের চেয়ারে। তার বই থাকত কেরোসিন কাঠের তৈরী বুকসেলফে। নিতান্তই সাদামাটা জীবন। পাপড়ির বাবাকে দেখলে মনে হত জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত নায়ক। নেহাৎ ভাল ছেলে ছিল বলেই জিওলজি নিয়ে অত পড়াশুনা করার সুযোগ পেয়েছিল জয়ন্তানুজ, পাপড়ির দাদা। ফি মাসে মাসে সে স্কলারশিপ পেত। বাকী টাকাটা জোগাড় করত টিউশনি করে। নিজের পড়ার খরচ চালাত এতে এবং সেই সঙ্গে বোনেরও। পাপড়ি

গল্প করত। তার দাদার গল্প। বইটই পড়ে তার দাদা।

পাপড়ি বলত, তার দাদা গল্প লেখে।

পাপড়ি বলত, তার দাদা কবিতা লেখে।

পাপড়ি বলত, তার দাদা ছবি আঁকে।

পাপড়ির মুখে তার দাদার প্রশস্তি শুনতে শুনতে উর্মি একেবারে হাঁ হয়ে যেত। একথা তখন ওর মাথায় আসত না যে, ওই বয়েসে বাঙলাদেশের অনেক ছেলেই কবিতা লেখে, গল্প লেখে। ওটা এমন-একটা বয়েস, যে-সময়ে অ-কবিকেও কবি করে ছাড়ে, অরসিকও রসিক হয়।

পাপড়ির মুখে তার দাদার গুণের কথা শুনতে শুনতে এক ধরণের ভালবাসা জন্মেছিল উর্মির মনে। বৈষ্ণব সাহিত্যে একেই তো বলে গুণগত প্রীতি। নলের প্রতি দময়ন্তী আকৃষ্ট হয়েছিল যেমন। দময়ন্তীর মনেও জন্মেছিল এই গুণগত প্রীতি। উড়ন্ত পর্দা'র ফাঁকে ওদের এই চোখাচোখির খেলাটা বেশ লাগত উর্মির। মাঝে মাঝে কয়েক পলক তাকিয়েও থাকত ওরা। সে চাউনিতে ছিল কিছু বিস্ময়, কি: কৌতূহল, একটু মুগ্ধতা। তখন উর্মির উদ্ধত যৌবন ভালবেসে দেউলে হবার মতন মন। শরীর মন সব কিছু দিয়েই ও চাইত তাকে। ও কতদিন আশা করেছে ও ঘরের মালিক এগিয়ে আসবে। দু ঘরের মাঝখানে তো সামান্য এক চৌকাঠ। একটু বেরোন কি সম্ভব হবে না? কিন্তু সম্ভব তো হ'ল না কোনদিনই। দিনের পর দিন অপেক্ষা করেছে উর্মি। ওর পিপাসা বেড়েছে দিন দিন। তবু সে আসেনি। শেষ পর্যন্ত একটা সলজ্জ চাউনি ছুঁড়ে জয়ন্তানুজ বইয়ের খাতায় মুখ ডুবিয়েছে। ফার্স্ট ইয়ার থেকে থার্ড ইয়ার পর্যন্ত তো এই করে করেই কেটে গেল। সে এল না। কিন্তু আজ এলো, যখন ওর প্রয়োজন প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল। ফার্স্ট ইয়ারের সেই মনটা তো আর নেই। নেই সেই অভিসারে যাবার মতন মনের প্রস্তুতি।

ভাল লাগছে না উর্মির। নিজেকে খুব অসহায় মনে হচ্ছে আজ। ও আবার খাতা দেখায় মন দিল। সুগত দিল্লী গেছে। কাল পরশুর মধ্যেই ফেরার কথা। আজকের এই ঘটনাটা যদি সুগতর কানে যায়, তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে ভাবতে পারে না উর্মি। যদিও সুগতর সঙ্গে এমন কোন শর্ত করেনি উর্মি যে তাকেই বিয়ে করবে। বরং ও বলেই রেখেছে, মা বাবা জোর করলে অন্য জায়গায় বিয়ে করেও ফেলতে পারে। অবশ্য সুগত সে কথা বিশ্বাস

করে না। ও হেসে উড়িয়ে দেয়। ও বলে, তোমার মতন সিনসিয়ার মেয়েরা ওসব বিট্রে-ফিট্রে করে না। আসলে করার মতন হিম্মত নেই।

উর্মি বলে, যদি কারো সঙ্গে প্রেম-টেম করি?

—প্রেম করবে তুমি? আমিই তো তোমায় হাতে খড়ি দিলাম।

—যদি তোমার আগেও আর কেউ দিয়ে থাকে?

—দিয়ে থাকলেও তা ধোপে টিকবে না।

হেসেছিল উর্মি। ভেবেছিল, সুগতর এই শেষ কথাটাই হয়ত কাজে লেগে যাবে। উর্মির মনে হয় সুগতর ভালবাসাটা যেন এক ধরনের জুলুম। ও জোর করে কেড়ে নিতে চায় উর্মিকে। ও দিল্লী থেকে ফিরলেই আবার সেই ছকে বাঁধা রুটিনের জীবন। সকালে স্কুল, দুপুরে বাড়িতে বসে থাকা, বিকেলে রামকৃষ্ণ মিশন কালচারাল ইনস্টিটিউটের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো। তারপর বই পালটানো আর বই নেওয়ার খেলাটা খেলতে হবে অন্তত কিছু সময়, যতক্ষণ না সুগত এসে দাঁড়ায়।

তারপর দুজনে মিলে রসকোয় গিয়ে বসা। নইলে আরেকটা কোন সস্তার রেস্টুরেন্ট। খুব বেশী দামী রেস্তোরাঁয় যাবার ক্ষমতা নেই ওদের। কারণ, সুগত বেকার। চোখে চোখে তাকিয়ে অযথা সময় নষ্ট করার মতন ছেলে সুগত নয়। তার চেয়ে উর্মির ঠোঁটে ঠোঁট রেখে তার শরীরের উত্তাপটুকুর স্বাদ নেওয়াটাকে সে অনেক বেশী মূল্য দিয়ে থাকে। রেস্টুরেন্টের বেয়ারাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বখশিস দেয়। তার কারণ যাতে সে অনেকক্ষণ বসার সুযোগ দেয় তাদের এই পর্দা-ঢাকা কেবিনে। শরীরের চাহিদা পুরোপুরি মেটে না বলে সুগত দারুণ যন্ত্রণা পায়। ও ভেতরে ভেতরে ছটফট করে। উর্মি কিছুতেই পুরোপুরি ছেড়ে দেয় না নিজেকে। তবু সুগতর এই স্পর্শ, ওর উত্তাপ তার মন্দ লাগে না। সে যাকে চেয়েছিল তাকে জীবনে পায়নি বলেই যেন ও নিজেকে আরো বেশী ছেড়ে দেয় সুগতর কাছে। এক সময় শরীরের উত্তেজনা মিটে যায়। তখন এক ধরনের ক্লান্তি আসে ওর মধ্যে। তখন সুগতকে ওর খুব বিশ্রী লাগে। অথচ পরদিন আবার গিয়ে দাঁড়ায় সেই নির্দিষ্ট জায়গায়। সুগতর জন্যে অপেক্ষা করে। ওর প্রয়োজনটা যেন উর্মির কাছে এক ধরনের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওর কাছে যেতে হবে। ওকে সঙ্গ দিতে হবে। আর ওকে এভাবে পেয়ে সুগতরও অধিকারবোধটা দিন দিন প্রবল হচ্ছে। ও যেন স্বামী-সুলভ ব্যক্তিত্ব নিয়ে ওর ওপর কর্তৃত্ব খাটায়। প্রায় ওর কথামতই চলতে হয়

উর্মিকে। এ যেন সেই সীতাকে লক্ষ্মণের গণ্ডী কেটে দেওয়া—"এই গণ্ডীর বাইরে গেলেই তোমার ভীষণ বিপদ।"—সুগতর তৈরী গণ্ডীর মধ্যে পরিক্রমণ করতে হয় তাকে। অথচ ওর মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় ওর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে। সুগতকে অস্বীকার করতে। কিন্তু ও পারে না। বিবেকটা ওর মধ্যে যেন বড় বেশী উঁকি মারে। শুধু তাই নয়। উর্মি নিজেকে প্রশ্ন করে দেখেছে, সুগতকে ও ভালবেসেছে। দিনের পর দিন ওর সান্নিধ্যে আসার ফলে এই প্রীতির জন্ম হয়েছে। একেই তো বলে বৈষ্ণব সাহিত্যে সাঙ্গিক প্রীতি। সুগত খুব হাল্কা ধরনের চটুল চপল কথা বলতে ভালবাসে। উর্মির প্রকৃতির ঠিক বিপরীত। ওর ভালবাসা মনকে খুব স্পর্শ করে না উর্মির। তবু ওর সঙ্গলাভের প্রয়োজন হয়। খুব গভীর কিছু ও আশা করে না সুগতর কাছে।

ও ঠিকই এসে দাঁড়াল বিকেলে। না এসে পারল না। বেরনোর আগে ওর মন যথেষ্ট দ্বিধাগ্রস্ত ছিল, আসবে কি আসবে না। শেষ পর্যন্ত ঘড়ির কাঁটা যখন ছটার ঘর ছুঁই ছুঁই করছে, তখন ও অন্যমনস্কভাবে শাড়িটা পালটালো। বাড়ি থেকে পৌনে ছটায় বেরিয়ে ও কিছুতেই এসে পৌঁছতে পারল না সময় মতন। বাস-টাস সব ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে, আসছে। পাতাল রেলের রিহার্সাল চলছে এখন সারা কলকাতায়, তাই ট্রাম বাসের রুট ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে যে সব জায়গায় লাইন বসানো হবে সে সব জায়গা থেকে।

গড়িয়াহাটে ভিড়। রোজই যেমন থাকে। ফুটপাথে কাতারে কাতারে মানুষ, দোকান। রঙ-বেরঙের পোশাক আর যুবক-যুবতীর জৌলুস দেখতে দেখতে ও এসে দাঁড়ালো ট্রেডার্স অ্যাসেমব্লির নীচে। ও আজ ফলসা রঙের একটা তাঁতের শাড়ি পরেছে। গায়ে সেই রঙেরই ব্লাউজ, এলো খোঁপা। এই সাধারণ সাজগোজের মধ্যেই ওকে সুন্দর মানিয়ে যায়। ওর মিষ্টি চেহারায় একটা মার্জিত বুদ্ধিদীপ্ত ছাপ। ওর চলাফেরায় রয়েছে আভিজাত্য। এজন্যই সুগত নাকি ওর প্রেমে পড়েছিল। কথাটা ভেবে একটু হাসল উর্মি।

ঘড়ির কাঁটা আরেকটু এগিয়ে চলল। যার জন্যে ওর অপেক্ষা সেই মানুষের দেখা নেই। অতএব ওকে আরো কিছু সময় দাঁড়াতেই হ'ল। ও ভাবল, ও কি জায়গা ভুল করল? অথবা সময় ভুল? নাকি আধঘন্টা দেরী করেছে বলে সে এসে ফিরে গেল? এ সব ভাবতে ভাবতে ক্রমেই হতাশ হতে থাকল উর্মি। কেমন এক বেদনাবোধে ওর বুক ভারী হয়ে উঠল। এবং ও অনুভব করতে পারল, এতদিন পরেও ও জয়ন্তানুজকে ভোলেনি। কিন্তু আজ যদি

ওর সঙ্গে দেখা হয় ওকে তো ফিরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েই এসেছে উর্মি। তবু ওর জন্য এই ব্যাকুলতা কেন? নিজের কাঠিন্য বজায় রাখতে চেষ্টা করল ও। যদিও ভিড়ের মধ্যে ওর চোখ দুটো খুঁজতে থাকল সেই একজনকেই। ও নিজের মনকে বোঝাতে চাইল, পাঁচ বছর আগে যে লোকটা ওর হৃদয় মন নিংড়ে নিয়েছিল, ওর ফুলের মতন নরম মনে ছুরি চালিয়েছিল, সেই মানুষকে ও ক্ষমা করবে না। ও বোঝাতে চাইল নিজেকে, জয়ন্তানুজকে অপমান করার জন্যই তাকে ওর দরকার। পুরনো দিনের সেই মোহকে প্রশ্রয় দেবার জন্য নয়।

সিক্সথ ইয়ারের শেষের দিকে সুগতর সঙ্গে ওর আলাপ। নিজে থেকে পরিচয় করেছিল সুগত। ঝড়ে বিধ্বস্ত মন তখন উর্মির। অতএব সুগতর সঙ্গলাভের প্রয়োজন হয়েছিল। সেই থেকে অনেক ঘুরেছিল ওরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের লনে, মাঠে করিডোরে। নিজের মনের রুচির সঙ্গে সুগতকে মেলাতে পারেনি প্রথমেই। সুগতর চালচলনে যে স্থূলতা ছিল, তার সঙ্গে ও কিছুতেই ছন্দ মেলাতে পারেনি। তবু সুগতকে ও স্বাগতম্ জানাল। নিজের মনকে জোর করে সইয়ে নিল। ও জয়ন্তানুজকে ভুলতে চাইছিল আসলে। ভুলেও প্রায় গিয়েছিল। যদিও তা সাময়িক। অন্তত এ কথাই আজ মনে হচ্ছে উর্মির সুগতর মতন ছেলেরা কয়েকটি দুবল মুহূর্তের সঙ্গী হতে পারে, তার চেয়ে বেশী কিছু নয়।

ঘড়ি দেখতে দেখতে উর্মি খুব ভাঙা মন নিয়ে ট্রাম লাইন পেরোল। সাতটা দশ হয়ে গেছে। আর অপেক্ষা করার কোন মানে হয় না। কিন্তু রাস্তার উল্টো দিকে যেতেই ও দেখলে, জয়ন্তানুজ ট্যাক্সি থে নামছে। চিনতে ওর এতটুকু ভুল হয়নি। একেবারে হুবহু সেই চেহারাই রয়েছে। শুধু একটু মোটা হয়েছে এই যা। কোন ভূমিকা না করেই সে বলল, ছ'টা কুড়ি পর্যন্ত আপনার দেখা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত সমস্ত গড়িয়াহাট চক্কর দিলাম। তারপর আপনার বাড়ির সামনে তীর্থের কাকের মতন দাঁড়িয়ে থেকে থেকে এই ফিরছি।

—যাক্, খুঁজেছেন তাহলে? উর্মি একটু বাঁকাভাবেই বলল।

—বাহ্, আমার ওপরে বুঝি সে বিশ্বাস ছিল না?

—কথা না বাড়িয়ে বলুন আপনার কি বক্তব্য?

—এইখানে হাটের মধ্যে?

—হাটের মধ্যে কথা বলাই তো সব থেকে নিরাপদ।

ট্যাক্সির দরজা খুলে জয়ন্তানুজ বলল, এসো।…(এসো! একেবারে তুমি!

কথাটা কানে বাজলো উর্মির) উর্মির ভাবতে অবাক লাগছে। আজই ওদের প্রথম আলাপ। অথচ দু'জনেই দু'জনের কত বেশী চেনা। জয়ন্তানুজের পরনে দামী মেরুন রঙের প্যান্ট। গায়ে সাদা শার্ট, গলায় টাই। দাড়ি কামিয়েছে নিখুঁতভাবে জয়ন্তানুজ। নীলচে ভাব রয়েছে ফর্সা গাল দুটোয়। সেই গভীর চোখ দুটো আগের মতই উদাসীন। ওরা পাশাপাশি বসে থাকল দুজনে। কেউ কারো সঙ্গে কোন কথাই বলল না।

উর্মি বুঝতে পারছে, জয়ন্তানুজ এখন খুব নার্ভাস। ও আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, ওর কপালে প্রচুর ঘাম জমেছে। তবু ওর উন্নতিই হয়েছে বলতে হবে। সাত বছর আগে তাকে এভাবে কোন মেয়ের পাশাপাশি বসে থাকাটা কল্পনা করা যেত না।

—কোথায় যাবে ?—কৃত্রিম স্মার্টনেস বজায় রেখে জয়ন্তানুজ প্রশ্ন করে।

—যেখানে নিয়ে যাবেন। ওদের চোখাচোখি হয়।

—আমি যেখানে নিয়ে যাব, তুমি সেখানে যাবে ?

—দেখা যাক, কোথায় আপনার ডেসটিনেশন ?...বলল উর্মি। হাসল জয়ন্তানুজ।

ক্যাথিড্রাল চার্চের সামনে এসে জয়ন্তানুজ বলল, ট্যাক্সি রোককে। শান্তি-নিকেতনী কাজ করা চামড়ার ব্যাগটা খুলতে যাচ্ছিল উর্মি। জয়ন্তানুজ বলল, তার কি কোন প্রয়োজন আছে ?—জয়ন্তানুজের দিকে তাকিয়ে উর্মির কেমন সঙ্কোচ হ'ল।

নিয়নের আবছা আলোয় ঘাসের মধ্যে বসল জয়ন্তানুজ। খানিকটা দূরত্ব রেখে ওর পাশে উর্মি। গির্জায় প্রার্থনা হচ্ছে। ওরা চুপচাপ বসে দুজনে। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। এমনি করেই কি সময় পেরিয়ে যাবে ? জয়ন্তানুজ ভাবছে। আজও কি সে কিছুই বলবে না ? উর্মি ভাবছে, সুগতর কথা। উর্মি ভাবছে, দুজনের পছন্দে এত মিল ? ঠিক এইখানে, এই ঘাসের বনে সুগতও তাকে নিয়ে বসেছিল মাত্র কদিন আগেও। ও বলেছিল, জায়গাটা নাকি ওর খুব প্রিয়। উর্মি ভাবছে, জায়গাটা তেমনিই আছে, শুধু মানুষটাই বদল হয়েছে। ক্যাথিড্রাল রোডটাকে পেছনে করে ওরা আজ বসেছে দুজন। গির্জার চুড়োটার ওপর এক ফালি চাঁদের আলো আর নিয়ন আলো মিলে একটা স্বপ্নময় পরিবেশ তৈরী হয়েছে। ঠিক এই পরিবেশটা পছন্দ করে সুগতও। সুগত মানুষটার সবটাই স্থূল নয়। সে কিছুটা রোমান্টিকও। কিছু সময় পরে জয়ন্তানুজ একটা

সিগারেট ধরায়।

নীরবে সিগারেট টেনে চলে জয়ন্তানুজ। তারপর খুব আস্তে আস্তে বলে, ভেবে দেখলুম নিজেকে আর প্রবঞ্চিত করব না।

—মানে? —উর্মি অবাক হবার ভান করে।

—তোমায় ছাড়া আমার চলবে না।

—তাই নাকি? কথাটা ভাবতে এত বছর সময় লেগে গেল?

—সময় লাগতো না। আমি ঠিক সাহস পাইনি। ভেবেছি, যদি প্রত্যাখ্যান কর!

—আজই হঠাৎ সাহসী হয়ে উঠলেন!

ওর ব্যঙ্গের উত্তরে জয়ন্তানুজ বলল, তুমি আমার স্ত্রী হবে এটাই আমি এতদিন কল্পনা করেছি।

উর্মি বলল, শুধু কল্পনা করেছেন?

—শুধু কল্পনা নয়। বিশ্বাস করেছি।

—কিন্তু সে বিশ্বাসের জন্ম হয়নি বাস্তবে।—বাকি কথাটুকু শেষ করল না উর্মি।

—তোমায় না পেলে আমি মরে যাব।—গভীর আবেগে কাঁপলো জয়ন্তানুজের গলা।

উর্মি ভাবলো, আশ্চর্য, ছেলেরা সবাই এক। ঠিক এই কথাই বলেছিল স্বগত সেদিন, যেদিন প্রথম এসে ওরা এখানে বসেছিল দুজনে। উর্মি ভাবছে, এরপর কি ও বলবে, তোমার জন্য কত রাত ঘুমোইনি আমি?—যেমন করে স্বগত বলেছিল?

ওর দারুণ জানতে ইচ্ছে করছে, কি মাসে জন্ম জয়ন্তানুজের?

উর্মি বলল, কেউই কাউকে না পেলে মরে না।

মাথা নীচু করল জয়ন্তানুজ। উর্মির জেদী মনটা ক্রমশ ওকে কঠিন করে তুলতে থাকল। ও বলতে চাইল, আজ যদি আপনাকে আমি ফিরিয়ে দিই? যদি বলি, আপনাকে না পেলেও আমি বেঁচে থাকব?...কিন্তু ও বলতে পারল না। জয়ন্তানুজ দেখতে থাকল, ওর লাইনার আঁকা দুটি নিটোল চোখের গাম্ভীর্য। লিপস্টিক মাখা আবেগহীন ঠোঁটে বিদ্রূপ। অনেকক্ষণ ধরেই ওর হাতে সিগারেট জ্বলছে। সিগারেটটা পুড়তে পুড়তে আঙুলের ডগায় এসে জ্বলছে। জয়ন্তানুজ ভাবছে, আর কি বসে থাকার কোন অর্থ আছে? ওর ফর্সা কান

দুটো লাল হয়ে উঠেছে। ওর মাথার চুল অবিন্যস্ত। হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে পড়ছে কপালে। পরাজিত সৈনিকের মতন ও তাকিয়ে আছে। পেছনে ক্যাথিড্রাল রোড। গাড়ির আসা যাওয়ার বিরাম নেই। হেড-লাইটের তীব্র আলো ছিটকে এসে পড়ছে। সেই আলোর বন্যায় জয়ন্তাম্বুজ ঊর্মিকে দেখছে।

ঊর্মি তাকিয়ে আছে দূরে। যেখানে মহানগরীর চলমান জীবনযাত্রা। চৌরঙ্গীপাড়ায় আলোর মালা। যানবাহনের বিচিত্র সুর। জনতার কলকাতা। ওর অন্যমনস্ক মন শুনছে, গির্জার বাইবেল পাঠ।

সিগারেটটা পুড়তে পুড়তে ওর আঙুলের ডগায় এসে জ্বলছে। চামড়াটা পুড়ছে। একটা যন্ত্রণার মাছ হেঁটে যাচ্ছে জয়ন্তাম্বুজের বুকে। বুক থেকে গলায়। তবুও জয়ন্তাম্বুজ বলল, কিছু বল?

ঊর্মি বলল, কি বলবো?

এই পাঁচ বছরেও কি তোমার কোন কথা জমা হয়নি?

চুপ করেই থাকল ঊর্মি। ও বলতে পারল না, এক ভদ্রলোক আমায় ভালবেসেছিল। আমি তাকে ফিরিয়ে দিতে পারিনি। ও বলতে পারল না, আমি তোমায় প্রত্যাখ্যান করতেই এসেছিলাম।

ওর চাঁপার কলির মতন নরম আঙুলগুলোর ওপর নিজের হাতের স্পর্শ রাখলো জয়ন্তাম্বুজ। কোন বাধাই দিল না ঊর্মি। ও শুধু নিষ্প্রাণ পুতুলের মতন বসেই থাকল। যদিও ও তখন ভাবছে, আমাদের মনটা যেন দেওয়াল-ঘড়ির পেণ্ডুলাম। সে শুধু দোলে আর দোলে। কোথায় থামতে হয় জানে না।



লেখিকা-পরিচিতি

॥ **স্বর্ণকুমারী দেবী** ॥ (১৮৫৫-১৯৩২): জন্ম: জোড়াসাঁকো, কলকাতা। পিতা: মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। উত্তরজীবনে কবি, ঔপন্যাসিক ও সমাজ-সেবিকারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জানকীনাথ ঘোষালের সংগে তাঁর বিয়ে হয়। ভারতী' (১৮৭৭) পত্রিকা সম্পাদনা স্বর্ণকুমারীর অন্যতম কীর্তি। এ ছাড়া, 'বালক' নামে একটি কিশোর পত্রিকাও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর লেখা ও প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস: 'দীপনির্বাণ'। বইটি জাতীয়ভাব-প্রচারে সাহায্য করেছিল। অন্যান্য বই: উপন্যাস: স্নেহলতা, ফুলের মালা, কাহাকে; নাটক: রাজকন্যা', দিব্যকমল; কাব্যগ্রন্থ: গাথা, বসন্ত উৎসব, নীতিগুচ্ছ প্রভৃতি। বিজ্ঞান বিষয়েও প্রবন্ধ লিখেছেন। সেইসব প্রবন্ধ 'পৃথিবী' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। অনেক গানেরও রচয়িতা তিনি।

॥ **অনুরূপা দেবী** ॥ (১৮৮১-১৯৫৮): জন্ম: কলকাতা। পিতা: মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়। পিতামহ: পণ্ডিত ভূদেব মুখোপাধ্যায়। 'রাণী দেবী' ছদ্মনামে লেখা তাঁর প্রথম গল্প কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়। প্রথম উপন্যাস টিলকুঠি। 'ভারতী পত্রিকায় তাঁর পোষ্যপুত্র উপন্যাস প্রকাশিত হলে নাম ছড়িয়ে পড়ে। একাধিক নারীকল্যাণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী তিনি। তাঁর লেখা মন্ত্রশক্তি, মা, মহানিশা, পথের সাথী, বাগ্‌দত্তার নাট্যরূপ মঞ্চে অভিনীত হয়। তেত্রিশটি বইয়ের রচয়িতা তিনি। অন্যান্য বই: জ্যোতিঃহারা, উত্তরায়ণ, সাহিত্যে নারী, স্রষ্ট্রী ও সৃষ্টি, বিচারপতি প্রভৃতি। জীবনের স্মৃতিলেখা তাঁর অসমাপ্ত রচনা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী' (১৯৩৫) ও 'ভুবনমোহিনী দাসী' স্বর্ণপদকে (১৯৪১) ভূষিত করে। তাঁর 'সাহিত্যে নারী' বইটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে।

॥ **নিরুপমা দেবী** ॥ (১৮৮৩—১৯৫১): জন্ম: বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। পিতা: নফরচন্দ্র ভট্ট। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁকে গল্পরচনায় ও অনুরূপা

দেবী গল্প রচনায় অনুপ্রাণিত করেন। প্রথম উপন্যাস উচ্ছৃঙ্খল। প্রেম ও দাম্পত্য জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁর উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। তাঁর দিদি উপন্যাসটি শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত। এটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভুবনমোহিনী' (১৯৩৮) ও 'জগত্তারিণী' (১৯৪৩) স্বর্ণপদক পান। রচিত অন্যান্য বই: অন্নপূর্ণার মন্দির, আলেয়া, বিধিলিপি, শ্যামলী, বন্ধু, পরের ছেলে, আমার ডায়েরী, দেবত্র, যুগান্তরের কথা, অনুকর্ষ। একাধিক উপন্যাস চলচ্চিত্র ও মঞ্চে অভিনীত হয়েছে।

।। **মাধুরীলতা দেবী** ।। (১৮৮৬—১৯১৮): জন্ম: জোড়াসাঁকো, কলকাতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর চতুর্থ পুত্র শরৎকুমার চক্রবর্তীর সংগে তাঁর বিয়ে হয়। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহেই মাধুরীলতা গল্প লিখতে শুরু করেন। সে-সব গল্প প্রকাশিত হয় 'ভারতী', 'প্রবাসী' ও 'সবুজপত্রে'। রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছে'র প্রথম প্রকাশকালে তাতে 'সৎপাত্র' নামে একটি গল্প সংকলিত হয়। কিন্তু গল্পটির প্রকৃত লেখিকা: মাধুরীলতা দেবী। তাঁর রচনার দুটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে: 'মাধুরীলতার গল্প' ও 'মাধুরীলতার চিঠি'।

।। **শান্তা দেবী** ।। (১৮৯৪—১৯৮৪) জন্ম: কলকাতা। পিতা: 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। স্বামী: ডঃ কালিদাস নাগ। আদি নিবাস: বাঁকুড়া। শান্তা দেবী ও তাঁর কনিষ্ঠা ভগিনী সীতা দেবীর রচনা এককালে বাংলা সাহিত্য জগতে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। শিশু ও কিশোর বয়েসের অনেকটাই পিতার কর্মস্থল এলাহাবাদে কাটে। সেখানে মেয়েদের ভাল স্কুল না থাকায় গৃহশিক্ষকের কাছে দু' বোনের শিক্ষা শুরু হয়। সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে বড় হন তাঁরা। দু' বোনে মিলে হিন্দুস্থানী উপকথার অনুবাদ করেন। দুজনে 'সংযুক্তা দেবী' ছদ্মনামে উদ্যানলতা উপন্যাসও রচনা করেন। এছাড়া তাঁর উপন্যাস চিরন্তনী, জীবনদোলা, অলখ ঝোরা। মহিলাদের মধ্যে প্রথম 'পদ্মাবতী', স্বর্ণপদক ও 'ভুবনমোহিনী' পদক লাভ করেন।

।। **সীতা দেবী** ।। (১৮৯৫—১৯৭৪): জন্ম: কলকাতা। পিতা: 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেন, 'কল্লোল' ও 'প্রবাসী' যুগের বিশিষ্ট সাহিত্যিক সুধীর কুমার চৌধুরীর সংগে তাঁর বিয়ে হয়। ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাত। দিদি শান্তা দেবীর সংগে। অনেক শিশুপাঠ্য বই লেখেন। তাঁর

বিশিষ্ট উপন্যাস : মাটির বাসা, পরভৃতিকা, মহামায়া, ক্ষণিকের অতিথি, বন্যা, জন্মস্বত্ব, মাতৃঋণ প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে তাঁর স্মৃতিচারণা পুণ্যস্মৃতি শেষ বয়সের রচনা। নিজের এবং শান্তা দেবীর অনেক গল্প ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। সেই সমস্ত গল্প টেলস্ অব বেঙ্গল নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

।। **প্রভাবতী দেবী সরস্বতী** ।। (১৮৯৬—১৯৭২) : জন্ম : খাটুরী। চব্বিশ পরগণা। পিতা : গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেন। তিন শতাধিক গ্রন্থের রচয়িত্রী। প্রথম উপন্যাস বিজিতা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি বাংলা, হিন্দি ও মালয়লম ভাষায় যথাক্রমে 'ভাঙাগড়া', 'ভাবী' ও 'কুলদেবম্' নামে চিত্রায়িত হয়। এ ছাড়া পথের শেষে উপন্যাসটি 'বাংলার মেয়ে' নামে নাট্যরূপায়িত হয়ে দীর্ঘকাল মঞ্চে অভিনীত হয়। ব্রতচারিণী, মহীয়সী নারী, ব্যথিতা ধরিত্রী, ধূলার ধরণী, রাঙা বৌ, ঘূর্ণি হাওয়া, মাটির দেবতা প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। ছোটদের জন্যে লেখা কৃষ্ণা রোমাঞ্চ সিরিজ, ইণ্টার ন্যাশানাল সার্কাস যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তিনি গানও রচনা করতেন। নবদ্বীপ বিদ্বজ্জন সভা তাঁকে 'সরস্বতী' উপাধি দেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দেন 'লীলা পুরস্কার'।

।। **শৈলবালা ঘোষজায়া** ।। (১৮৯৩ ?—১৯৭৩) : প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্প লেখিকা। লেখিকা হিসেবে একসময় তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। প্রায় বাহান্নটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : শেখ আন্দু, নমিতা, জন্ম-অপরাধী প্রভৃতি।

।। **জ্যোতির্ময়ী দেবী** ।। (১৮৯৪—) : প্রখ্যাত ছোটগল্প লেখিকা ও ঔপন্যাসিক। 'সোনা রূপা নয়' উপন্যাসের জন্য রবীন্দ্র-পুরস্কার পেয়েছেন। অশীতিপর বৃদ্ধা জ্যোতির্ময়ী দেবী চিন্তা-ভাবনায় এখনও সমানভাবে বলিষ্ঠ।

।। **সরলাবালা সরকার** ।। কবি-সাহিত্যিক। নদিয়ার কাঁঠালপোতা গ্রামে ১৮৭৫ সালের ৯ ডিসেম্বর জন্ম। বাবার নাম, ৺কিশোরীলাল সরকার। স্বামী, ৺শরৎচন্দ্র সরকার (রায় বাহাদুর মহিমচন্দ্র সরকারের ছেলে)। ছেলেবেলা থেকেই সাহিত্যে অনুরাগ। ১৯৫৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "গিরিশ অধ্যাপিকা" সম্মান লাভ করেন। দ্বিতীয় পুরস্কার 'কুন্তলীন'। সরোজিনী বক্তৃতা দান। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা—প্রবাহ (১৯০৪), নিবেদিতা (১৯১২), চিত্রপট (১৯১৭), কুমুদনাথ (১৯৩৮),

অর্ঘ্য (১৯৫১), মনুষ্যত্বের সাধনা (১৯৫৩), হারানো অতীত (১৯৫৪), সাহিত্য-জিজ্ঞাসা (১৯৫৭), স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (১৯৫৭), গ্রন্থ সংগ্রহ (১৯৫৭), পিনকুর ডাইরি (১৯৬১)।

১৯৬১ সালের ১ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন।

॥ লীলা মজুমদার ॥ শিশু সাহিত্যে বরণীয়া। ১৯০৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী কলকাতায় জন্ম। বাবা, শিশুসাহিত্যিক ৺প্রমদারঞ্জন রায়। শিক্ষা লাভ করেন, শিলং কনভেণ্টে, ডায়াসেসন কলেজ থেকে বি. এ তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। এম, এ পরীক্ষাতেও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপিকা (১৯৩৯), আকাশবাণীতে যুক্ত হন (১৯৬৫)। ১৯৫৯ সালে 'লীলা পুরস্কার' পান।

শিশু সাহিত্যে রাস্ট্রীয় পুরস্কার পান ১৯৬০-৬১তে। ১৯৬১ সালে 'রবীন্দ্র পুরস্কারে' সম্মানিতা হন।

১৯৭১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'ভুবনমোহিনী দেবী' রৌপ্যপদক লাভ করেন। ১৩৭৭ সনে পান 'ভুবনেশ্বরী পদক'। ১৯৮০ সালে পান 'বিদ্যাসাগর পুরস্কার'।

কথাশিল্পীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: বদ্যিনাথের বাঁড় (১৯৩৬), দিনদুপুরে (১৯৪০), পদি পিসির বর্মি বাক্স, জোনাকি, এই দেখা (১৯৬১), উপেন্দ্র-কিশোরের জীবনী (১৯৬৩), অবনীন্দ্রনাথ (১৯৬৭), খেরোর খাতা, আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ, কল্প বিজ্ঞানের গল্প, মাকু, গুপি পানুর কীর্তিকলাপ, গুপের গুপ্তধন, ছোটদের আরব্য রজনী, ছোটদের তালবেতাল, দেশ বিদেশের কিশোর উপন্যাস, দেশ বিদেশের বিচিত্র উপকথা, বহুরূপী, জানোয়ার, ছোটদের বেতাল বত্রিশ, তুলিয়া, ময়না শালিখ, সেজমামার চন্দ্র যাত্রা, যাত্রী, আর কোনখানে (রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত: ১৩৭৫), নেপোর বই, ফেরারী, উপেন্দ্রকিশোর রচনাবলী, হট্টমালার দেশে, হ্যানস আণ্ডারসনের রূপকথা, চীনে লণ্ঠন, ঝাঁপতাল, নাটঘর, মণিকুন্তলা, মণিমালা, গাওনা, গুপ্তির গুপ্তকথা, টাকা গাছ, বক ধার্মিক, হলদে পাখির পালক, বাঘের চোখ, বাঁশের ফুল, গুপ পণ্ডিতের গুপপনা।

॥ আশাপূর্ণা দেবী ॥ ১৯০৯ সালের ৮ জানুয়ারী কলকাতায় জন্ম। বাবার নাম, ৺হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত (চিত্রশিল্পী)। মা, ৺সরলাসুন্দরী দেবী। আদি নিবাস হুগলির বেগমপুর। স্বামীর নাম, ৺কালিদাস গুপ্ত। ছেলেবেলা থেকেই সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। উল্লেখযোগ্য রচনা—, জল আর

আগুন (১৩৪৭), প্রেম ও প্রয়োজন (১৩৫১), অনির্বাণ (১৩৫২) অগ্নিপরীক্ষা (১৩৫২), মিত্তির বাড়ি (১৩৫৩), সাগর শুকায়ে যায় (১৩৫৩), দুর্নিবার (১৩৫৫), যোগবিয়োগ, বলয়গ্রাস (১৩৫৬), নির্জন পৃথিবী, অতিক্রান্ত, ছাড়পত্র, সমুদ্র নীল আকাশ নীল, আর একদিন, আলোর স্বাক্ষর, কল্যাণী, নবনীড়, সময় অসময়, লোহার গারদের ছায়া, পাখির খাঁচা ও খাঁচার পাখি, বংশধর, উত্তরপুরুষ, আবৃতা-অনাবৃতা, সুখের নিলয়, বালির নিচে ঢেউ, সূর্যোদয়। প্রথম প্রতিশ্রুতি (১৩৭২ সনে রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত), যুগে যুগে প্রেম, নবজন্ম শশীবাবুর সংসার, স্বপ্নশর্বরী, নেপথ্য নায়িকা, জনম জনমকে সাথী, প্রথম লগ্ন, মেঘ, পাহাড, মুখর রাত্রি, কেশবতী কন্যা, একটি সন্ধ্যা একটি সকাল, সোনার হরিণ ছায়াসূর্য, সোনালি সন্ধ্যা, সেই রাত্রি এই দিন, সুরভি স্বপ্ন, সুবর্ণলতা, মায়াদর্পণ, হে ঈশ্বর তোমার যবনিকা, ভালবাসার সুখ তরঙ্গহীন। উল্লেখযোগ্য শিশু সাহিত্য: ছোট ঠাকুর্দার কাশী যাত্রা (৩৪৫), হাফ হলিডে (১৩৪৭), রঙ্গিন মলাট (১৩৪৭), ভাগ্যি যুদ্ধ বেধেছিল (১৩৫২), বলবার মত নয় (১৩৫৪), সেই সব গল্প, গল্প হল শুরু, কনকদীপ, বাছাই গল্প। 'লীলা পুরস্কার' পান ১৯৫৪ সালে। 'জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে' সম্মানিতা।

॥ **আশালতা সিংহ** ॥ মূলতঃ উপন্যাস রচয়িতা। ১৯১১ সালের ১০ নভেম্বর ভাগলপুরে জন্ম। সন্ন্যাস জীবনের নাম আশাপুরী। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: আবির্ভাব, কলেজের মেয়ে (১৯৩৭), অমিতার প্রেম (১৯৩৮), শহরের মোহ, সমর্পণ, অন্তর্যামী, সমী ও দীপ্তি (১৯৪০), লগ্ন বয়ে যায় (১৯৪৭), বিয়ের পর, মধুচন্দ্রিকা (১৯৪৯), বাস্তব ও কল্পনা, অভিমান, মুক্তি, পরিবর্তন।

॥ **প্রতিভা বসু** ॥ ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে ঢাকার সাহারায় জন্ম। বাবার নাম, ৺আশুতোষ সোম। স্বামী, সুনামধন্য সাহিত্যিক ৺বুদ্ধদেব বসু। শিক্ষা চুঁচুড়া কনভেন্ট, ঢাকা কনভেন্টে। রাশিয়া ছাড়া সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেন ১৯৬১ সালে। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আমেরিকা যান ১৯৬৩ সালে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: মনোলীনা (১৯৪৪), সুমিত্রার অপমৃত্যু, মনের ময়ূখ (১৯৫২), সেতুবন্ধ (১৯৫৭), মাধবীর জন্য, পথে হ'ল দেরী, অতল জলের আহ্বান, জন্মান্তর,

সকালের সুর সায়াহ্নে, ঈশ্বরের প্রবেশ, মধ্যরাতের তারা, তিন তরঙ্গ, প্রথম বসন্ত, বিবাহিতা স্ত্রী, মালতীর গল্প, মেঘের পরে মেঘ, বিচিত্র হৃদয় (১৯৪৬), প্রেমের গল্প, বনে যদি ফুটল কুসুম, মেঘলা দুপুর, স্ব নির্বাচিত গল্প, সবচেয়ে যা বড়।

॥ **বাণী রায়** ॥ পাবনার হাটুরিয়ায় ১৯২০ সালের ৫ নভেম্বর জন্ম। এ্যাডভোকেট ৺পূর্ণচন্দ্র রায়ের কন্যা। মা, সুলেখিকা গিরিবালা দেবী সরস্বতী। প্রবেশিকপরীক্ষায় পাশ করেন ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় থেকে। আশুতোষ কলেজ থেকে আই, এ ও বি, এ, এবং ১৯৪০ সালে এম. এ. পাশ করেন। কিছুকাল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগে কাজ করেন। ১৯৬০ ও ১৯৬১ সালে পুরস্কার পানযথাক্রমে 'লীলা' ও 'নরসিংহ' দাস। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : জুপিটার (১৩৫০), পুনরাবৃত্তি (১৩৫১), প্রেম (১৩৫২), শূন্যের অঙ্ক (১৯৫৪), রঞ্জনরশ্মি (১৩৫৬), সপ্তসাগর (১৩৫৭), হাসিকান্নার দিন (১৩৫৯), কনে দেখা আলো, মিস বোসের কাহিনী, তনিমা, জাতক, উষা অনিরুদ্ধ, হৃদয়-মৃত্যু, নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ, মোনালিসা, সেই চেনা ছেলেটি, প্রতিদিন, বর্ষাবিজয়, সুন্দরী মঞ্জুলেখা, সকাল সন্ধ্যা রাত্রি, রবার্ট ফ্রস্ট, মধু জীবনীর নতুন ব্যাখ্যা, আরো কথা বলো, প্রেমের দোল, সাতটি রাত্রি, জনারণ্যে একমুখ, প্রেমের যৎকিঞ্চিৎ, চক্ষে আমার তৃষ্ণা।

॥ **তৃপ্তি মিত্র** ॥ ১৯২৫ সালে দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁয়ে জন্ম। বিজন ভট্টাচার্যের উদ্যোগে তিনি গণনাট্য সঙ্ঘের শিল্পী তালিকায় যুক্ত হন। ১৯৪৮ সালে তিনি প্রথম 'নবান্ন' নাটকে আত্মপ্রকাশ করেন। পরবর্তী সময়ে 'রাজা,' 'রক্ত করবী,' 'চার অধ্যায়', 'ছেঁড়া তার,' 'পুতুল খেলা' প্রভৃতি নাটক তাঁর অভিনয় জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর বহন করছে। ১৯৭১ সালে 'পদ্মশ্রী' উপাধি পান। বোম্বাইতে থাকাকালীন সর্বজন শ্রদ্ধেয় অভিনেতা—নির্দেশক ও নাট্য প্রযোজক শম্ভু মিত্রের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। নাট্য জীবনের সঙ্গে সাহিত্য-চর্চা করেছেন। 'অপরাজিতা' একক নাটক তাঁর রচনা ও অভিনয়ের সাক্ষ্য বহন করছে। বেশ কিছু নাটক লিখেছেন।

গল্প লেখায় সিদ্ধহস্ত তার প্রমাণ এই "অব্যক্ত"।

॥ **মহাশ্বেতা দেবী** ॥ ১৯২৬ সালের ১৪ জানুয়ারী ঢাকায় জন্ম। বাবা, ৺মনীশ ঘটক। খুল্লতাত, প্রয়াত ঋত্বিক ঘটক। স্বামী, ৺বিজন ভট্টাচার্য। বিবাহ বিচ্ছেদ

হয়। শিক্ষা লাভ করেন ঢাকার ইডেন স্কুল, মেদিনীপুর, শান্তিনিকেতন। আশুতোষ কলেজ থেকে আই. এ. ও বি. এ পাশ করেন। ১৯৪৭ সালে এম. এ পাশ করেন। রমেশ মিত্র স্কুলে শিক্ষকতা করেন। যাদবপুরে জ্যোতিষ রায় কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। ডি. এ. জি. পি. টি অফিসে চাকরি করেন কিছুদিন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেই খ্যাতি লাভ করেন, পান সম্মান। 'তারাশঙ্কর স্মৃতি পুরস্কার', 'অমৃত পুরস্কার', 'লীলা', 'শরৎস্মৃতি' ছাড়াও ১৯৭৯ সালে 'অরণ্যের অধিকার'-এর জন্য 'অকাদেমী পুরস্কার' পান। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: ঝাঁন্সিরাণী (১৯৫৬), নটী (১৯৫৭), যমুনাকী তীর (১৯৫৭), মধুর মধুর (১৯৫৮), অমৃত সঞ্চয়, অগ্নিগর্ভ, প্রেমতারা, অরণ্যের অধিকার, কবি—বন্দ্যোঘটি গাঞার জীবন-মৃত্যু, অক্লান্ত কৌরব, বীরসা মুণ্ডা, মায়ের মূর্তি, শ্রীশ্রীগণেশ মহিমা, হরিরাম মাহাতো, ইটের পর ইট, চোট্টিমুণ্ডা ও তার তীর, লুন্ঠন: সমাজ ও সাহিত্য, আঁধার মাণিক, বায়স্কোপের বাক্স, সন্ধ্যার কুয়াশা, অজানা, সুভগা বসন্ত, নৈঋতে মেঘ, রূপরেখা, ধানের শীষে শিশির, হাজার চুরাশীর মা, পলাতক, এতটুকু আশা, তিমির লগন, লায়লী, আশমানের আয়না, পথ চলি আনন্দে, মূর্তি, ঘরে ফেরা, স্তন দায়িনী ও অন্যান্য গল্প, এক কড়ির সাধ, বেহুলা ইত্যাদি।

॥ কবিতা সিংহ ॥ সুলতানা চৌধুরী ॥ ১৯৩১ সালের ১৬ অক্টোবর জন্ম। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: সোনারুপোর কাঠি, পাপপুণ্য পেরিয়ে, সরমা, খুনের সংখ্যা এক, তুর্কী হারেম, সহজ সুন্দরী, পতনের বিরুদ্ধে, কবিতা পরমেশ্বরী, মেয়েমানুষের গল্প; সত্তর দশকের প্রেমের গল্প, সপ্তদশ অশ্বারোহী, চারজন রাগী যুবতী, সেই উত্তম নায়ক, নায়িক-প্রতি নায়িকা। সম্পাদনা করেন: ইদানীং, দৈনিক কবিতা, আকাশবাণীর প্রতি পত্রিকা শ্রবণী।

॥ কণা বসু মিশ্র ॥ মূলতঃ উল্টোরথ পত্রিকা থেকেই সাহিত্যের আসরে প্রবেশ। এরপর একে একে সব অভিজাত পত্রিকায় অনেক লিখেছেন ইনি।

সংকলন: শুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

———